প্রকৃতি-পরিচয়

[স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম, এ,
মহাশয়-লিখিত ভূমিকাসহ]

(তৃতীয় সংস্করণ)

৺জগদানন্দ রায় প্রণীত

[illegible]
ইণ্ডিয়ান পাব্‌লিশিং হাউস
কলিকাতা
১৯৪০

মূল্য ১॥৵০

ভূমিকা

অধ্যাপক টিণ্ডাল তাঁহার প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাবলির নাম দিয়াছিলেন—"Fragments of Science for Unscientific People". বড় জিনিসের সঙ্গে এক নিশ্বাসে ছোট জিনিসের নাম করা সকল সময়ে সঙ্গত হয় না—তথাপি সেই বড় দৃষ্টান্তের অনুকরণে বলা যাইতে পারে, এই গ্রন্থও অবৈজ্ঞানিক জনসাধারণের জন্য বিজ্ঞানের টুক্‌রার সঙ্কলনমাত্র।

গ্রন্থকার বাঙ্গালা সাহিত্যে এতই সুপরিচিত যে, তাঁহাকে চেনাইবার ভার আমাকে লইতে হইবে না। আজকাল বাঙ্গালা মাসিক সাহিত্যে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ দেখিলেই পাঠক বুঝিয়া লন যে, প্রবন্ধের নীচে জগদানন্দ বাবুর স্বাক্ষর দেখা যাইবে। বাস্তবিক পাশ্চাত্য দেশেই হউক বা স্বদেশেই হউক, বিজ্ঞানের যে সকল উচ্চ তত্ত্ব আজকাল আবিষ্কৃত হইতেছে, এ দেশে সাধারণ পাঠকের নিকট তাহার ঘোষণার ভার একা জগদানন্দ বাবুর উপরই পড়িয়াছে; অথবা তিনি তাহাই জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। বাঙ্গালা সাহিত্যে অন্য যে কয়ব্যক্তি পূর্ব্বে বৈজ্ঞানিক সমাচার ঘোষণা করিতেন, এখন তাঁহারা প্রায়ই আত্মগোপন করিয়াছেন।

এই গ্রন্থ যখন অবৈজ্ঞানিক পাঠকের জন্য লিখিত, তখন ইহার প্রতি বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতের ভ্রূকুটিভঙ্গী প্রদর্শনের কোন প্রয়োজন বা আশঙ্কা নাই। এই কথা বলিবার একটু তাৎপর্য্য আছে। এক দল বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত এই শ্রেণীর গ্রন্থের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করেন না। অবৈজ্ঞানিককে তাঁহারা অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। তাঁহারা মোটা হরপে লিখিয়া রাখিয়াছেন, বিজ্ঞানের দেবক্ষেত্রে অবৈজ্ঞানিক মর্ত্ত্যজনের প্রবেশ নিষেধ।

ইহার একটু হেতু আছে। বৈজ্ঞানিকের নিকট বিজ্ঞান অত্যধিক আদরের সামগ্রী। জহুরি মণিমাণিক্যের কারবার করে ও মূল্য জানে; বাজারের মধ্যে সে মণিমাণিক্য উপস্থাপিত করিয়া 'ইজ্জত' নষ্ট করিতে চায় না। বৈজ্ঞানিকেরা বহু পরিশ্রমে যে সকল মহামূল্য সত্যের আবিষ্কার করেন, তাহার মূল্য তাঁহারাই বুঝেন। ইতর সাধারণের সম্মুখে তাহার সমুচিত সমাদর কখনই সম্ভবে না। কাজেই, তাঁহারা ইতরের সম্মুখে তাঁহাদের মহামূল্য সত্যগুলির উপস্থাপনে কুণ্ঠিত।

কত প্রমাণপরম্পরা সংগ্রহের পর, কত সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণ ও আয়াসসাধ্য পরীক্ষার পর, কত বিচার বিতর্ক বিতণ্ডার পর বৈজ্ঞানিকেরা প্রকৃতি দেবীর রহস্যলোক হইতে গুপ্ততত্ত্বের সংবাদ সঙ্কলন করেন, ইতর লোকে তাহার সংবাদ রাখে না। এই কর্ম্মের গুরুত্ব নির্দ্ধারণও তাহাদের পক্ষে অসাধ্য। অভিনব সত্যের আবিষ্কারে বৈজ্ঞানিকের যে বিস্ময়, যে আনন্দ জন্মে, ইতর জনে তাহার অল্পাংশের অনুভবেও অধিকারী নহে। যে আবিষ্কারে বৈজ্ঞানিকের লোমহর্ষ উপস্থিত হয়, সেই আবিষ্কারের সংবাদে অবৈজ্ঞানিকের কিছুমাত্র ইন্দ্রিয়বিকার জন্মে না। বৈজ্ঞানিক বিস্মিত হইয়া নিরূপণ করেন, সূর্য্যের দূরত্ব নয় কোটী মাইল, অবৈজ্ঞানিক তাহা নির্ব্বিকারে শুনিয়া থাকেন এবং নব্বই কোটী হইলেও তাহার বিস্ময়ের মাত্রা অধিক হয় না। আলোক সেকেণ্ডে লক্ষ ক্রোশ বেগে ভ্রমণ করে, ইহা প্রতিপাদন করিয়া বৈজ্ঞানিক অসাধ্যসাধনের স্পর্দ্ধায় স্পন্দিত হন, অবৈজ্ঞানিক অতি অকাতরে তাঁহার সেই অসাধ্যসাধনসংবাদ মানিয়া লয়। তাহার কোন ইন্দ্রিয় কোনরূপ বিকার লক্ষণ দেখায় না। বিশ্বব্যাপী ঈথরের অথবা অভেদ্য অচ্ছেদ্য পরমাণুর অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করিয়া বৈজ্ঞানিক যখন আস্ফালন করেন, তাঁহার অবৈজ্ঞানিক বন্ধু পুরাতন পুঁথির ছেঁড়া পাতা খুলিয়া তাঁহাকে দেখাইয়া দেন যে, তাঁহার চৌদ্দপুরুষ

পূর্ব্বে এই তথ্য আবিষ্কৃত হইয়া গিয়াছে ; তাঁহার বিশেষ কোন কৃতিত্ব নাই ! সেই বিশ্বব্যাপী ঈথর কঠিন পদার্থ, না তরল পদার্থ, এই দারুণ, সমস্যার সমাধানে বসিয়া যখন বৈজ্ঞানিকের শিরঃপীড়া উপস্থিত হয়, অথবা সেই পরমাণুগুলি ভাঙিয়া চুরিয়া, ইলেক্ট্রনে গুঁড়ায় পরিণত হইতেছে দেখিয়া যখন তিনি মাথায় হাত দিয়া বসেন, তখন তাঁহার আত্মীয় স্বজন, তাঁহার অকারণ দুশ্চিন্তার কারণ না পাইয়া তাঁহার ভবিষ্যতের জন্য চিন্তিত হন। তাঁহার প্রতিবেশীদের মধ্যে কেহ বা তাঁহাকে পাগল ঠাওরায়, কেহ বা তাঁহাকে কোনরূপ দৈবশক্তিসম্পন্ন লোক মনে করিয়া তাঁহার বাক্য বেদবাক্য বলিয়া নির্ব্বিকার চিত্তে মানিয়া লয়। পাগল ঠাওরানো বরং সহা যায় ; কিন্তু এই নির্ব্বিকারতা একেবারে অসহ্য) নির্জ্জন দ্বীপের সমস্ত ক্লেশ আলেকজান্দার সেলকার্ক সহিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার মত গোটা মানুষকে নূতন দেখিয়াও পশু-পাখীতে বিকার-লক্ষণর দেখায় নাই, ইহা তাঁহার অসহ্য হইছিল।

অনধিকারীর নিকট তত্ত্বকথা প্রকাশে তত্ত্বদর্শীরা চিরকালই কুণ্ঠিত এবং এই জন্যই অবৈজ্ঞানিক জনসাধারণের সম্মুখে বৈজ্ঞানিক বার্ত্তা উপ-স্থাপিত করিতে অনেক বৈজ্ঞানিক সঙ্কোচ বোধ করেন। যত সহজ ভাষাতেই বিজ্ঞানের উপদেশ উপদিষ্ট হউক না, অনধিকারী যে বৈজ্ঞানিক সত্যের যথার্থ তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিবে, তাহার সম্ভাবনা অল্প। জহুরি ব্যতীত ইতর লোকে মণিমাণিক্যের সমুচিত সমাদর করিবে, তাহার সম্ভাবনা অল্প। মুক্তার মালা সকলের গলায় শোভা পায় না। নরের নিকট উহার আদর হইতে পারে ; কিন্তু নরের শাখাবিহারী কুটুম্বের গলায় উহার যথোচিত আদরের সম্ভাবনা কিছু বিরল।

এ সমস্তই সত্য। তথাপি বড় বড় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত সময়ে অসময়ে ইতর জনকে নিকটে ডাকিয়া তাঁহাদের সম্মুখে বিজ্ঞান শাস্ত্রের গুরু-গম্ভীর

তত্ত্বগুলি উপস্থিত করিয়াছেন, ইহার প্রচুর উদাহরণ আছে। অধ্যাপক টিণ্ডালের নাম পূর্ব্বেই করিয়াছি; অবৈজ্ঞানিক জনসমাজের সহিত মাখা-মাখি, গলাগলি করিতে তাঁহার মত সংগলে প্রস্তুত না হইতে পারেন,—কিন্তু হেলমহোৎজ, কেলবিন টেট, ক্লিফোর্ডের মত দিক্‌পালগণও তাঁহাদের দেবলোক হইতে অবসরমত নামিয়া আসিয়া বিজ্ঞানের অমৃতভাণ্ড হইতে অমৃতকণিকা মর্ত্ত্যলোকে বিলাইতে কৃপণতা করেন নাই। স্বর্গের অমৃতের যেমন মাদকতা ছিল, বিজ্ঞানামৃতেও সেইরূপ একটা মাদকতা আছে। মাদক দ্রব্যের একটা সাধারণ লক্ষণ এই যে, অপরকে না বিলাইলে আনন্দের পূর্ণতা হয় না। বিজ্ঞানামোদীও অপরকে আপনার আনন্দের ভাগ দিতে চান;—না দিতে পারিলে তাঁহাদের আনন্দ পূর্ণ হয় না। অপরকে মাতাইতে প্রবৃত্ত হইলে তখন আর অধিকারী অনধিকারী বিচার করা চলে না। ভৈরবী চক্রে সকল বর্ণই দ্বিজোত্তম হইয়া যায়, তখন জাতিবিচারের অবসর ঘটে না।

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের ভূমিকা লিখিতে বসিয়া এত বড় বড় নাম ও বড় বড় কথা আনিবার হয়ত কোন প্রয়োজন ছিল না। গ্রন্থকর্ত্তা আমাদের মতই মর্ত্ত্যলোকের অধিবাসী; তবে দেবলোক হইতে দিক্‌পালেরা বিজ্ঞানামৃতের যে ছিটা-ফোঁটা যাহা মর্ত্ত্যলোকে নিক্ষেপ করিয়া থাকেন, তিনিও আমাদের মতই তাহার আস্বাদন করিয়া থাকেন এবং সেই ছিটা-ফোঁটার আস্বাদনে তাঁহার আত্মীয় স্বজন প্রতিবেশীকে অংশভাক্ করিবার জন্য আহ্বান করিয়া থাকেন। এই জন্য তিনি তাঁহার আত্মীয়-স্বজন. প্রতিবেশীর কৃতজ্ঞতাভাজন। বাঙ্গালাদেশে তাঁহার এই উদ্যমের সহযোগী অধিক নাই। তিনি কয়েক বৎসর ধরিয়া বঙ্গদেশে অবৈজ্ঞানিক পাঠকসমাজের মধ্যে বিজ্ঞান প্রচারের জন্য যে চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন, তজ্জন্য বঙ্গসাহিত্য তাঁহার নিকট ঋণী। কেননা, বাঙ্গালা সাহিত্য

এবিষয়ে নিতান্ত দরিদ্র। এই গ্রন্থে সেই দারিদ্র্যের কতকটা মোচন হইবে। বাঙ্গালা সাহিত্যে বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের একান্ত অভাব। গ্রন্থকর্ত্তা সেই অভাব মোচনে যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, আমি সেই কৃতিত্বের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয়দানের এই সুযোগ পাইয়া পরম আনন্দ অনুভব করিতেছি।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

বিজ্ঞাপন

গত ছয় সাত বৎসরে প্রবাসী, বঙ্গদর্শন, তত্ত্ববোধনী পত্রিকা, সাহিত্য-সংহিতা, মানসী প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় আমার যে সকল বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাদেরি মধ্য হইতে কয়েকটিকে বাছিয়া লইয়া এই পুস্তক প্রকাশ করা হইল। বৈজ্ঞানিক রচনাকে সুখপাঠ্য করিয়া সাধারণ পাঠকের নিকটে উপস্থিত করা যে ক্ষমতার কাজ, তাহার অভাব রচনাকালে পদে পদে অনুভব করিয়াছি। এই দৈন্য সত্ত্বেও বাঙ্গালায় বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ প্রকাশে প্রবৃত্ত হইয়া সুধী পাঠকের নিকটে হয়ত অপরাধী হইয়াছি।

ভূগর্ভের প্রাচীন স্তরে সঞ্চিত লুপ্তজীবের শিলাময় কঙ্কাল জীববিজ্ঞানের সম্পূর্ণতার পক্ষে যেমন প্রয়োজনীয়, প্রাচীন পণ্ডিতদিগের সুদীর্ঘ সাধনার ফলগুলি প্রচলিত নানা বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের সুপ্রতিষ্ঠার পক্ষে তেমনি অপরিহার্য্য। অপ্রচলিত প্রাচীন সিদ্ধান্তগুলি ইতিহাসের সামগ্রী। সেগুলিকে না বুঝিলে, যে সকল চিন্তা ও ভাব নানা আধুনিক মতবাদের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাদের অভিব্যক্তির সূত্র খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এজন্য গ্রন্থে নূতনের আলোচনায় পুরাতনকে ত্যাগ করিতে পারি নাই।

অনেক প্রবন্ধে পাঠক একই বিষয়ের পুনরালোচনা দেখিতে পাইবেন। এই পুনরুক্তি দোষ ইচ্ছাকৃত। গ্রন্থের বহু প্রবন্ধের মধ্যে যে কোনটিকে পড়িতে আরম্ভ করিলে পাঠক যাহাতে তাহার পূর্ণাকার দেখিতে পান, তাহারি জন্য এই ব্যবস্থা। কোন আলোচ্য বিষয়ের আমূল বৃত্তান্ত জানিবার জন্য পাঠককে কোন পূর্ব্ব প্রবন্ধের পাতা উন্টাইতে হইবে না।

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম,
শান্তিনিকেতন, বোলপুর।
আষাঢ়, ১৩১৮।

শ্রীজগদানন্দ রায়।

হে কল্যাণীয়

ব্রহ্মবিদ্যালয়ের ছাত্রগণ !

আশ্রমের সেই ক্ষুদ্র বীক্ষণাগারে অধ্যাপনাকালে তোমাদিগকে যে সকল কথা বলিয়াছি এবং শান্তস্নিগ্ধ কত সন্ধ্যায় আশ্রম-আঙিনায় বসিয়া তোমাদের নিকটে প্রকৃতির যে সকল রহস্য বিবৃত করিয়াছি, তাহাদেরি কতকগুলি আজ পুঁথির পাতায় আশ্রয় গ্রহণ করিল। আমার প্রবন্ধগুলি পুস্তকের আকারে প্রকাশিত দেখিতে তোমাদের আকাঙ্ক্ষা ছিল। এই জন্য তোমাদের মধ্যে যাহারা আশ্রমে আছ এবং যাহারা আশ্রম ত্যাগ করিয়া অন্যত্র অবস্থান করিতেছ, সকলেরি উদ্দেশে এই গ্রন্থখানি আমার অন্তরের আশীর্ব্বাদসহ উৎসর্গ করিলাম।

তোমরা বিদ্যা ও জ্ঞানে দেশের সুসন্তান হও, ভগবানের নিকটে এই প্রার্থনা করিতেছি।

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম,
শান্তিনিকেতন, বোলপুর
আষাঢ়, ১৩১৮

শ্রীজগদানন্দ রায়

সূচীপত্র

পৃথিবীর পরিণাম

কিছুদিন হইতে আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের মনে একটা ভয়ানক আতঙ্ক আসিতেছে,—বুঝি বা বিশ্বের শক্তি ক্রমেই নিশ্চল ও অক্ষম হইয়া আসিতেছে। শক্তির ধ্বংস নাই বলিয়া আধুনিক বিজ্ঞানে যে একটা কথা আছে, তাহা অতি সত্য। বিশ্বরচনাকালে বিধাতা যে শক্তি দিয়া তাহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, কাহারো সাধ্য নাই তাহার অণুমাত্র ক্ষয় করে। তুমি এক খণ্ড ইট্ লইয়া দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিলে। হয় ত মনে করিলে, তুমি একটা শক্তির সৃষ্টি করিয়া তাহাদ্বারাই ইট-খানিকে সচল করিয়া দিলে। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তাহা নয়, ব্রহ্মাণ্ডের বিশাল শক্তিরাশির যে এক অতি ক্ষুদ্র অংশ তুমি আহার্য্যাদির সহিত দেহস্থ করিয়াছিলে, তোমার দেহ তাহাই ইষ্টকখণ্ডে প্রয়োগ করিয়াছিল। ইষ্টক আবার সেই শক্তির কতক অংশ বাতাসের ঘর্ষণে তাপ উৎপন্ন করাইয়া এবং মাটিতে আঘাত দিয়া তাহাকে একটু গরম করাইয়া নিশ্চল হইয়া গেল। সুতরাং ইট ছুঁড়িয়া তুমি যে শক্তিকে মিছামিছি নষ্ট করিলে বলিয়া মনে করিতেছ, সত্য কথা বলিতে গেলে তাহা নষ্ট হইল না। বাতাস ও মাটিকে গরম করিয়া সেই শক্তিই আবার কতকগুলি নূতন কার্য্য সুরু করিয়া দিল।

বলা বাহুল্য, ঐ ঢিল-ছোঁড়া বিশ্বের বিচিত্র শক্তিলীলার একটা তুচ্ছ উদাহরণ। কিন্তু মেঘবৃষ্টি, জন্মমৃত্যু, ক্ষয়বৃদ্ধি ইত্যাদি ব্রহ্মাণ্ডের খুব বড়-বড় কাজগুলাও ঐ ঢিল-ছোঁড়ার মতই চলিয়া থাকে। সকলেই বিশ্বের ভাণ্ডার হইতে এক একটু শক্তি সংগ্রহ করিয়া, এবং তাহাকেই নানা-প্রকারে পরিবর্ত্তিত করিয়া প্রকৃতির বিচিত্র লীলা দেখায়। ইহাতে শক্তির ব্যয় হয় বটে, কিন্তু ধ্বংস হয় না। এক আধার ত্যাগ করিয়া আধারান্তরে

পৃথগ্-আকারে আশ্রয়গ্রহণ করাই শক্তির কাজ। বৈজ্ঞানিকগণ আশঙ্কা করিতেছেন, সম্ভবতঃ দূর ভবিষ্যতে বিশ্বের এই শক্তিলীলার অবসান হইবে।

আশঙ্কাটির কারণ কি, এখন আলোচনা করা যাউক। আমরা যখনি শক্তি আহরণ করিয়া তাহাদ্বারা কাজ করাইয়া লই, শক্তির অতি অল্প অংশই সেই কাজে ব্যয়িত হয়, অবশিষ্টটা নানাপ্রকারে তাপে পরিণত হইয়া পড়ে। মনে করা যাউক, কয়লা পোড়াইয়া ও তাহার অন্তর্নিহিত শক্তিকে মুক্ত করিয়া, আমরা রেলগাড়ী চালাইতে যাইতেছি। এই শক্তির সমস্তটা কখনই গাড়ি চালাইবার কাজে ব্যয়িত হইবে না। অধিকাংশই রেল ও চাকায় সংঘর্ষণ করাইয়া ও নানাপ্রকার শব্দের তরঙ্গ তুলিয়া অনাবশ্যক তাপে পরিণত হইয়া পড়িবে।

তাপ উৎপন্ন হইলে তাহাকে এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে আবদ্ধ রাখা বড় সহজ ব্যাপার নয়। পার্শ্বের শীতল পদার্থকে গরম করিয়া সকলকে সমভাবে উষ্ণ রাখিবার জন্য তাপমাত্রেরই এক প্রবল চেষ্টা দেখা যায়। জল যখন উঁচু স্থানে থাকে, কেবল তখনই নীচে আসিবার জন্য তাহার চেষ্টা হয়, এবং এই সুযোগে তাহার দ্বারা আমরা নানাপ্রকার কাজ করাইয়া লই। তাপের কার্য্যটাও অবিকল তদ্রূপ,—এক স্থানে সঞ্চিত তাপের পরিমাণ যখন পার্শ্বস্থ স্থানের তাপ অপেক্ষা অধিক হয়, তখন সেই সঞ্চিত তাপ পার্শ্বের শীতল পদার্থকে গরম করিবার জন্য ছুটাছুটি আরম্ভ করে, এবং এই সুযোগে আমরা তাহাদ্বারা কাজ করাইয়া লই; কারণ, সকলের উষ্ণতা সমান হইয়া দাঁড়াইলে, তাপ চলাচল বন্ধ হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে তাপের কাজও রোধ পাইয়া যায়।

বৈজ্ঞানিকগণ বলিতেছেন, জগতের প্রত্যেক কার্য্যে নানাপ্রকারে যে আবশ্যক ও অনাবশ্যক তাপ উৎপন্ন হইতেছে, তাহা সমগ্র বিশ্বটার উষ্ণতা

সমান করিবার জন্য ব্যথিত হইয়া যাইতেছে। উচ্চস্থানের জল একবার নীচের সমতল ক্ষেত্রে নামিলে তাহা যেমন স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে, এবং কোনপ্রকার কাজ করে না, বিশ্বের ভাণ্ডারস্থ শক্তির অবস্থা ক্রমে সেইপ্রকার হইয়া দাঁড়াইতেছে। যে শক্তিরাশি তাপাকার প্রাপ্ত হইয়া বিশ্বের সমগ্র পদার্থকে সমোষ্ণ করিতে যাইতেছে, তাহাকে আমরা চিরদিনের জন্য হারাইতেছি। তাহাকে উদ্ধার করিয়া কাজে লাগাইবার সত্যই আর কোন উপায়ই নাই।

জলবায়ুর প্রবাহ, প্রাণী ও উদ্ভিদের জন্মমৃত্যু, কলকারখানার কাজকর্ম্ম প্রভৃতি সকল ব্যাপারেই প্রকৃতির সক্ষমশক্তির কিয়দংশ প্রতি মুহূর্ত্তেই তাপে পরিণত হইয়া পূর্ব্বোক্তপ্রকারে অক্ষমশক্তিতে পরিণত হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু এদিকে প্রকৃতির শক্তির পরিমাণ অসীম। এজন্য ভয় হইতেছে,—বিশ্বকে সমোষ্ণ করিবার জন্য সক্ষমশক্তি কণায় কণায় ক্ষয় পাইয়া যেদিন প্রকৃতির শক্তিভাণ্ডারকে শূন্য করিয়া দিবে, তখন বিশ্বের আর কোন বৈচিত্র্যই থাকিবে না। সমগ্র শক্তিরাশি একমাত্র তাপেই পরিণত হইয়া ব্রহ্মাণ্ডস্থ সমস্ত পদার্থকে সমোষ্ণ করিয়া রাখিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র সৃষ্টি নিশ্চল ও মৃতপ্রায় হইয়া পড়িবে; শক্তিসম্পন্ন হইয়াও প্রকৃতি তখন শক্তিহীন হইয়া দাঁড়াইবে।

এখন পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, বৈজ্ঞানিকদিগের পূর্ব্বোক্ত আশঙ্কাটি কি প্রকৃত? ব্রহ্মাণ্ড কালে সমোষ্ণ হইবে নিশ্চিত, কিন্তু তাহাতে কি সত্যই প্রাকৃতিক কার্য্যগুলি বন্ধ হইয়া যাইবে?

এই সকল প্রশ্নের উত্তরে বলা যাইতে পারে, আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ বহু পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষায় তাপের কার্য্যসম্বন্ধে যে কয়েকটি সাধারণ নিয়ম (Laws of Thermo-dynamics) আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা সত্য হইলে বলিতে হয়, বৈজ্ঞানিকদিগের আশঙ্কা নিতান্ত অমূলক নয়। ইঁহারা

তাপের কার্য্য পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, কোন জিনিসের সর্ব্বাংশের উষ্ণতা একই হইলে, ইহার এক অংশের তাপ কখনই আপনা হইতে অপর অংশে আসিয়া সঞ্চিত হইতে পারে না। এ অবস্থায় তাপচলাচল সম্পূর্ণ লোপ পায়। কাজেই, এখানে সেই তাপদ্বারা কোন কাজ পাইবার সম্ভাবনা থাকে না, পাইতে হইলে বাহির হইতে কোনপ্রকার শক্তি পদার্থের উপর প্রয়োগ করা আবশ্যক হয়। *

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, নানা পদার্থের ভিতরকার শক্তির পার্থক্যই প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের মূলকারণ। কোন জিনিস অধিক পরিমাণে শক্তি আহরণ করিয়া, যখন অল্পশক্তিসম্পন্ন অপর পদার্থের উপর তাহার প্রভাব দেখাইতে আরম্ভ করে, আমরা তখনি এক একটি প্রাকৃতিক ঘটনা দেখি। সুতরাং কালক্রমে প্রাকৃতিক সমগ্রশক্তি সমভাবে বিতরিত হইয়া, যখন পদার্থমাত্রকেই সমোষ্ণ করিবে, তখন সেই শক্তিতে আর কোন কাজই হইবে না। কাজ করাইয়া লইতে হইলে, তাহার উপর আবার কোন শক্তিপ্রয়োগ আবশ্যক। কিন্তু ঐ অবস্থায় কণামাত্র শক্তি বাহিরে থাকিবে না, সকলই তাপে পরিণত হইয়া বিশ্বের সর্ব্বাঙ্গে সমভাবে অবস্থান করিবে। সুতরাং তাপ ও তাহার কার্য্যের পূর্ব্ববর্ণিত নিয়মটির (The second Law of Thermo-dynamics) উপর বিশ্বাস করিলে বলিতে হয়, দূর ভবিষ্যতে বিশ্বের সমগ্র শক্তিকে তাপাকারে দেহস্থ করিয়া প্রকৃতি নিশ্চয়ই নিশ্চল ও মৃতপ্রায় হইয়া পড়িবে।

সমোষ্ণ পদার্থের তাপদ্বারা কাজ করাইতে হইলে যে বাহিরের শক্তি একান্ত আবশ্যক, সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ক্লার্ক-ম্যাক্স্‌ওয়েল্ সাহেব তাহা স্বীকার করিতে চাহেন নাই। আবদ্ধ পাত্রে কোন বায়বীয় পদার্থ রাখিয়া তাপ দিলে, তাপের বৃদ্ধির সহিত তাহার চাপের মাত্রাও বৃদ্ধি পায়। এই

* The second law of Thermo-dynamics.

চাপবৃদ্ধির কারণ-প্রসঙ্গে বৈজ্ঞানিকগণ একটি সিদ্ধান্ত (Kinetic theory of gases) খাড়া করিয়াছেন।

ইহা হইতে জানা যায়, বায়বীয় পদার্থের অণুগুলি সর্ব্বদাই ভীমবেগে ছুটাছুটি করে, এবং আবদ্ধ হইয়া পড়িলে পরস্পরকে ধাক্কা দিয়া ও পাত্রের গায়ে আঘাত করিয়া একটা চাপের সৃষ্টি করিতে থাকে। ইহাই বায়বীয় পদার্থের চাপ। তাপের মাত্রা বৃদ্ধি করিলে ঐ আণবিক বেগের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। কাজেই, তখন ধাক্কাগুলিও খুব প্রচণ্ডভাবে চলিতে থাকে ও সঙ্গে সঙ্গে চাপও অধিক্ হইয়া দাঁড়ায়। হিসাব করিলে দেখা যায়, নির্দ্দিষ্ট উষ্ণতায় বায়বীয় পদার্থের অণুর গতি গড়পড়্তায় ঠিক একই থাকে কিন্তু প্রত্যেক অণুর গতি পরীক্ষা করিলে কাহারো গতি কম ও কাহারো বেশী হইতে দেখা যায়।

সমোষ্ণ বায়বীয় পদার্থের অণুগুলিকে এই প্রকারে বিবিধ গতিতে চলিতে দেখিয়া, সমোষ্ণ করিলেই যে সেই তাপ অক্ষম হইয়া গেল তাহা ম্যাক্স্ওয়েল সাহেব স্বীকার করিতে পারেন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন, সমোষ্ণ বায়বীয় পদার্থ হইতে দ্রুতগামী অণুগুলি যদি পৃথক্ হইয়া দাঁড়ায়, তবে নিশ্চয়ই দুই দল বিচ্ছিন্ন অণুরাশির মধ্যে দ্রুতগামীর দ্বারা কিছু কাজ করিয়া লওয়া যাইতে পারে। সুতরাং সমোষ্ণপদার্থস্থ শক্তি যে একেবারে অক্ষম, তাহা বলা যায় না।

ক্লার্ক-ম্যাক্স্ওয়েল সাহেবের পূর্ব্বোক্ত সুযুক্তিপূর্ণ প্রতিবাদটিকে সকলেই যথার্থ বলিয়া অবনতমস্তকে স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু কেবল বায়বীয় পদার্থের অতি সূক্ষ্ম লক্ষ লক্ষ অণুর গতি লইয়া যে সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা, তাহা প্রকৃতির বৃহৎ বৃহৎ কার্য্যে খাটিবে কি না, এবং কোন চতুর শিল্পী ঐ সিদ্ধান্ত অনুসারে কাজ করাইবার জন্য যন্ত্রনির্ম্মাণে সক্ষম হইবে কি না, সে বিষয়ে ঘোর সন্দেহ আছে। কাজেই, ম্যাক্স্ওয়েল্

সাহেবের প্রতিবাদসত্ত্বেও জগতের ভয়াবহ পরিণামের অশঙ্কা অক্ষুণ্ণ রহিয়া গিয়াছিল।

ইউরেনিয়ম্, রেডিয়ম্ প্রভৃতি কয়েকটি ধাতুর বিয়োগ ও তেজো-নির্গমন (Radioactivity) আবিষ্কার হওয়ার পর পদার্থতত্ত্বের উপর যে এক নূতন আলোক আসিয়া পড়িয়াছে, তাহার কথা পাঠক অবশ্যই শুনিয়াছেন। এই সকল আবিষ্কার হইতে জানা গিয়াছে, পদার্থমাত্রই বিয়োগধর্ম্মী ও তেজোনির্গমনক্ষম। অর্থাৎ হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, লোহ, তাম্র, সীসক প্রভৃতিকে যে আমরা মূল জড়পদার্থ বলিয়া আসিতেছিলাম, তাহারা মূলপদার্থ নয়। সকলেই ইলেক্ট্রন্ (Electron) নামক এক অতি সূক্ষ্ম পদার্থ ত্যাগ করিয়া বিয়োগ প্রাপ্ত হইতেছে এবং যে শক্তিতে ইলেক্ট্রন্‌গুলি জোট বাঁধিয়া নানা পদার্থের উৎপত্তি করিয়াছিল, তাহাও বিয়োগকালে তাপাকারে প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে। এই ব্যাপারে বৈজ্ঞানিকদিগের মনে আর এক নূতন আশঙ্কার সঞ্চার হইয়াছে। সকলে ভাবিতেছেন, বুঝি দূর ভবিষ্যতে সমগ্র বিশ্বটা জড়ের মূল উপাদান সেই ইলেক্ট্রনে পরিণত হইয়া যায়।

এই আশঙ্কার সঞ্চার হইলে বৈজ্ঞানিকগণের মনে হইয়াছিল, গুরুভার-বিশিষ্ট পদার্থ যেমন শক্তি ত্যাগ করিয়া ইলেক্ট্রনে বিযুক্ত হইয়া পড়িতেছে, সেই প্রকার ঐ বিচ্ছিন্ন ইলেক্ট্রন্‌গুলি সেই পরিত্যক্ত শক্তি আহরণ করিয়া নূতন পদার্থ উৎপন্ন করিতে পারে না কি? অনুসন্ধান আরম্ভ হইয়াছিল, এবং সম্প্রতি বিয়োগজাত ইলেক্ট্রন্ হইতে পদার্থের পুনর্গঠনের সম্ভাবনা দেখা গিয়াছে।

পাঠক অবশ্যই জানেন, রশ্মিনির্ব্বাচনযন্ত্র (Spectroscope) সাহায্যে অতি দূরবর্ত্তী নক্ষত্রজগতেরও খবর আমরা ঘরে বসিয়া জানিতে পারি। জ্যোতিষ্কগুলির প্রাকৃতিক অবস্থা কি প্রকার এবং তাহাতে

কোন্ কোন্ পদার্থ প্রজ্বলিত হইতেছে, ঐ যন্ত্রদ্বারা তাহা স্পষ্ট ধরা পড়ে। অনেক নীহারিকাময় জ্যোতিষ্ক (Nebulae) পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখা গিয়াছে, সেগুলির জটিল উপাদান তাপ সাহায্যে বিযুক্ত হইয়া পড়িলে, যন্ত্রে কতকগুলি সরল পদার্থের লক্ষণ প্রকাশ হইয়া পড়ে এবং কালক্রমে তাহাই শীতল হইয়া পড়িলে নানা জটিল পদার্থের চিহ্ন দেখা যায়। সুতরাং এখানে কতকগুলি মৌলিক জড়পদার্থ একবার বিযুক্ত হইয়া সেই বিয়োগ-জাত পদার্থ হইতে যে আবার নানা মৌলিক পদার্থের উৎপত্তি করে, এ কথা স্বীকার করিতেই হয়। এই ব্যাপার ছাড়া সুবিখ্যাত রসায়নবিদ্ র‍্যামজে (Sir William Ramsay) সাহেব কয়েকটি পরীক্ষায় মৌলিক পদার্থকে স্পষ্ট পদার্থান্তরে পরিবর্ত্তিত হইতে দেখিয়াছেন।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, তবে কি সত্যই বিশ্বে উপাদানের বিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের পুনর্গঠন চলিতেছে? সত্য হইলে বলিতে হয়,—বিশ্বস্থ পদার্থ সমোষ্ণ হইয়া আর সৃষ্টিনাশ করিতে পারিবে না। কিন্তু প্রশ্নটির স্পষ্ট উত্তর কোন বৈজ্ঞানিকই অদ্যাপি দিতে পারেন নাই। জ্যোতিষ্ক-পর্য্যবেক্ষণে ও অধ্যাপক র‍্যাম্‌জের পরীক্ষায় পদার্থের পুনর্গঠনের আভাসমাত্র পাওয়া গিয়াছে, ইহার উপর নির্ভর করিয়া এখন স্পষ্ট উত্তর দেওয়া অসম্ভব। সমোষ্ণপদার্থস্থ শক্তির কার্য্যক্ষমতার কথা ক্লার্ক-ম্যাক্স্‌ওয়েল সাহেব বলিয়াছেন সত্য, কিন্তু সেটি এত অপরীক্ষিত ব্যাপার যে, তাহার উপর নির্ভর করিয়াও কোন কথা বলা চলে না। কাজেই, এই প্রশ্নের সুমীমাংসার জন্য কিছুদিন কোন এক ভবিষ্য আবিষ্কারের প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে। প্রতীক্ষাকাল প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। মহাবিষ্কারটির ছায়া দেখা দিয়াছে, শীঘ্রই তাহার সুস্পষ্ট পূর্ণমূর্ত্তি দেখা যাইবে। যে সকল মহাসত্যের সাক্ষাৎ পাইয়া আমাদের অতি-প্রাচীন ঋষিরা বলিয়াছিলেন—

"ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বম্"

"আত্মৈবেদং সর্ব্বম্"

আজ বহুসহস্রবৎসর পরে হয়ত পাশ্চাত্যপণ্ডিতগণ বিজ্ঞানালোকে সেই সত্যকে দেখিয়া বলিবেন, জগতের স্রষ্টা যেমন অনন্ত এবং জরামৃত্যু-রহিত, তাঁহার সৃষ্টিও সেই-সকল-গুণসম্পন্ন।

এইত গেল পৃথিবীর স্বাভাবিক মৃত্যুর কথা। এখন শীঘ্র ইহার কোন অপমৃত্যুর সম্ভাবনা আছে কি না, আলোচনা করা যাউক। মানুষের অপমৃত্যুর কাল যেমন ডাক্তার-কবিরাজ নাড়ী দেখিয়া বলিতে পারেন না, সেইপ্রকার বৈজ্ঞানিকের নিকট পৃথিবীর অপমৃত্যুর খবর পাওয়া যায় না। প্রাচীন জ্যোতিষিগণ ধূমকেতুর ধাক্কা ইত্যাদির উল্লেখ করিয়া যথেষ্ট বিভীষিকা দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু এখন আর সে কথায় ভয় পাইবার কারণ নাই। ধূমকেতু নিজেই এমন লঘু যে, তাহার সংঘর্ষণে পৃথিবীর অপমৃত্যুর সম্ভাবনা নাই। অপমৃত্যুর ভয় যাহাদের অধিক, ডাক্তার-কবিরাজের নিকট না গিয়া তাহারা দৈবজ্ঞের নিকট কর-কোষ্ঠী দেখাইয়া শান্তি-স্বস্ত্যয়নের ব্যবস্থা করে। পৃথিবীর অপমৃত্যু সম্বন্ধে পুরাণকার দৈবজ্ঞ ঠাকুরগণ কি বলেন, এখন আলোচ্য।

আমাদের অতি প্রাচীন ইতিহাস মহাভারত গ্রন্থে বর্ণিত আছে :—

"ততো দিনকরৈর্দীপ্তৈঃ সপ্তভিমনুজাধিপ।
পীয়তে সলিলং সর্ব্বং সমুদ্রেষু সরিৎসু চ॥
যচ্চ কাষ্ঠং তৃণঞ্চাপি শুষ্কং চার্দ্রঞ্চ ভারত।
সর্ব্বং তদ্ভস্মসাদ্ভূতং দৃশ্যতে ভারতর্ষভ॥
ততঃ সম্বর্ত্তকো বহ্নির্বায়ুনা সহ ভারত।
লোকমাবিশতে পূর্ব্বমাদিত্যৈরুপশোষিত॥

ততঃ স পৃথিবীং ভিত্বা প্রবিশ্য চ রসাতলম্।
দেবদানবযক্ষাণাম্ ভয়ং জনয়তে মহৎ॥
নিদহন্নাগলোকঞ্চ যচ্চকিঞ্চিৎ ক্ষিতাবিহ।
অধস্তাৎ পৃথিবীপাল সর্ব্বং নাশয়তে ক্ষণাৎ॥"

মহাভারত, বনপর্ব্ব। ১৮৮ অধ্যায়। ৬৫—৭১ শ্লোক।

অর্থাৎ তারপর (প্রলয় কালে) দীপ্ত সাতটি সূর্য্য নদী ও সমুদ্রসমূহের সমস্ত জল শোষণ করিয়া লইবে। আর্দ্র ও শুষ্ক সমস্ত তৃণই ভস্মীভূত হইয়া পড়িবে এবং তৎসহ সপ্তসূর্য্য দ্বারা শুষ্ক পৃথিবীতে সংবর্ত্তক নামক অগ্নি বায়ুর সহিত উপস্থিত হইয়া পাতালে প্রবেশ করিবে। ইহা দেবদানব-যক্ষগণের মহৎ ভয়ের কারণ হইবে। এই অগ্নিই নাগলোক ও পৃথিবীর অধঃস্থিত দ্রব্য সমুদায় ও অপর পদার্থ মাত্রকেই ধ্বংস করিয়া ফেলিবে।

খৃষ্টানদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ বাইবেলে লিখিত আছে :—

"Moreover, the light of the moon shall be as the light of the sun, and light of the sun shall be sevenfold as the light of seven days in the day Lord bindeth the breach of his people, and healeth the stroke of their wound."

Isaiah (chap. 30, v. 26)

অর্থাৎ,—সেই প্রলয়দিনে চন্দ্রালোক সূর্য্যালোকের ন্যায় উজ্জ্বল হইবে এবং সূর্য্যালোক সাতদিনের একত্রীভূত আলোকের ন্যায় সাতগুণ উজ্জ্বল হইবে।

পূর্ব্ব ও পশ্চিম দেশীয় দুইখানি অতি প্রাচীন গ্রন্থে পৃথিবীর পরিণাম সম্বন্ধীয় উক্তির এই প্রকার ঐক্য বড় বিস্ময়কর।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে পৃথিবী সম্বন্ধে ঋষিগণ যে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছেন, তাহা কি সম্ভবপর? একদল লোক বলেন, দৈববলে

বলীয়ান্ ঋষিরা অভ্রান্ত। সুতরাং পৃথিবীর ধ্বংস যে শাস্ত্রোক্ত প্রকারেই হইবে, তাহা নিঃসন্দেহ। আমরা এই শ্রেণীর লোকের যুক্তিতর্কের উপর কোনও কথা বলিব না। যে একদল লোক বিজ্ঞানসাহায্যে পূর্ব্বোল্লিখিত প্রাচীন উক্তিগুলির সত্যতা প্রতিপন্ন করিতে চাহেন তাঁহাদের কথাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

এ সম্বন্ধে শেষোক্ত সম্প্রদায়ে দুইটি মতবাদের প্রচলন দেখা যায়। কতকের মতে, ভূ-গর্ভনিহিত তাপই পৃথিবীর ধ্বংসের কারণ হইবে। অর্থাৎ পৃথিবী নিজের তাপেই ভস্মীভূত হইয়া পূর্ব্বোক্ত প্রাচীন বাক্যের সাফল্য দেখাইবে। বলা বাহুল্য, এই সিদ্ধান্তটিকে কোনক্রমে বিজ্ঞান-সম্মত বলা যায় না। ভূ-গর্ভের তাপ যে, ক্রমেই হ্রাস হইয়া আসিতেছে; তাহার প্রমাণের অভাব নাই। কাজেই, সেই ক্ষীয়মাণ তাপদ্বারা অতি দূর ভবিষ্যতে পৃথিবীর আকস্মিক ধ্বংসসম্ভাবনা, কোনো বৈজ্ঞানিকেরই কল্পনায় স্থান পাওয়া উচিত নয়। ঐ দলের অপর বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, যে সূর্য্য হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি হইয়াছে, সেই সূর্য্যই অকস্মাৎ প্রজ্বলিত হইয়া পৃথিবীর লয় সাধন করিবে। কথাটা আলোচ্য বটে।

সূর্য্য অকস্মাৎ উজ্জ্বলতর হইয়া পৃথিবীকে ধ্বংস করিবে শুনিলেই, সৌরাকাশে প্রায় প্রতি বৎসরেই যে প্রবল ঝটিকাবর্ত্ত উঠিয়া সৌর কলঙ্কাদির উৎপত্তি করে, তাহারি কথা আমাদের মনে আসিয়া পড়ে। এই সকল ঝটিকাবর্ত্ত যে খুব বৃহৎ ও ভয়ঙ্কর ব্যাপার, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। লক্ষ লক্ষ মাইল দূরে থাকিয়াও আমরা ইহাদের প্রভাব বুঝিতে পারি। কিন্তু যাহাতে পৃথিবী হঠাৎ ধ্বংস হইতে পারে, এপ্রকার সৌরোৎপাতের একটু লক্ষণও আমরা দেখিতে পাই নাই। সুতরাং সূর্য্যকর্ত্তৃক পৃথিবীর ধ্বংসসম্ভাবনা থাকিলে, তাহার আভ্যন্তরীণ অগ্নি দ্বারা যে সে কার্য্য কোনক্রমে সম্পন্ন হইবে না, তাহা আমরা সহজেই বুঝিতে পারি। সূর্য্যের

আকস্মিক প্রজ্বলনের জন্য বহিঃস্থ কোন জ্যোতিষ্কের সহিত ইহার সংঘর্ষ একান্ত আবশ্যক। ইহা ছাড়া অপর কোন উপায়ে পৃথিবীকে ধ্বংস করিবার উপযোগী তাপ সূর্য্যমণ্ডলে জন্মাইতে পারে না।

নূতন নক্ষত্রের আকস্মিক আবির্ভাব জ্যোতিঃশাস্ত্রের ইতিহাসে অভিনব ব্যাপার নয়। কয়েক বৎসর অতীত হইল, বৃষরাশির নিকটবর্ত্তী পারসিয়ুস্ (Perseus) রাশিতে জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ ঐ প্রকার একটি নূতন নক্ষত্রের প্রজ্বলন দেখিয়াছিলেন, এবং কোন দুইটি অনুজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের সংঘর্ষে এই অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হইয়াছিল বলিয়া ইঁহারা সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। সুতরাং আমাদের সূর্য্য ঐ প্রকার কোনও জ্যোতিষ্কের ধাক্কা পাইয়া জ্বলিয়া উঠিতে পারে না কি ?

এই প্রশ্নটির উত্তর দেওয়া সহজ নয়। আমাদের পরিচিত নক্ষত্রগুলি সৌরজগৎ হইতে এত অধিক দূরে অবস্থিত যে, অতি দ্রুতবেগে ধাবিত হইলেও হাজার হাজার বৎসর অতিবাহন না করিয়া সূর্য্য নিকটতম তারকাটির কাছে উপস্থিত হইতে পারে না।

দক্ষিণাকাশের সেণ্টারস্ (Centaurus) রাশির একটি নক্ষত্রকে জ্যোতিষিগণ আমাদের নিকটতম তারকা বলিয়া থাকেন। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, সূর্য্য যদি প্রতি সেকেণ্ডে দশ মাইল বেগে ছুটিয়া আমাদের সেই নিকটতম প্রতিবেশীর দিকে অগ্রসর হয়, তবে পথিমধ্যে প্রায় আশী হাজার বৎসর কাটিয়া যাইবার সম্ভাবনা। সুতরাং আশী হাজার বৎসর পরে সূর্য্যের সহিত কোন নক্ষত্রের সংঘর্ষ হইবে কি না, তাহা এখন আলোচনা না করিলেও চলিতে পারে। দুই চারি হাজার বৎসরের মধ্যে সৌরজগতের কোনও বিপদ আছে কি না, তাহাই প্রথমে আমাদের আলোচ্য।

জ্যোতিষিগণ বলেন, আমরা রাত্রিকালে নগ্ন চক্ষু দ্বারা বা দূরবীণ সাহায্যে যে সকল নক্ষত্র দেখিতে পাই, তাহা ছাড়া আর এক জাতীয়

তারকা সর্ব্বদাই আকাশের নানা স্থানে বিচরণ করিয়া বেড়ায়। আকার প্রকারে আমাদের পরিচিত নক্ষত্রগুলির সহিত ইহাদের বিশেষ কোন অনৈক্য নাই। বহুকাল তাপালোক বিকিরণ করিয়া অনুজ্জ্বল হইয়া পড়ায় ইহাদিগকে আমরা দেখিতে পাই না মাত্র। সুতরাং এখন প্রশ্ন হইতে পারে, ঐ প্রকার কোনও নিকটবর্ত্তী অনুজ্জ্বল নক্ষত্রের সংঘর্ষণে সূর্য্য কি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিতে পারে না? ইহার উত্তরে আধুনিক জ্যোতিষিগণ বলিতেছেন,—যদি কোন সময়ে সূর্য্যের তাপাধিক্যে পৃথিবীর ধ্বংস সম্ভবপর হয়, তবে আমাদের দৃষ্টিবহির্ভূত কোন অনুজ্জ্বল তারকার সংঘর্ষেই তাহা সংঘটিত হইবে। বৃহস্পতি, শনি ইত্যাদি গ্রহ যেমন তাহাদের ক্ষুদ্র উপগ্রহগুলিকে সঙ্গে করিয়া আকাশের এক দিক লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, সূর্য্যও সেই প্রকার সমস্ত সৌরপরিবারকে সঙ্গে লইয়া, আকাশের একদিক লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়াছে। সূর্য্যের এই স্বকীয় গতি আবিষ্কৃত হওয়ার পর, গতির দিক্ লইয়া পণ্ডিতসমাজে কিছুদিন তর্ক-বিতর্ক চলিয়াছিল। সম্প্রতি তর্কদ্বন্দ্বের অবসান হইয়াছে এবং সকলেই একবাক্যে বলিতেছেন, সৌরজগৎ প্রতি সেকেণ্ডে দশ মাইল বেগে লাইরা (Lyra) রাশিস্থ অভিজিৎ (Uega) নক্ষত্রকে লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। সুতরাং সূর্য্য ও অভিজিৎ নক্ষত্রের মধ্যবর্ত্তী স্থানে কোনও অনুজ্জ্বল মৃত নক্ষত্র সৌরজগতের গতিরোধ করিয়া দাঁড়াইলে, উভয়ের সংঘর্ষণে যে একটা বিকট অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

অধ্যাপক গোর্ (I. E. Gore) একজন খ্যাতনামা ইংরাজ জ্যোতিষী। ভবিষ্যতে সূর্য্যের সহিত কোনও অনুজ্জ্বল নক্ষত্রের সংঘর্ষণ নিতান্ত অসম্ভব নয় ভাবিয়া, তিনি এ সম্বন্ধে গণনা আরম্ভ করিয়াছিলেন, এবং সম্প্রতি তাহার ফল প্রকাশ করিয়াছেন। সূর্য্য ও অভিজিৎ নক্ষত্রের মধ্যবর্ত্তী কোনও স্থানে সূর্য্যের ন্যায় বৃহৎ ও গতিশীল একটি অনুজ্জ্বল নক্ষত্রের অস্তিত্ব

কল্পনা করিয়া গণনা করা হইয়াছিল। হিসাবে দেখা গেল, ঐ কাল্পনিক নক্ষত্র ও সূর্য্যের পরস্পর ব্যবধান একশত পঞ্চাশ কোটি মাইল না হইলে, আমরা পৃথিবী হইতে নক্ষত্রটির অস্তিত্ব পর্য্যন্ত জানিতে পারিব না। এই ব্যবধানে এটি সূর্য্যের আলোকে আলোকিত হইয়া, একটি নবম শ্রেণীর তারকার ন্যায় আমাদিগকে দেখা দিবে।

দুইটি গতিশীল পদার্থ পরস্পরের নিকটবর্ত্তী হইতে আরম্ভ করিলে, মহাকর্ষণের নিয়মানুসারে তাহাদের বেগ দ্রুততর হইয়া আসে। গতি-বিজ্ঞানের এই নিয়ম অবলম্বনে হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, সূর্য্য ও সেই কল্পিত নক্ষত্রের ব্যবধান দেড়শত কোটি মাইল হইতে ছয় কোটি মাইলে পরিণত হইতে প্রায় বারো বৎসর অতিবাহিত হইবে, এবং সেই সময়ে নক্ষত্রটিকে আমরা পঞ্চম শ্রেণীর তারকার ন্যায় উজ্জ্বল দেখিতে থাকিব। পঞ্চম শ্রেণীর নক্ষত্র খুব উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক নয়; সুতরাং সূর্য্যের এত নিকটে আসিয়াও সেটি অবৈজ্ঞানিক জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিবে না। কিন্তু ইহার পর ব্যবধান এত দ্রুত কমিতে আরম্ভ করিবে যে, পরবর্ত্তী চারি বৎসরের মধ্যে নক্ষত্রটি বৃহস্পতির কক্ষার নিকটবর্ত্তী হইয়া উজ্জ্বলতায় দুইটি শুক্র ও চারিটি বৃহস্পতির সমকক্ষ হইয়া দাঁড়াইবে। দ্বিতীয় চন্দ্রের ন্যায় ইহাকে আকাশে উদিত দেখিয়া এই সময়ে ধরাবাসী-মাত্রেরই বিস্মিত হইবার সম্ভাবনা।

ইহার পর সৌরজগৎ কি প্রকার বেগে সংহারক নক্ষত্রটির নিকটবর্ত্তী হইতে আরম্ভ করিবে, গোর সাহেব তাহারো হিসাব করিয়াছেন। এই গণনায় দেখা যায়, ৫১ দিনে পৃথিবীর কক্ষা অতিক্রম করিয়া পরবর্ত্তী অষ্টাহের মধ্যে সেটি এত প্রবলবেগে সূর্য্যে আসিয়া ধাক্কা দিবে যে, সেই সংঘর্ষজাত তাপ দ্বারা সৌরজগৎ মুহূর্ত্তে এক নীহারিকায় পর্য্যবসিত হইয়া পড়িবে।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, সূর্য্যের উপর পড়িবার পূর্ব্বে সংহারক নক্ষত্রটি যখন ভূ-কক্ষার নিকটবর্ত্তী হইবে, তখন ইহার টানে পৃথিবীর কোনও অনিষ্ট হইতে পারে কিনা? গোর্ সাহেব এ সম্বন্ধেও পৃথক্ গণনা করিয়াছেন। ইহা হইতে দেখা যায়, নক্ষত্রটি যদি সূর্য্যের গন্তব্য পথ ধরিয়া কোন বৎসরের ২১ জুন তারিখে ভূ-কক্ষার নিকটবর্ত্তী হয়, তাহা হইলে সূর্য্যের উপর পড়িবার পূর্ব্বেই নক্ষত্রটি দ্বারা পৃথিবীর ধ্বংস নিশ্চিত। এই অবস্থায় তারকাটি এত জোরে পৃথিবীকে টানাটানি করিতে থাকিবে যে, সূর্য্য কোন ক্রমেই সেই টান্ সাম্‌লাইতে পারিবে না। নক্ষত্র বক্র গতিতে সৌরজগতে প্রবেশ করিলে, আমাদের পৃথিবীর অবস্থা কি প্রকার হওয়ার সম্ভাবনা, গোর্ সাহেবের গণনা দৃষ্টে তাহাও জানা যায়। এই গণনায় নাক্ষত্রিক সংঘর্ষণ হইতে সূর্য্যের মুক্তির সম্ভাবনা দেখা যায়, কিন্তু তাহাতে আমাদের ক্ষুদ্র পৃথিবীটি যে নিরাপদ থাকিতে পারিবে, তাহা কোন ক্রমেই মনে হয় না। সুতরাং দেখা যাইতেছে, মহাভারতকার।ও বাইবেলের লেখক বহু শতাব্দী পূর্ব্বে, পৃথিবীর পরিণাম সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত দাঁড় করাইয়াছিলেন, তাহা একবারে অসম্ভব নয়।

জ্যোতিষ শাস্ত্রের উন্নতির সহিত আজকাল নক্ষত্র পর্য্যবেক্ষণের উপযোগী অনেক যন্ত্রের আবিষ্কার হওয়ায়, আকাশের কোন্ অংশে কতগুলি নক্ষত্র দেখা যায়, তাহা স্থির হইয়া গিয়াছে। এজন্য এখন অতি সহজেই নূতন জ্যোতিষ্কের আবির্ভাব তিরোভাব ধরা পড়িয়া যায়। সৌরজগতের গন্তব্য স্থান সেই লাইরা রাশিতে বহু অনুসন্ধান করিয়াও অদ্যাপি কোন নূতন নক্ষত্রের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় নাই। সুতরাং গোর্ সাহেবের কথায় বিশ্বাস করিলে বলিতে হয়, আগামী চৌদ্দ বৎসরের মধ্যে পুরাণোক্ত প্রকারে পৃথিবীর ধ্বংস হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই।

জীবের জন্মকাল

এই জলস্থলময় পৃথিবী কতদিন পূর্ব্বে জীববাসের উপযোগী হইয়াছিল, তাহা স্থির করিবার জন্য গত শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকগণ অনেক গবেষণা করিয়াছিলেন। প্রাচীন বৈজ্ঞানিকগণ নানা জ্যোতিষ্কলোকে অগ্নিভুক্ ও শিলাময় জীবের কল্পনা করিয়াছেন; বলা বাহুল্য, এগুলি কেবল কল্পনা-প্রসূত। পৃথিবীতে কোনকালে ঐ প্রকার জীব ছিল কি না, আমরা তাহার আলোচনা করিব না। যাহাদের শরীর সেই নাইট্রোজেন-ঘটিত জীবসামগ্রী (Protoplasm) দ্বারা গঠিত এবং যাহারা বায়ু বা জলস্থিত অক্সিজেন্ সংগ্রহ করিয়া জীবিত থাকে, আমরা এখানে তাহাদিগকে জীব বলিব। লোকান্তরে বা গ্রহান্তরে কোন অদ্ভুত জীব আছে কি না এবং তাহাদের কোন বংশধর কোন কালে আমাদের পৃথিবীতে বাসা বাঁধিয়াছিল কি না, তাহা আমাদের আলোচ্য নয়।

প্রথমেই আমরা দেখিতে পাই, পৃথিবীর জীবগুলিকে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে, তাহাদের আবাসভূমির অবস্থা জীবনরক্ষার অনুকূল হওয়া আবশ্যক। ইহা না হইলে কোন জীবই টিকিয়া থাকিতে পারে না। চতুষ্পার্শ্ব যদি বরফের ন্যায় শীতল হয়, তবে সাধারণ উদ্ভিদের ন্যায় জীব বায়ুর অঙ্গারক বাষ্প গ্রহণ করিয়া পুষ্ট হইতে পারে না। কাজেই, সে অবস্থা জীববাসের প্রতিকূল। উষ্ণতার মাত্রা পঞ্চাশ ডিগ্রির উপরে উঠিলে উদ্ভিদ্‌কে মৃতপ্রায় হইতে দেখা যায়। সুতরাং এই অবস্থাকেও কখন জীববাসের উপযোগী বলা যায় না। অগ্রে উদ্ভিদ্ এবং পরে প্রাণী। কারণ উদ্ভিদ্ হইতেই প্রাণীর উৎপত্তি এবং উদ্ভিদের অস্তিত্ব লইয়াই প্রাণীর অস্তিত্ব। সুতরাং

উষ্ণতার ঐ দুই সীমার বাহিরে যদি উদ্ভিদের সৃষ্টি অসম্ভব হয়, তবে প্রাথমিক প্রাণীরও তাহাতে টিকিয়া থাকা অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়।

এখন প্রশ্নটি বেশ সহজ হইয়া আসিল। তাপ বিকিরণ করিতে করিতে আমাদের পৃথিবীর অন্ততঃ কিয়দংশ কোন্ সময়ের উষ্ণতার উক্ত দুই সীমার মধ্যবর্ত্তী হইয়াছিল, এখন তাহাই বিচার্য্য। তাছাড়া রৌদ্রবৃষ্টি, দিনরাত্রির পরিমাণ ইত্যাদির উপরও যখন জীবের জীবনমৃত্যুর ব্যাপার নির্ভর করে, তখন পৃথিবীর এই প্রাকৃতিক অবস্থাগুলি কোন্ সময়ে ঠিক এখনকার মত হইয়াছিল, তাহাও স্থির করা আবশ্যক।

জীবরাজ্যের প্রতিষ্ঠাকাল-নির্ণয়ের জন্য জ্যোতিষিগণের শরণাপন্ন হওয়া বৃথা। তবুও দিবারাত্রির ভেদ এবং সৌর তাপালোকের পরিমাণাদি দ্বারা জীবের স্বাস্থ্য নিয়মিত হয় বলিয়া, এ সম্বন্ধে জ্যোতিষিক মতামত গ্রহণের প্রয়োজন দেখা যায়।

জ্যোতিষিগণের নিকট আমাদের প্রথম জিজ্ঞাস্য এই যে, আমরা এখন দিবা ও রাত্রির যে একটা সুন্দর বিভাগ দেখিতে পাইতেছি, তাহা কি পৃথিবীর জন্মকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে?

এই প্রশ্নের উত্তরে তাঁহারা বলেন, দিবারাত্রির বিভাগ জ্যোতিঃশাস্ত্রের হিসাবে একটা সম্পূর্ণ আধুনিক ব্যাপার। অধিক দিনের কথা নয়, সাতাইশ শত বৎসর পূর্ব্বে বাবিলনের জ্যোতিষিগণ, যে হিসাবে গ্রহণাদির গণনা করিয়া গিয়াছেন, এখন আর সে হিসাবে গণনা চলে না। সেই প্রাচীন হিসাব পরীক্ষা করিলে দেখা যায়, সে সময় পৃথিবীর আবর্ত্তনবেগ (Rotation) স্পষ্ট অধিক ছিল, অর্থাৎ তখনকার দিনরাত্রিগুলা ছোট ছোট ছিল। সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতিষী আডাম্‌স্ (Adams) সাহেব গণনা করিয়া দেখাইয়াছেন, এখনও পৃথিবীর আবর্ত্তনবেগ প্রতি শতাব্দীতে বাইশ সেকেণ্ড কমিয়া কমিয়া আসিতেছে। পরিমাণটা খুবই অল্প বটে কিন্তু বহু শতাব্দীতে

এই তিলগুলি জমিয়াই তাল হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং দূর অতীতকালে পৃথিবী যে, অত্যন্ত প্রবল বেগে আবর্ত্তন করিয়া তখনকার দিনরাত্রি-গুলিকে খুব ছোট করিয়া তুলিত, তাহা সুনিশ্চিত।

আবর্ত্তনবেগ ক্রমে মন্থর হইয়া কোন্ সময়ে এখনকার মত দিবারাত্রির বিভাগ করিয়াছিল, এখন আলোচনা করা যাউক। কোন বর্ত্তুলাকার কোমল জিনিসকে লাট্টুর মত ঘুরাইতে থাকিলে, তাহার উপর ও নীচেকার অংশগুলা কেন্দ্রাপসারণী শক্তিতে (Centrifugal force) গোলকের মাঝামাঝি অংশে জমা হইয়া তাহাকে চেপ্টা করিয়া দেয়। আমাদের পৃথিবীর আকার অবিকল ঐ চেপ্টা গোলকের মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পৃথিবী যখন কোমল অবস্থায় ছিল, উহার দৈনিক আবর্ত্তনগতিতে উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর নিকটবর্ত্তী স্থানের যত গলিত শিলামৃত্তিকা বিষুবপ্রদেশে আসিয়া জমা হইত। তার পর এই অবস্থাতে জমাট বাঁধিয়া যাওয়ায়, পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ দিক্‌টা তখনকার মত চাপা থাকিয়া গিয়াছে। চাপার পরিমাণ হিসাব করিলে দেখা যায়, পৃথিবীর উত্তর-দক্ষিণের ব্যাস পূর্ব্ব-পশ্চিমের ব্যাস অপেক্ষা মোটে সাতাইশ মাইল কম। ইহা হইতে সুবিখ্যাত পণ্ডিত লর্ড কেলভিন্ (Kelvin) গণনা করিয়াছেন, দশ কোটি বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবী জমাট বাঁধিতে আরম্ভ করিয়াছিল। ইহার পূর্ব্বে জমাট বাঁধিলে সেই সময়ের প্রবল আবর্ত্তনবেগে পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ আরও চাপা হইয়া পড়িত। সুতরাং দেখা যাইতেছে, অন্ততঃ দশ কোটি বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবী কখনই জীবের আবাসভূমি ছিল না।

লর্ড কেলভিন্ এই গণনা করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই। তাপবিকিরণ করিতে করিতে কত কালে পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ শীতল হইয়া বর্ত্তমান অবস্থায় আসিয়াছে, তিনি তাহারও এক হিসাব করিয়াছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, পূর্ব্বোক্ত গণনাফলের সহিত এই গণনার ফলের ঐক্য দেখা গিয়াছিল।

হিসাবটি অতি সহজ। সুড়ঙ্গ খনন করিয়া ভূগর্ভের উত্তাপ পরিমাপ করিতে গেলে দেখা যায়, প্রতি পঞ্চাশ বা যাট ফিটে সুড়ঙ্গের উত্তাপ এক ডিগ্রি করিয়া বাড়িয়া চলিতেছে। ইহা হইতে সহজেই অনুমান করা যায় যে, পৃথিবীর উপরের স্তরগুলি ভিতর হইতে যে তাপ টানিয়া লয়, তাহা স্তরে সঞ্চিত থাকিতেছে না। স্তরপরম্পরায় ঐ তাপের এক অজস্র বিকিরণ আসৃষ্টি চলিয়া আসিতেছে। আমাদের পৃথিবী বৎসরে যে তাপ বিকিরণ করে, লর্ড কেল্‌ভিন্ তাহার এক হিসাব করিয়াছিলেন। সুতরাং অত্যুষ্ণ গলিত অবস্থা হইতে আধুনিক অবস্থায় আসিতে পৃথিবী কত কাল অতিবাহন করিয়াছে, এই হিসাবে তাহা স্থির করা যায়।

যাহা হউক, দুই গণনায় একই ফল দেখিয়া লর্ড কেল্‌ভিন্ বড় বিস্মিত হইয়াছিলেন এবং দশ কোটি বৎসর পূর্ব্বে যে পৃথিবী জীববাসের সম্পূর্ণ অনুপযোগী ছিল, তাহা সকলেই বুঝিয়াছিলেন। এখন জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে, দশ কোটি বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীতে জীবের বাস ছিল না সত্য, কিন্তু কোন্ সময় হইতে ইহাতে জীবের উৎপত্তি আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা কি অনুমান করা চলে না? লর্ড কেল্‌ভিন শীতাতপ ও জলস্থলের ক্রমিক সমাবেশের উপর লক্ষ্য রাখিয়া বলিয়াছিলেন, জীবরাজ্যের প্রতিষ্ঠা কখনই দুই কোটি বৎসরের পূর্ব্বে হয় নাই। দশ কোটি বৎসর পূর্ব্বে সৃষ্টির অভিব্যক্তি আরম্ভ হইয়াছিল মাত্র, তাহার পূর্ণ পরিণতি হইতে এবং ভূপৃষ্ঠের সর্ব্বাংশ জীববাসোপযোগী হইতে উহার পর আট কোটি বৎসর নিশ্চয়ই কাটিয়া গিয়াছিল।

লর্ড কেল্‌ভিনের পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত ভূ-তত্ত্ববিদ্‌গণের মনের মত হয় নাই। জীবরাজ্যের প্রতিষ্ঠাকাল নির্দ্ধারণের জন্য ইহারা আর এক প্রথায় নূতন করিয়া গবেষণা আরম্ভ করিয়াছিলেন। পাঠক অবশ্যই জানেন, ভূগর্ভ পরীক্ষা করিলে পরে পরে সজ্জিত নানা স্তরে প্রাচীন ও আধুনিক

বহু জীবের কঙ্কাল দেখা যায়। সুতরাং সেই সকল স্তরের উৎপত্তিকালে যে, পৃথিবীতে জীবের অস্তিত্ব ছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। জীবকঙ্কালবিশিষ্ট স্তরগুলি কত দিনে সঞ্চিত হইয়াছিল, প্রথমে তাহাই অবধারণ করিবার জন্য ভূতত্ত্ববিদ্গণ সচেষ্ট হইয়াছিলেন। ভূগর্ভের এক লক্ষ ফিটের নীচে আর জীবকঙ্কাল পাওয়া যায় না। সুতরাং এই একলক্ষ ফিট স্তর জমিতে যত বৎসর লাগে, অন্ততঃ সেই সময়ে জীবের জন্ম হইয়াছিল বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হয়। ভূতত্ত্ববিদ্গণ এই প্রকারে জীবের জন্মকাল নির্দ্দেশ করিতে গিয়া দেখিয়াছিলেন, কঙ্কাল-বিশিষ্ট নিম্নতম স্তরে যে সকল শিলামৃত্তিকা আছে, তাহাদের সংস্থানে স্থানবিশেষে সাত কোটি হইতে সত্তর কোটি বৎসর লাগিয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ভূতত্ত্বের মতে সত্তর কোটি বৎসর পূর্ব্বেও আমাদের পৃথিবীতে জীবের অস্তিত্ব ছিল।

ভূতত্ত্ববিদ্গণ পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তের উপর দাঁড়াইয়া লর্ড কেল্‌ভিনের গণনার ঘোর প্রতিবাদ করিতেছেন। গত কয়েক বৎসর ধরিয়া উক্ত দুই দল পণ্ডিতের কলহ অবিরাম চলিতেছে, কিন্তু কেহই পরাভব স্বীকার করিতেছেন না। গণনার প্রণালী অভ্রান্ত হইলেও যে সকল স্বীকৃত তত্ত্ব (Data) লইয়া দুই দল পণ্ডিত গণনা করিয়াছিলেন, তাহাতে অনেক ভ্রম দেখা যায়। লর্ড কেল্‌ভিন বাবিলনীয় জ্যোতির্বিদগণের হিসাবপরীক্ষায় পৃথিবীর আবর্ত্তনবেগ কমিয়া আসিতেছে বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু পৃথিবী ও চন্দ্রের মধ্যে কাহার বেগ কমিয়া আসায় প্রাচীন ও আধুনিক জ্যোতির্বিদগণের হিসাবে অনৈক্য উপস্থিত হইয়াছে, তাহা লর্ড কেল্‌ভিন স্পষ্টতঃ দেখাইতে পারেন নাই। তারপর তিনি পৃথিবীর বর্ত্তমান আকার ও তাহার জমাট বাঁধিবার সময়কার আকার অভিন্ন বলিয়া যে একটা সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, তাহাতেও আপত্তি চলে।

জমাট হওয়ার পর পৃথিবীর আকারের যে কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই একথা কোন বৈজ্ঞানিকই সাহস করিয়া বলিতে পারেন না। ভূপৃষ্ঠ হইতে কেন্দ্রের দিকে নামিলে উষ্ণতার বৃদ্ধি হয় সত্য, কিন্তু ভূপৃষ্ঠের সকল অংশেই যে একই মাত্রায় উষ্ণতার বৃদ্ধি পায়, তাহার পরীক্ষাসিদ্ধ প্রমাণ আজও সংগৃহীত হয় নাই। তাছাড়া রেডিয়ম্ নামক যে তেজোনির্গমনক্ষম এক ধাতুর আবিষ্কার হইয়াছে, তাহা যদি ভূগর্ভে অধিক পরিমাণে থাকে তাহা হইলেও কেল্‌ভিনের গণনায় ভুল আসে। সুতরাং গভীরতা বৃদ্ধির সহিত প্রত্যেক পঞ্চাশ ফুটে এক ডিগ্রি পরিমাণ উষ্ণতার বৃদ্ধি স্বীকার করিয়া লইয়া, লর্ড কেল্‌ভিন্ যে গণনা করিয়াছেন, তাহা নিঃসন্দেহে অভ্রান্ত বলা যায় না। ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের গণনার স্থলেও ঐ প্রকার অনেক দোষ দেখা যায়। কাজেই, জীবের জন্মকাল সম্বন্ধে উক্ত দুই মতবাদের মধ্যে কোন্‌টি সত্য, তাহা ঠিক করিয়া বলা অসম্ভব।

সম্প্রতি কয়েকজন বিখ্যাত জীবতত্ত্ববিৎ পূর্ব্বোক্ত প্রতিদ্বন্দ্বীদিগের মাঝে দাঁড়াইয়া অভিব্যক্তিবাদ সাহায্যে বিবাদের মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইঁহাদের ইচ্ছা ছিল, জীবের অভিব্যক্তির একটা কাল নির্ণয় করিয়া নিম্নতম জীব কতদিনে আধুনিক উচ্চতম জীবে পরিণত হইয়াছে, তাহা দেখাইবেন। কিন্তু জীব স্বভাবতঃ কতদিনে অভিব্যক্তির পথে কতটা অগ্রসর হয়, তাহা কোন জীবতত্ত্ববিৎ অনুমান করিতে পারেন নাই। কাজেই, চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া পড়িয়াছিল জীবের জন্মকাল নির্দ্ধারণ লইয়া বৈজ্ঞানিক মহলে যে তর্ককোলাহলের সূচনা হইয়াছে, তাহার শেষ কোথায়, তাহা এখন কেহই বলিতে পারিতেছেন না।

জীবের জন্ম

জীব হইতে জীবের উৎপত্তি হয়। কিন্তু অজৈব জিনিস হইতে জীবের উৎপত্তি হইতে পারে কি না, এই প্রশ্নটি লইয়া প্রায় চারিশত বৎসর ধরিয়া বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে খুব আলোচনা চলিতেছে। প্রতি বৎসরেই এই ব্যাপারের নূতন নূতন তথ্য প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে।

একটা কথা আছে—"নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্"। আমাদের বৈজ্ঞানিকগণ ঋষি না হইলেও তাঁহাদের মতের মধ্যে ঋষিজনোচিত যথেষ্ট বৈচিত্র্য থাকে। যাহা হউক, যখন প্রশ্ন উঠিল,—জীব কি কেবল জীব হইতেই প্রসূত? তখন একদল পণ্ডিত তাহাতে "হাঁ" দিলেন এবং আর কতকগুলি বৈজ্ঞানিক "না" বলিয়া একটা বৃহৎ দল গড়িয়া তুলিলেন।

জড়বিজ্ঞানের প্রথম যুগে ঐ "না"-বাদীর দলটিই খুব পুষ্ট ছিল। ইঁহারা উচ্চকণ্ঠে বলিতেন, প্রাণীর জন্মের জন্য সকল স্থানে পিতৃমাতৃত্ব আবশ্যক হয় না, আমাদের সমক্ষে নিয়তই অজৈব পদার্থ হইতে আপনা হইতেই জীবের জন্ম হইতেছে। ইহার উদাহরণ চাহিলে তাঁহারা বলিতেন, মৃত জীবের দেহ কিছুদিন রাখিয়া দাও, কয়েকদিন পরে দেখিবে, তাহাতে ছোট-বড় নানা প্রকার পোকা জন্মিয়াছে। এই সকল কীটকে কখনই মৃত জীবের বংশধর বলা যায় না, সুতরাং সেগুলি যে, আপনা হইতেই গলিত জীবদেহে উৎপন্ন হয়, তাহা আর অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে হেল্‌মণ্ট (Van Helmont) নামক জনৈক বৈজ্ঞানিক স্বতোজননবাদীদিগের মধ্যে বিলক্ষণ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহার অশেষ কীর্ত্তি আজও তাঁহার নানা পুস্তকে

লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। স্বতোজননের উদাহরণ দিতে গিয়া ইনি বলিয়াছিলেন, একটি পাত্রে কতকগুলি ধান্য বা গোধূম রাখিয়া একখণ্ড অপরিচ্ছন্ন বস্ত্র দ্বারা যদি তাহার মুখ বন্ধ করা যায়, তবে একুশ দিন পরে দেখিবে, বস্ত্রের দুর্গন্ধীবাষ্প শস্যের সহিত মিশিয়া বড় বড় মূষিক উৎপন্ন করিয়াছে। এই বৈজ্ঞানিকটি দুর্গন্ধকেই স্বতোজননের মূল কারণ বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। জলাভূমির নীচেকার দুর্গন্ধময় বাষ্পই ভেক, জোঁক ও নানাজাতীয় মৎস্যাদি উৎপন্ন করে বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস ছিল

সুতরাং দেখা যাইতেছে, যে সময়ে হেল্‌মণ্টের ন্যায় বৈজ্ঞানিকগণ তর্ক-জাল বিস্তার করিয়া বিজ্ঞানজগতে আধিপত্য করিতেছিলেন, তখন বিজ্ঞানের কোন কথাই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবার মত ছিল না। যে দুই একজন বৈজ্ঞানিক স্বতোজননের বিরোধী ছিলেন, হেল্‌মণ্ট-প্রমুখ বৈজ্ঞানিকদিগের উচ্চ কোলাহলে তাঁহাদিগকে নির্ব্বাক্‌ হইয়া থাকিতে হইয়াছিল।

স্বতোজননবাদীদিগের এই প্রাধান্য কতকাল হইতে চলিয়া আসিতেছিল, তাহা ঠিক করিয়া বলা কঠিন। তবে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষকালে বিখ্যাত ইটালিয়ান বৈজ্ঞানিক রেডি সাহেব (Francesco Redi) উক্ত মতবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইলে যে ঐ দলের অধঃপতন হইয়াছিল তাহা নিশ্চিত।

রেডি সাহেব এক খণ্ড মাংস ও একখানি সূক্ষ্ম বস্ত্র হাতে করিয়া বৈজ্ঞানিক সমাজে উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন, তিনি কেবলমাত্র ঐ দুটি জিনিসের সাহায্যে স্বতোজননবাদিগণের সিদ্ধান্তের ভ্রম প্রতিপন্ন করিবেন। মাংসখণ্ডটিকে একটি পাত্রে রাখিয়া, তাহার মুখ সূক্ষ্ম বস্ত্র দ্বারা আবৃত করা হইল। মাংস গলিত হইয়া গেল, কিন্তু তাহাতে কীট উৎপন্ন হইল না!

এই সহজ পরীক্ষায় বৈজ্ঞানিক সাধারণ বুঝিলেন, গলিত মাংস হইতে পোকা আপনা হইতে উৎপন্ন হয় না। নানাজাতীয় মক্ষিকা বাহির হইতে আসিয়া মাংসের উপর অণ্ড প্রসব করিলে, তাহা হইতেই কীট উৎপন্ন হয়। স্বতোজননবাদিগণ এই পরীক্ষায় নির্ব্বাক্ হইয়া পড়িলেন।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের উদ্ভাবন হয় নাই। রেডি সাহেবের মৃত্যুর অনেকদিন পরে, বস্ত্রাবৃত পাত্রের গলিত মাংস অণুবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছিল, মক্ষিকার গমনাগমন রোধ করায় মাংসে বড় পোকা জন্মিতে পারে নাই বটে, কিন্তু তাহাতে ছোট ছোট আণুবীক্ষণিক কীটের অভাব নাই। ইহাতে স্বতোজননবাদিগণ আবার এক সুযোগ পাইলেন। তাঁহারা দল বাঁধিয়া বলিতে লাগিলেন, বাহিরের কীটাদি হইতে কখনো মাংসের কীট উৎপন্ন হয় না, নচেৎ বস্ত্রখণ্ড দ্বারা পাত্রের মুখ আবদ্ধ রাখিলেও সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র কীট দ্বারা মাংস আচ্ছন্ন হইয়া পড়িবে কেন। কিন্তু রেডির শিষ্যগণ আবার শীঘ্রই স্বতোজননবাদিগণের কণ্ঠরোধ করিয়াছিলেন। ইঁহারা মাংসখণ্ডটিকে কিছুকালের জন্য ফুটন্ত জলপূর্ণ পাত্রে রাখিয়া, ঐ অবস্থায় পাত্রের মুখ গলিত ধাতু বা কাচদ্বারা দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। পরীক্ষায় দেখা গেল, মাংসখণ্ডে ক্ষুদ্র-বৃহৎ কোন প্রকার কীটই উৎপন্ন হয় নাই। গলিত মাংসস্থ কীটগুলি যে, স্বতোজাত জীব নয়, এই পরীক্ষায় নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইয়া গিয়াছিল।

রেডির শিষ্যগণ পূর্ব্বোক্ত প্রকার নানা পরীক্ষায় যখন স্বতোজননবাদের মূলোচ্ছেদের উদ্যোগ করিতেছিলেন, সেই সময়ে জৈব পদার্থের পচন সম্বন্ধে একটি মতবাদ প্রচলিত ছিল। প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক বুফন্(Buffon) সাহেব এই মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা। ইনি বলিতেন জৈব ও অজৈব পদার্থের উপাদানের মূলে একটা বড় রকমের পার্থক্য আছে। আমরা যাহাদিগকে জৈব পদার্থ বলি, তাহাদের প্রত্যেকটিই কতকগুলি অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জীবাণু

দ্বারা গঠিত। অজৈব জিনিসের গঠনে অবশ্য এই জীবাণু আবশ্যক হয় না। জৈব জিনিস যখন সজীব থাকে, তখন তাহাদের দেহের সেই জীবাণুগুলি বেশ জোট বাঁধিয়া থাকিতে পারে। কাজেই, তখন আমরা তাহাদের অস্তিত্বলক্ষণ দেখিতে পাই না। জীব মরিয়া গেলে যখন তাহার গঠনোপাদান অর্থাৎ সেই জীবাণুগুলি দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে আরম্ভ করে, তখন তাহাদের কার্য্য দেখা যায়। বুফন্ সাহেবের মতে গলিত মাংসস্থ আণুবীক্ষণিক কীটগুলি সেই বিচ্ছিন্ন জীবাণু ব্যতীত আর কিছুই নয়। রেডির শিষ্যগণের পরীক্ষায় যখন দেখা গেল, আবদ্ধমুখ পাত্রস্থ মাংস গলিত হইয়াও কীট উৎপন্ন করে না, তখন পূর্ব্বোক্ত মতবাদটির উপরেও ঘোর অবিশ্বাস আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক লিবিগ (Liebig) সাহেবের নাম পাঠক অবশ্যই শুনিয়াছেন। ইনি নানা পদার্থের পচন ও গেঁজানো (Fermentation) প্রসঙ্গে প্রথমে অনেক গবেষণা করিয়াছিলেন। ইহার ফলে স্থির হইয়াছিল, বায়ুর অক্সিজেন বাষ্প উদ্ভিদ্ বা প্রাণীর মৃতদেহের সংস্পর্শে আসিলে, অক্সিজেনের অণুসকল জীবদেহের অণুগুলিকে ভাঙ্গিতে আরম্ভ করে এবং ইহা দ্বারাই জীবদেহ বিশ্লিষ্ট হইলে আমোনিয়া (Ammonia), অঙ্গারক বাষ্প ইত্যাদি প্রস্তুত হয়।

বাতাসে উন্মুক্ত না রাখিলে কোন জিনিসের পচন সুরু হয় না, তাহা আমরা জানি। কিন্তু জৈব পদার্থমাত্রকেই বায়ুর সংস্পর্শে রাখিবামাত্র যে তাহারা পচিতে আরম্ভ করে, একথা ঠিক নয়। চিনি, শ্বেতসার প্রভৃতি পদার্থ বায়ুতে বহুকাল উন্মুক্ত রাখিয়া দিলেও সেগুলি বেশ ভাল অবস্থাতেই থাকে। কিন্তু তাহাতে কিথ বা পচন বীজ (Yeast) সংযুক্ত করিয়া দিলেই সেগুলি গেঁজিতে আরম্ভ করে। এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া লিবিগ্ সাহেব চিনি, শ্বেতসার প্রভৃতি জৈব পদার্থকে প্রাণিদেহজ

জিনিস হইতে সম্পূর্ণ পৃথক বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, দধি, চিনি, শ্বেতসার প্রভৃতি পদার্থকে যখন আমরা পচনবীজযুক্ত করি, তখন সেই বীজের অণু ঐ সকল পদার্থের অণুগুলিকে ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া পদার্থান্তরে পরিণত করিয়া ফেলে এবং তাহাতেই আমরা দুগ্ধ ও শর্করাকে দধি ও মদ্যে পরিণত হইতে দেখি।

রেডি সাহেবের শিষ্যগণ যখন স্বতোজনন সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া তাহার মূলোচ্ছেদের ব্যবস্থা করিতেছিলেন, তখন লিবিগের পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তটি প্রচারিত হওয়ায় তাঁহাদের সকল আয়োজন ব্যর্থ হইবার উপক্রম হইয়াছিল। স্বতোজননবাদিগণ এই সুযোগে তাঁহাদের দল বেশ পুষ্ট করিয়া তুলিয়াছিলেন এবং নব সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া নির্জীব পদার্থ হইতে সজীবের উৎপত্তির কথা আবার নূতন করিয়া প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

স্বতোজননবাদীদিগের এই জয়োল্লাস অধিককাল স্থায়ী হয় নাই। সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী পণ্ডিত পাষ্টুর (Pasteur) সাহেব নানা জাতীয় কীটাণু ও জীবাণুর (Yeast) অদ্ভুত কার্য্যের কথা প্রচার করিলে, তাঁহাদের দলের আবার নূতন করিয়া অধঃপতন আরম্ভ হইয়াছিল। পাষ্টর সাহেব লিবিগের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করিয়া বলিতে লাগিলেন, দুগ্ধ ও চিনির দধি ও মদ্যে পরিবর্ত্তিত হওয়া বা মৃত জীবদেহের পচন ব্যাপার অক্সিজেনের কার্য্য নয়। আকাশের বায়ুতে সর্ব্বদাই নানাজাতীয় অতি সূক্ষ্ম জীবাণু ভাসিয়া বেড়াইতেছে, এইগুলি যখন মৃত জীবদেহকে আশ্রয় করে, তখন সাধারণ জীবের ন্যায় তাহারা বংশ বৃদ্ধি করিয়া মৃতজীবের দেহটিকে গলিত করিয়া তুলে। দধি ও মদ্যের উৎপত্তিও জীবাণুর কাজ। দুগ্ধের দধিবীজ ও চিনি বা দ্রাক্ষারসের কিণ্ব, সেই জীবাণু ব্যতীত আর কিছুই নয়। ঐ সকল জীবাণুর কয়েকটিমাত্র দুগ্ধ বা শর্করায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সমস্ত

জিনিসটাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে এবং তাহারা উক্ত জিনিসগুলিতে রাসায়নিক পরিবর্ত্তন আনয়ন করে। পাষ্টুর সাহেব সুকৌশলে বায়ুস্থ সমগ্র জীবাণুকে নষ্ট করিয়া সেই বায়ুর ভিতরে মাংস ইত্যাদি পচনশীল পদার্থ রাখিয়াছিলেন। মাংসের অণুমাত্র বিকার দেখা যায় নাই।

যে সকল ব্যাপার অবলম্বন করিয়া প্রাচীন দল স্বতোজননের উদাহরণ দিতেন, পাষ্টুর সাহেব পূর্ব্বোক্ত প্রকারে নানা পরীক্ষায় একে একে প্রত্যেকটিরই ভ্রম আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা গিয়াছিল, সেগুলি কোনক্রমেই স্বতোজননের উদাহরণ নয়। স্ত্রীপুংসাহায্যে বা নিজের দেহকে খণ্ডিত করিয়া সাধারণ জীব যে প্রকারে সন্তান উৎপন্ন করে ঐ সকল স্থলে অবিকল সেই প্রকারেই তাহাদের বংশবিস্তার হয়।

বাষ্টিয়ান (Bastian) ও পুচেটের (Puochet) নাম পাঠক অবশ্যই শুনিয়াছেন। ইঁহাদের দুজনেরই গত শতাব্দীতে খুব বড় বৈজ্ঞানিক বলিয়া খ্যাতি ছিল। পাষ্টুর সাহেবের আবিষ্কার সমাচার প্রচারিত হইলে তাহারা খুঁটিনাটি নানা বিষয় লইয়া উহার ভুল দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই সময়ে সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক টিন্‌ডাল (Tyndal) সাহেব পাষ্টুর সাহেবের সহিত যোগ দিয়াছিলেন এবং ইঁহাদের সমবেত চেষ্টায় বাষ্টিয়ান প্রভৃতির সকল যুক্তিতর্ক খণ্ডিত হইয়া গিয়াছিল। ইহার পর স্বতোজননবাদিগণের অধঃপতন চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল, অদ্যাপি তাহা হইতে আর উদ্ধারের আশা দেখা যাইতেছে না।

বার্ক (Burke) নামক জনৈক ইংরাজ বৈজ্ঞানিক স্বতোজনন প্রত্যক্ষ করিয়াছেন বলিয়া একটা সংবাদ কয়েক বৎসর পূর্ব্বে প্রচারিত হইয়াছিল। এই সংবাদ নানা বৈজ্ঞানিক সমাজে পৌঁছিলে, বার্ক সাহেবের পরীক্ষার আমূল বৃত্তান্ত জানিবার জন্য জীবতত্ত্ববিৎমাত্রই ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছিলেন শেষে জানা গিয়াছিল, মাংসের স্তূপে রেডিয়ম ধাতুর (Radium) গুঁড়া

ছড়াইয়া দেওয়ায় দুইদিনের মধ্যে নির্জ্জীব স্তূপে কতকগুলি অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বস্তুর সৃষ্টি হইয়াছিল এবং ক্রমে বড় হইয়া পড়িলে সেগুলিকে সাধারণ জীবাণুর ন্যায় দ্বিধা-বিভক্ত হইতে দেখা গিয়াছিল। কিন্তু এই প্রকারে বিভক্ত হওয়ার পর তাহাদের আর পুনর্বিভাগ দেখা যায় নাই ; অধিকন্তু সেগুলি ক্রমে এক প্রকার দানাময় পদার্থে রূপান্তরিত হইয়া পড়িয়াছিল। বার্ক সাহেব এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াই স্বতোজনন সম্ভবপর বলিয়া প্রচার আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহার মনে হইয়াছিল, ঐ পদার্থগুলি বুঝি কোন প্রকার জীবাণু এবং রেডিয়মের প্রভাবেই উৎপত্তি লাভ করিয়াছে।

যুবক বৈজ্ঞানিক বার্ক এই আবিষ্কার দ্বারা যে সম্মানের জন্য লালায়িত হইয়াছিলেন তাঁহার ভাগ্যে তাহা জুটে নাই। স্যার্ উইলিয়ম র‍্যাম্‌জে (Sir William hamsay)-প্রমুখ প্রবীণ রসায়নবিদ্‌গণের কঠোর অগ্নি-পরীক্ষায় যখন দেখা গেল, বার্ক সাহেবের জীবাণুগুলিতে জীবনের কোন লক্ষণই নাই, এবং তাহারা জীবাণুর ন্যায় বংশবিস্তারক্ষম নয়, তখন তাঁহারা সকলেই বার্ক সাহেবের সিদ্ধান্তকে ভ্রমপূর্ণ বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন।

এখন পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন,—তবে কি স্বতোজনন সত্যই অসম্ভব? পূর্ব্বোক্ত আলোচনা হইতে প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে বলিতে হয়, বর্ত্তমান অবস্থায় পৃথিবীতে সত্যই স্বতোজনন অসম্ভব। আমাদিগের চারিদিকে প্রতিদিনই যে সহস্র সহস্র জীবের উৎপত্তি হইতেছে, তাহাদের প্রত্যেকটির গোড়ার খবর লইলে দেখা যায়, স্ত্রী-পুরুষ সাহায্যে সাধারণ উপায়েই তাহাদের জন্ম হইতেছে। কিন্তু তাই বলিয়া আমাদের পৃথিবীতে জীবের স্বতোজনন কোন কালে চলে নাই, একথা সাহস করিয়া বলা যায় না। ইহা স্বীকার করিলেও প্রাথমিক জীবের উৎপত্তি রহস্যের উচ্ছেদ হয় না। তবে বর্ত্তমান কালে যে স্বতোজনন চলিতেছে না, তাহা নিঃসঙ্কোচে সত্য বলা যাইতে পারে।

সহযোগিতা ও পরজীবিতা

দুই পৃথক্ জাতীয় প্রাণী বা উদ্ভিদ্ জীবনরক্ষার জন্য পরস্পরকে সাহায্য করিতেছে, এ প্রকার ঘটনা হঠাৎ আমাদের নজরে পড়ে না। কিন্তু ইতর জীবের জীবনের ইতিহাস আলোচনা করিলে, ইহার যথেষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায়। জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ ব্যাপারটিকে Symbiosis বলেন। ইহার বাংলা পরিভাষা ঠিক কি হওয়া উচিত, জানি না। সহযোগিতাই বলা যাউক।

খঞ্জ যখন বলবান্ অন্ধের স্কন্ধে চাপিয়া ভিক্ষার জন্য দাতার বাড়ী গিয়া উপস্থিত হয়, তাহাদের মধ্যে তখন বেশ একটা সহযোগিতা থাকে। অন্ধ পথ চলে, খঞ্জ তাহার ঘাড়ে বসিয়া পথ নির্দ্দেশ করে। তারপর ভিক্ষালব্ধ অর্থ দু'জনে সমান ভাগ করিয়া লয়। এই ব্যবস্থায় একের অসম্পূর্ণতা অপরে পূরণ করিয়া, শেষে দু'জনেই লাভবান্ হইয়া পড়ে। জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ এই ব্যাপারটিকে Symbiosis বা সহযোগিতা বলেন না। ভিন্নজাতীয় জীবের মধ্যে যে স্বাভাবিক আদান-প্রদান, তাহাই সহ-যোগিতা। গরুটিকে ঘাস-জল খাওয়াইয়া পুষ্ট করিলে, সে যখন দুগ্ধধারা দান করিয়া ঘাসের ঋণ পরিশোধ করে, তখনও ইহাকে সহযোগিতা বলা যায় না। এই ব্যাপারে পূর্ণমাত্রায় দোকানদারী বর্ত্তমান। ইহার আগা-গোড়া কেবল মানুষের চতুরতাতেই পূর্ণ। পৃথিবীতে ঘাস-জলের অভাব নাই। মানুষ যদি কৃত্রিম উপায়ে গো-জাতিকে পরাবলম্বী না করিত, তবে তাহারা কখনই গোশালায় আশ্রয় গ্রহণ করিত না। প্রকৃতিদত্ত তৃণমুষ্টি আহার করিয়া এবং দুগ্ধধারায় নিজের সন্তানগুলিকে পুষ্ট করিয়া, বেশ নির্ব্বিবাদে দিন কাটাইত।

উদ্ভিদ্ ও মধুমক্ষিকার কার্য্যে সহযোগিতার একটি সুন্দর উদাহরণ পাওয়া যায়।

ফুলের পরাগগুলি গর্ভকেশরের (Pistils) উপরকার আঠালো অংশে আসিয়া লাগিলে, ফলের উৎপত্তি সুরু হয়। কিন্তু পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, একই ফুলের পরাগ যদি তাহারি গর্ভকেশরে আসিয়া লাগে, তবে ফল ভাল হয় না। এই প্রকারে ফল উৎপন্ন করিতে থাকিলে, চারি পাঁচ পুরুষের মধ্যে গাছের বিশেষ অবনতি দেখা যায়। এক গাছের ফুলের পরাগ যদি সেই জাতীয় অপর কোন গাছের গর্ভকেশরে গিয়া পড়ে, তবেই ফল ভাল হয়, এবং তাহারই বীজ হইতে যে সকল গাছ হয়, সেগুলির পুষ্পপত্রে ও ফলে উন্নতির সকল লক্ষণ প্রকাশ হইয়া পড়ে। কাজেই, বলিতে হয়, পরাগের আদান-প্রদান ক্রমোন্নতির পথে চলিবার একটা প্রধান অবলম্বন। কিন্তু বিধির বিড়ম্বনায় উদ্ভিদ্‌মাত্রই হস্তপদহীন এবং একবারে চলচ্ছক্তিরহিত। মাটি হইতে উঠিয়া, দুই পদ দূরবর্ত্তী গাছের ফুল হইতে পরাগ আনিয়া যে নিজের ফুলে দিবে, এমন সামর্থ্য কোন উদ্ভিদেরই নাই। প্রকৃতির বিধানে মাটি হইতেই ইহারা খাদ্য সংগ্রহ করে, এবং মাটিতে মূল প্রোথিত করিয়া নিশ্চল থাকিলেই ইহাদের জীবন রক্ষা হয়।

মধুমক্ষিকার প্রকৃতি উদ্ভিদের ঠিক বিপরীত। ইহারা সর্ব্বদাই চঞ্চল। কাজেই, জীবনরক্ষার জন্য ইহাদের অধিক খাদ্যের আবশ্যক হয় এবং খাদ্যটুকুকে নিজেদেরই খুঁজিয়া-পাতিয়া বাহির করিতে হয়। অচল উদ্ভিদ্ তাহাদের পুষ্পগুলিতে সচল মক্ষিকার জন্য প্রচুর মধু সঞ্চিত রাখে। মক্ষিকা মধুর প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারে না। সেই সযত্নসঞ্চিত মধু আকণ্ঠ পান করিয়া এবং পুষ্পের পরাগ সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া অপর পুষ্পের গর্ভকেশরে তাহা লাগাইয়া আসে। এই ব্যবস্থায় মধুমক্ষিকা এবং উদ্ভিদ্ উভয়েরই উপকার হয়। মক্ষিকা মধুপান করিয়া তুষ্ট হয় এবং উদ্ভিদ্ মক্ষিকারই

সাহায্যে পরাগের আদান-প্রদান করিয়া বংশের উন্নতিসাধন করিতে থাকে। প্রকৃতির নির্দ্দেশে জীবনের ধারাকে বিচিত্র পথে চালাইয়া দুইটি পৃথক্ জাতীয় জীব ঘটনাক্রমে মিলিত হইয়া যখন এই প্রকার পরস্পরের উপকার করিতে থাকে, তখনি তাহারা সহযোগী হয়।

বৃক্ষের শাখাপ্রশাখা এবং কাণ্ডাদিতে বর্ষার শেষে যে এক প্রকার সবুজ ও সাদায় মিশানো ছাতা (Lichens) দেখা যায়, তাহার জীবনের ইতিহাস খুঁজিলে, দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক্ জাতীয় উদ্ভিদের সহযোগিতার অদ্ভুত কার্য্য ধরা পড়ে!

শৈবাল (Algae) এবং ব্যাঙের ছাতা (Fungi) উভয়েই উদ্ভিদ্ শ্রেণীভুক্ত হইলেও জাতিতে উহারা সম্পূর্ণ পৃথক্। শৈবাল উদ্ভিদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। ইহাদের অনেকেরই দেহ এক-কোষময়। এই কোষটিকেই দ্বিধা-বিভক্ত করিয়া ইহারা বংশ বিস্তার করে। অগভীর আবদ্ধ জলে যে সবুজ সর পড়ে, তাহা এই শ্রেণীরই কোটি কোটি উদ্ভিদের সমষ্টি। পুষ্করিণীর জলে সূক্ষ্ম সূত্রের ন্যায় যে সকল উদ্ভিদ্‌কে ভাসিতে দেখা যায়, তাহারাও এই শ্রেণীভুক্ত। তবে ইহারা অপরের তুলনায় কতকটা উন্নত। এই শৈবালগুলির জীবনের ইতিহাস আলোচনা করিতে গেলে দেখা যায়, জীবনরক্ষার জন্য যেটুকু আকরিক পদার্থের আবশ্যক, তাহা সংগ্রহ করিবার জন্য ইহারা অপর উদ্ভিদের ন্যায় মৃত্তিকার গভীর প্রদেশে মূল চালনা করে না। আর্দ্র স্থানই শৈবালের আবাস, এই সকল স্থানে জলের সহিত যে আকরিক পদার্থ মিশ্রিত থাকে তাহাই উহাদের জীবনরক্ষার পক্ষে যথেষ্ট। মৃত্তিকার সহিত ইঁহাদের অতি অল্পই সম্বন্ধ থাকে। জীবনের কার্য্য চালাইতে গেলে যে সকল জৈব পদার্থের আবশ্যক, তাহা এই শ্রেণীর উদ্ভিদ্‌গণ দেহের হরিদ্-কণার (Chlorophyl) সাহায্যে প্রস্তুত করিয়া লয়।

ব্যাঙের ছাতা যে উদ্ভিদ্-শ্রেণীভুক্ত তাহাও শৈবালের ন্যায় অপুষ্পক, কিন্তু মূলহীন নয়। উদ্ভিদ্‌মাত্রই মূলদ্বারা আকরিক খাদ্য সংগ্রহ করে। উহারাও মূলের সাহায্যে হাইড্রোজেন্, অক্সিজেন্, নাইট্রোজেন, ফস্‌ফরস্, পটাসিয়ম্, ম্যাগ্‌নেসিয়ম্ প্রভৃতি পদার্থ দেহস্থ করিতে থাকে। কিন্তু দেহে হরিৎ-কণা না থাকায়, সাধারণ উদ্ভিদের ন্যায় ইহারা জৈব-পদার্থ নিজে নিজে প্রস্তুত করিতে পারে না। কাজেই, যে সকল স্থানে পচা জৈব-পদার্থ থাকে, তাহার উপরে জন্মগ্রহণ করিয়া এবং সেই পচা খাদ্য দেহস্থ করিয়া ইহারা জীবন কাটাইয়া দেয়। এই কারণেই গলিত গোময়-গোমূত্রযুক্ত স্থান এবং পচা পাতা এবং ডাল, ব্যাঙের ছাতার প্রধান জন্মক্ষেত্র। উদ্ভিদ্ মৃত্তিকায় যে সকল খাদ্য পায়, তাহা সকল সময় ঠিক খাদ্যের আকারে থাকে না। মূল হইতে এক প্রকার দ্রাবক (Acid) নির্গত করিয়া এবং তাহারি সাহায্যে কঠিনকে দ্রব করিয়া উহারা অখাদ্যকে খাদ্যে পরিণত করে। ব্যাঙের ছাতার যে সকল ছোট ছোট মূল আছে, সেগুলি হইতে ঐ দ্রাবক প্রচুর পরিমাণে নির্গত হয়, কাজেই, আকরিক খাদ্য সংগ্রহে ইহাদিগকে একটুও অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না।

এখন মনে করা যাউক, ব্যাঙের ছাতা এবং শৈবাল ঠিক পাশাপাশি থাকিয়া বৃক্ষত্বক্ বা শিলাখণ্ডের উপর আশ্রয় লইয়াছে। বৃক্ষত্বকে জৈব বস্তু এবং আকরিক পদার্থ উভয়ই মিশ্রিত থাকে বটে, কিন্তু কোনটিই উদ্ভিদের খাদ্যরূপে থাকে না। শিলাখণ্ডে আবার জৈব বস্তু একটুও মিলে না, ইহার আগাগোড়া কেবল আকরিক পদার্থ দিয়াই গঠিত। এই অবস্থায় ব্যাঙের ছাতা ও শৈবাল পৃথক্ জাতীয় উদ্ভিদ্ হইয়াও, পরম সখ্যে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। দেহের হরিৎ-কণার সাহায্যে বায়ুর অঙ্গারক বাষ্প (Carbonic Acid Gas) টানিয়া শৈবাল যে জৈব বস্তু প্রস্তুত করে, তাহার সমস্তটা গ্রাস না করিয়া সে একটা ভাগ ব্যাঙের ছাতাকে দিতে থাকে।

ব্যাঙের ছাতা এই দানের কথা ভুলে না। সে যখন মূল-নিঃসৃত দ্রাবকের সাহায্যে বৃক্ষত্বক্ বা শিলার আকরিক পদার্থগুলিকে খাদ্যে পরিণত করিতে আরম্ভ করে, তখন প্রস্তুত খাদ্যের একটা ভাগ ব্যাঙের ছাতার জন্য রাখিয়া দেয়। এই ব্যবস্থায় কাহারো খাদ্যের অভাব হয় না। উভয় উদ্ভিদ্ই পরিতুষ্ট হইয়া বংশবিস্তার দ্বারা এক একটি ছোটখাটো উপনিবেশ স্থাপন করিতে আরম্ভ করে। বৃক্ষত্বক্, শিলাখণ্ড বা পুরাতন প্রাচীরের গায়ে যে সাদা ও সবুজে মিশানো ছাতা দেখা যায়, তাহা শৈবাল এবং ক্ষুদ্রজাতীয় ব্যাঙের ছাতারই উপনিবেশ। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পরস্পরের সাহায্য করিয়াই উহারা জীবিত থাকে। ইহাদের মধ্যে কেহই কেবল বৃক্ষত্বক্ বা শিলাখণ্ডের ন্যায় স্থানে আশ্রয়গ্রহণ করিয়া জীবিত থাকিতে পারে না।

মটর, কড়াই, শিম প্রভৃতি শিম্বীপ্রদ (Leguminous) উদ্ভিদের জীবনের ইতিহাসেও সহযোগিতার কার্য্য দেখা যায়। অনুর্ব্বর ক্ষেত্রে জন্মিলে এই সকল উদ্ভিদ্ নাইট্রোজেনের অভাবে মৃতপ্রায় হইয়া পড়ে। এই অবস্থায় এক প্রকার জীবাণু (Bacillus) উহাদের মূলে বাসা বাঁধিয়া নাইট্রোজেনের অভাব পূরণ করিতে থাকে। বায়ু হইতে নাইট্রোজেন্ সংগ্রহ করিবার এক অদ্ভুত ক্ষমতা এই জীবাণুগুলিতে দেখা যায়। উদ্ভিদ্-গুলিও তাহাদের মূলাশ্রিত অতিথিসম্প্রদায়ের যথোচিত পরিচর্য্যা করিতে ভুলে না। অঙ্গার ও হাইড্রোজেন-ঘটিত অনেক সুখাদ্য প্রস্তুত করিয়া জীবাণুগুলিকে খাওয়াইতে আরম্ভ করে। এই আদান-প্রদানে উদ্ভিদ্ ও জীবাণু উভয়েই পরম লাভবান হয়।

মনুষ্যসমাজে যেমন দস্যু-তস্কর আছে, উদ্ভিদ্-রাজ্যেও সে প্রকার নির্ম্মম জীব যথেষ্ট দেখা যায়। সদুপায়ে খাদ্য সংগ্রহ করিয়া দেহ-প্রাণ একত্র রাখার অভ্যাস ইহাদের মোটেই নাই। পরের ঘাড়ে চাপিয়া এবং আশ্রয়-দাতার যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া উদরপূর্ত্তি করাই ইহাদের কাজ। পরজীবী

উদ্ভিদ্ অর্থাৎ পরগাছা (Parasite) এই দস্যুসম্প্রদায়ভুক্ত। সুস্থ গাছের উপর জন্মিয়া নিজেদের মূলের সাহায্যে এগুলি এমন নির্ম্মমভাবে আশ্রয়দাতার রস শোষণ করিতে থাকে যে, অল্প দিনের মধ্যেই তাহার জীবনান্ত ঘটে। পরজীবী উদ্ভিদের বীজাদি মৃত্তিকায় বপন করিলে অঙ্কুরিত হয় না। মৃত্তিকা হইতে খাদ্যসংগ্রহের শক্তি হইতে ইহারা একেবারে বঞ্চিত। পরজীবী উদ্ভিদের ন্যায় পরজীবী প্রাণীরও অস্তিত্ব আছে। প্রাণীর অন্ত্রে (Intestines) যে সকল কৃমি জন্মে তাহারা সম্পূর্ণ পরজীবী। দেহের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া এবং ভুক্ত খাদ্যে ভাগ বসাইয়া ইহারা প্রাণধারণ করে। দদ্রু-উৎপাদক জীব, উকুন, এঁটোলি প্রভৃতিকে এই দলে ফেলা যাইতে পারে। ইহাদের সকলেই আশ্রয়দাতার শোণিত শোষণ করিয়া জীবনরক্ষা করে। কিন্তু কেহই এই উপকারটুকুর বিনিময়ে আশ্রয়দাতাকে কিছুই দান করে না, বরং নানা প্রকার পীড়ার উৎপত্তি করিয়া উপকারীর জীবনান্তের চেষ্টা দেখে।

আশ্রয়দাতা ও আশ্রিতের পূর্ব্বোক্ত সম্বন্ধগুলিকে কোনক্রমে সহযোগিতা বলা যায় না বরং উহাতে কতকটা প্রতিযোগিতার ভাবই বর্ত্তমান। কিন্তু প্রাণীর অন্ত্রে যে সকল জীবাণু আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি আশ্রয়দাতার সহিত সহযোগিতা করে বলিয়া আধুনিক জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ মনে করিতেছেন। ইহারা উদরস্থ অঙ্গার ও হাইড্রোজেন্-ঘটিত খাদ্যগুলিকে বিশ্লিষ্ট করিয়া, অঙ্গারক বাষ্প এবং মিথেন্ (Methane) প্রভৃতি বায়ু উৎপন্ন করিতে থাকে। বলা বাহুল্য, ইহাতে আশ্রয়দাতার কোনই উপকার হয় না, বরং পেট-ফাঁপা ইত্যাদি পীড়া দেখা দেয়। কিন্তু ইহারি সঙ্গে যে জীবাণুগুলি আমোনিয়া (Ammonia) প্রভৃতি দ্বারা পাকযন্ত্রে আলবুমেন্ ইত্যাদি পরম পুষ্টিকর পদার্থের গঠন করে, তাহাতে আশ্রয়দাতার উপকার হয়।

মনুষ্যসমাজে খাঁটি সহযোগিতা (Symbiosis) বা খাঁটি পরজীবিতা (Parasitism) কোনটারই উদাহরণ পাওয়া যায় না। কিন্তু এমন কতকগুলি ব্যাপার আছে, যাহাকে সহযোগিতা বলিব, কি পরজীবিতা বলিব, স্থির করা দায় হয়। ইউরোপের সোসিয়ালিষ্ট সম্প্রদায়, ধনী, মহাজন, কণ্ট্রাক্টার ও বড় বড় কলকারখানার চালকদিগকে পরজীবী আখ্যা দিয়া থাকেন। সঙ্কটের সময় এই লোকগুলিই কি প্রকারে ক্ষুধার্ত্তের শূন্য উদর পূর্ণ করে, তাহা সোসিয়ালিষ্ট্‌গণ ভুলিয়া যান। আবার যখন ধনী এবং মহাজনগণ অর্থ-সঞ্চয়ের আকাঙ্ক্ষায় নিজেদের কর্ত্তব্য ভুলিয়া দরিদ্রসমাজের ভাত-জল বন্ধ করেন, তখন তাঁহাদের পরজীবী মূর্ত্তিখানি প্রকাশ পায়।

স্তন্যপায়ী মানব-শিশুকে এবং ইতর প্রাণীর নিঃসহায় শাবকগুলিকে অনেকে পরজীবী প্রাণীর দলে ফেলিতে চাহেন। খাঁটি প্রাণিতত্ত্বের দিক্ দিয়া লাভক্ষতির হিসাব [illegible], ইতর স্তন্যপায়ীদিগের সন্তানগুলিতে পরজীবীর লক্ষণ দেখা যায়। কিন্তু যাঁহারা মানবশিশুকে পরজীবী বলিতে চাহেন, তাঁহাদের যুক্তিতর্কের বিরুদ্ধে অনেক কথা বলা যাইতে পারে। জীবতত্ত্বের মানদণ্ড দিয়া মানবের সুখদুঃখ আনন্দকে কখনই মাপা চলে না। জননী যখন হৃষ্টপুষ্টাঙ্গ সন্তানের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, তখন যে আনন্দের সঞ্চার হয়, তাহাই বোধ হয় সেই দুগ্ধধারার ঋণ পরিশোধ করে। এই আনন্দ মানুষের মনগড়া কৃত্রিম আনন্দ নয়। যে আনন্দের সাগরে বিশ্বনাথ এই ব্রহ্মাণ্ডটিকে ডুবাইয়া রাখিয়াছেন, পুত্রের সুখে জননীর আনন্দ তাহারি অংশ। ইহা সহজ সংস্কারজাত অতি পবিত্র আনন্দ। বাহিরের বৈরিতার অন্তরালে তলায় তলায় প্রাণীতে উদ্ভিদে, জড়ে ও জীবে যে চিরন্তন সখ্য আছে, মাতা ও সন্তানের সম্বন্ধকে সেই সখ্যেই সরস করিয়া রাখিয়াছে। ইতর প্রাণীদিগের মধ্যে মাতা ও সন্তানে যে, সে সম্বন্ধ নাই, তাহা কেহই

বলিতে পারেন না ; বরং থাকারই সম্ভাবনা অধিক। সুতরাং যিনি যাহাই বলুন, আমরা শিশুকে কখনই পরজীবী বলিতে পারিব না।

সহযোগিতা ও পরজীবিতার পূর্ব্বোক্ত বিবরণগুলি আলোচনা করিয়া আধুনিক জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ একটা বৃহৎ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার উদ্যোগ করিতেছেন। ইঁহারা বলিতেছেন, উচ্চশ্রেণীর প্রাণী ও উদ্ভিদের দেহগুলি কোটি কোটি সহযোগী কোষেরই এক একটা বৃহৎ উপনিবেশ ব্যতীত আর কিছুই নয়। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পৃথক্ গুণসম্পন্ন কোষগুলি বহুকাল সহযোগিতা করিয়া এরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, এখন একের অভাবে অপরগুলি টিকিয়া থাকিতে পারে না। বহুকাল সহযোগিতার এই প্রকার সম্বন্ধ অপর জীবের মধ্যেও দেখা যায়। যে সকল পিপীলিকা আপ্‌হাইড্ নামক কীট (পিপীলিকাধেনু) পালন করিয়া কীটদেহনিঃসৃত রসপানে জীবনধারণ করে, দীর্ঘ সহযোগিতায় তাহাদের বর্ত্তমান অবস্থা এ প্রকার হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, এখন উহারা আপ্‌হাইড্ কীটের সাহায্য ব্যতীত জীবিত থাকিতে পারে না। সুতরাং জীবদেহকে যদি কতকগুলি সহযোগী কোষের সমষ্টি বলা যায়, তবে বিস্ময়ের কোন কারণ নাই। জীবনের অনেক কার্য্যে আজ কাল সহযোগিতার যে সকল পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, তাহা পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তটিকে পোষণই করিতেছে। রক্তের শ্বেত-কণিকাগুলির (White Corpuscles) কার্য্য প্রাচীন শরীরবিদ্‌গণ জানিতেন না। এখন দেখা গিয়াছে, অনিষ্টকর জীবাণু রক্তে আশ্রয়গ্রহণ করিলেই, ঐ শ্বেত-কণিকাগুলিই সেগুলিকে গ্রাস করিয়া ফেলে; তাছাড়া পিপ্‌টন (Peptones) হইতে আল্‌বুমেনয়ডের (Albumenoids) উদ্ধার এবং ক্ষতস্থানের আরোগ্যবিধান প্রভৃতি আরো অনেক কাজে শ্বেত-কণিকার সহযোগিতার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

মানুষের সংহারকার্য্য

লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে মানুষ যেদিন উচ্চতর বুদ্ধির অধিকারী হইয়া অল্পবুদ্ধি প্রাণীর উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, সেদিন হইতে যে, কেবল দুর্ব্বল জীবের সহিতই মানুষের শত্রুতা চলিতেছে, তাহা নয়। প্রকৃতির সহিতও মানুষের এক নীরব সংগ্রাম চলিয়া আসিতেছে। ইহার ফলে কোটি কোটি নিরীহ জীব প্রাণদান করিয়াছে। তাছাড়া পৃথিবীর নানা অংশের বনভূমিগুলি তৃণহীন শুষ্কমরুতে পরিণত হইয়া এবং নির্ম্মলসলিলা নদীগুলি কলুষিত ও পঙ্কিল হইয়া প্রকৃতির স্নেহভরা পবিত্র শ্যামল কান্তিকে ক্রমেই কর্কশ করিয়া তুলিতেছে।

পরিবর্ত্তন লইয়াই প্রকৃতি। এই প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনের বিরাম নাই। ধরাবক্ষে যখন মানুষ স্থান পায় নাই, তখন ইহা চলিত এবং এখনো চলিতেছে। এ সবই সত্য। সমুদ্রকূলবর্ত্তী স্থান আপনা হইতেই উঁচু-নীচু হইয়া দেশের ঋতুর পরিবর্ত্তন করিতেছে। পশুপক্ষী, লতাগুল্ম, পরিবর্ত্তিত অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া টিকিয়া থাকিতে গিয়া নিজেদের দেহের কতই পরিবর্ত্তন করিতেছে, হয় তো তাহাদিগকে দেশত্যাগ করিয়া অপর কোনও সুবিধাজনক স্থান খুঁজিয়া লইতে হইতেছে। এ সবগুলিও সত্য! কিন্তু প্রকৃতির স্বেচ্ছাকৃত এই শ্রেণীর পরিবর্ত্তনে কোন অমঙ্গল-লক্ষণ দেখা যায় না। মানুষ নিজের জ্ঞানগরিমায় মুগ্ধ হইয়া প্রকৃতির পটে যে তুলিকাপাত করে, তাহাই সেই শান্ত ছবিকে ক্রমে কর্কশ করিয়া তোলে। ইহাতে পৃথিবীর যে অমঙ্গল হয়, তাহার ফল অতি ভয়ানক।

প্রকৃতির রাজ্যে অকল্যাণ আনয়ন ব্যাপারে, একমাত্র আধুনিক সভ্য-জাতিই দায়ী নয়। মানুষ যখন অসভ্য ছিল, তখন হইতেই নিরীহ

প্রাণীদিগের হত্যা আরম্ভ করিয়া ইহারা প্রাণিজগতের এত ক্ষতি করিয়া আসিতেছে যে, তাহার আর পূরণ হইবার সম্ভাবনা দেখা যায় না। এই পাপের ফলেই এখন ধরাপৃষ্ঠে সুস্থকায় স্বচ্ছন্দচর প্রাণী দুর্লভ হইয়া পড়িয়াছে এবং অনেক প্রাণিজাতির বংশলোপ পর্য্যন্ত ঘটিয়াছে। এখন মৃৎপ্রোথিত কঙ্কালে তাহাদের পরিচয় গ্রহণ করিতে হয়। অনেক বন্য পশুকে বুদ্ধিবলে পোষ মানাইয়া আমরা এখন তাহাদিগকে গার্হস্থ্য সম্পদ্ করিয়া তুলিয়াছি সত্য, কিন্তু এই ব্যবস্থায় তাহারা এত হীনবীর্য্য এবং দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে যে, নিজের কীর্ত্তির জন্য নিজেকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছা হয়। মানুষের এই যথেচ্ছাচার দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে সম্ভবতঃ কয়েকটি খাদ্যপ্রদ উদ্ভিদ্ এবং আর কয়েকটি অত্যাবশ্যক প্রাণী ছাড়া ক্রমে অন্য সকলই ধরাপৃষ্ঠ হইতে অন্তর্হিত হইয়া যাইবে এবং শেষে সেগুলিরও পর্য্যন্ত বংশলোপের সম্ভাবনা দেখা দিবে। যে আধিপত্যবিস্তারের জন্য মানুষ আসৃষ্টি এত লালায়িত, উদ্ভিদহীন এবং প্রাণিবিরল অবস্থায় তাহার পূর্ণতা হইবে বটে, কিন্তু সে অবস্থা কখনই মানুষের জীবনরক্ষার অনুকূল হইবে না।

কয়েকটা উদাহরণ দিলে বক্তব্য বিষয়টা স্ফুটতর হইবে। অসভ্য মানুষ অনৈতিহাসিক যুগে আধুনিক যুগের মানুষদিগের ন্যায় বন্দুক কামান ব্যবহার করিতে পারিত না সত্য, তথাপি তাহারা শিলাময় অস্ত্রশস্ত্রাদির আঘাতে ম্যামথ নামক হস্তিজাতীয় জীবের বংশনাশের যে সহায়তা করে নাই, এ কথা কোনক্রমেই বলা যায় না। ম্যামথ্ আর ধরাপৃষ্ঠে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। গভীর ভূস্তরে প্রোথিত কঙ্কাল দ্বারাই এখন তাহাদের পূর্ব্ব অস্তিত্বের পরিচয় গ্রহণ করিতে হয়। অতিপ্রাচীনকালে আমেরিকার সর্ব্বাংশে নানাজাতীয় বন্য অশ্ব দলে দলে আনন্দে বিচরণ করিত। আজ কাল তাহাদের একটিও ভূপৃষ্ঠে নাই। জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ ইহাদের

তিরোভাবকেও মানুষের কীর্ত্তি বলিতে চাহেন। মানুষ গোলাগুলি চালাইয়া এই জীববংশ লোপ করে নাই সত্য, কিন্তু যে সকল সংক্রামক এবং সাংঘাতিক ব্যাধিদ্বারা তাহারা নির্ব্বংশ হইয়াছে, তাহার জন্য মানুষই দায়ী। যখন আমেরিকার বনভূমিতে উপনিবেশ স্থাপন আরম্ভ হইয়াছিল, তখন ইউরোপ হইতে দলে দলে লোক আসিয়া দেশ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ মনে করিতেছেন, সম্ভবতঃ এই সময়ে বৈদেশিকগণ পীড়ার বীজ অজ্ঞাতসারে সঙ্গে আনিয়া বন্য অশ্বগুলিকে ব্যাধিগ্রস্ত করিয়াছিল।

আমরা যে দুইটি প্রাণিজাতির উচ্ছেদের কথা বলিলাম, তাহাকে কেবল মানুষেরই কীর্ত্তি বলিয়া সকলে স্বীকার করেন না। প্রাকৃতিক অবস্থার যেসকল পরিবর্ত্তন আপনা হইতেই চলিতেছে, তাহার ফলে অনেক জীবের বংশলোপ ঘটিয়াছে এবং অনেক নূতন জীব জন্মগ্রহণ করিয়া পরিত্যক্ত স্থান অধিকার করিয়াছে। জীববিজ্ঞানে এই প্রকার ঘটনার শত শত উদাহরণ পাওয়া যায়। ম্যামথ্ এবং বন্য অশ্বের বংশলোপকে কেহ কেহ ঐ প্রকার প্রাকৃতিক উৎপাতেরই ফল বলিতে চাহিতেছেন। কিন্তু ইউরোপ ও আমেরিকা হইতে বাইসন্ নামক মহিষজাতীয় জন্তুর যে তিরোভাব ঘটিয়াছে, তাহার জন্য প্রকৃতিকে দায়ী করা চলে না। বাইসন্ এবং ইউরোপের বন্য গো-জাতির উচ্ছেদের জন্য এক মানুষই দায়ী। আবাস-ভূমিগুলিকে অরণ্য-বর্জ্জিত করিয়া মানুষই তাহাদিগকে নিরাশ্রয় করিয়াছিল, এবং সেই মানুষই নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিয়া তাহাদের বংশলোপ ঘটাইয়াছে। নেকড়ে বাঘ (Wolf) এবং বিভার্ জাতীয় প্রাণিগুলিও ঐ প্রকার অত্যাচারে ইংলণ্ড ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে। সুইডেন, নরওয়ে, রুসিয়া এবং ফ্রান্স হইতেও ইহারা ক্রমে তাড়িত হইতেছে। আর শত বৎসর পরে পৃথিবীর কোন অংশেই ঐ দুই প্রাণীর সন্ধান পাওয়া যাইবে না। আমরা এখন কঙ্কাল দেখিয়া যেমন ম্যামথের অস্তিত্ব

জানিতেছি, তখন বিভারের অস্তিত্ব কেবল তাহাদের মৃৎপ্রোথিত কঙ্কাল দেখিয়াই বুঝিয়া লইতে হইবে।

অতি-প্রাচীন কালে ভল্লুক পৃথিবীর সর্ব্বাংশেই দেখা যাইত। মানুষের অত্যাচারেই তাহাদিগকে ইংলণ্ড ছাড়িতে হইয়াছে। সিংহ ইউরোপের আর কোন অংশেই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। মাসিডোনিয়া এবং এসিয়া-মাইনরে যে প্রচুর সিংহ ছিল, তাহা প্রাচীন গ্রীসের ইতিহাস হইতে সুস্পষ্ট জানা যায়। জিরাফ্ এবং হস্তীও ক্রমে দুর্লভ হইয়া আসিতেছে। এই সকল প্রাণীর উচ্ছেদকার্য্যের জন্য এক মানুষই দায়ী। গরিলা এবং সিম্পাঞ্জি নামক দুই জাতীয় বন-মানুষের নাম পাঠক অবশ্যই শুনিয়াছেন। অভিব্যক্তি-বাদের প্রবর্ত্তক ডারুউইন সাহেব মানুষকে ইহাদেরই বংশধর বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। আজকাল এ গুলিকেও আর অধিক দেখা যায় না। মানুষের সহিত একটু আধটু দূরসাদৃশ্য দেখিতে পাইয়া আজকাল অনেকে ধরিয়া বাঁধিয়া উহাদিগকে পোষ মানাইতে চেষ্টা করিতেছেন। শত শত বন-মানুষ এই খেয়ালে পড়িয়া প্রাণবিসর্জ্জন দিতেছে। এ প্রকার অত্যাচার আর কিছুকাল স্থায়ী হইলে, বোধ হয় ধরাপৃষ্ঠে আর ইহাদিগকেও খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।

পক্ষী এবং পতঙ্গজাতীয় ক্ষুদ্র প্রাণিগুলি মানুষের নৃশংসতা হইতে নিষ্কৃতি পায় নাই। বিখ্যাত ডোডো (Dodo) পক্ষী এখন এক প্রকার পুঁথিগত জিনিস হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাছাড়া আধুনিক সুসভ্য মানুষের বিলাসের উপকরণ জোগাইবার জন্য যে কত পক্ষীর বংশলোপ হইতে বসিয়াছে, তাহার ইয়ত্তাই হয় না। অষ্ট্রীচ্ এবং ময়ূরের সুদৃশ্য পক্ষই তাহাদের বিনাশের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। হয় ত দুই তিন শত বৎসরের পর পৃথিবীতে উহাদের কোন চিহ্নই পাওয়া যাইবে না। প্রজাপতি বা অপর পতঙ্গগুলি দীর্ঘজীবী নয়। দুই তিন দিন মাত্র পক্ষবিস্তার করিয়া

ইহারা আনন্দে বিচরণ করে এবং তার পরেই জরাগ্রস্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সংসারে কাহারও সহিত তাহাদের শত্রুতা নাই, এবং তাহারা কাহারও অনিষ্ট করে না। সুসভ্য মানুষের খরদৃষ্টি ইহাদেরও উপরে পড়িয়াছে। সুন্দর পক্ষ দুইটিকে কাটিয়া রাখিবার জন্য সভ্য মানুষ জাল হাতে করিয়া দলে দলে প্রজাপতির পশ্চাতে ছুটিতেছে। এই অত্যাচারে কয়েক জাতীয় সুদৃশ্য প্রজাপতির বংশলোপ হইবার উপক্রম হইয়াছে।

বড় বড় নদনদী এবং জলাশয়গুলির জল দূষিত করিয়া মানুষ নানা জলচর প্রাণীর যে সংহার কার্য্য নীরবে চালাইতেছে, তাহা আরও ভয়ানক। জলাশয়ের জলকে নির্ম্মল রাখার কার্য্যে জলচর প্রাণী কম সহায় নয়। আমাদের কল-কারখানার আবর্জ্জনা ও ড্রেনের দূষিতপদার্থযোগে নদীজল এত কলুষিত হইয়া পড়িতেছে যে, পরম হিতকর জলচর প্রাণিগণও আর জলে থাকিতে পারিতেছে না। ক্রমেই তাহারা নির্ব্বংশ হইতে বসিয়াছে। নদীগুলি এখন অনিষ্টকর জীবাণুতে পূর্ণ। টেম্‌স্ নদীতে আর সামন্ (Salmon) মৎস্য পাওয়া যায় না, এবং আমাদের ভাগীরথী ও পদ্মা মৎস্য-হীন হইয়া আসিতেছে। খুব সম্ভবতঃ আর কয়েক শত বৎসর পরে সভ্যদেশে শ্যামতটশালিনী স্বচ্ছতোয়া নদী দুর্লভ হইবে। কৃমি ও জীবাণু-পূর্ণ কলুষবাহী নদী নগরবক্ষ দিয়া বহিয়া যাইবে। ভবিষ্যৎ মানবজাতিকে এই বীভৎস দৃশ্য দেখিতেই হইবে। আধুনিক বিজ্ঞানকে ইহার জন্য দায়ী করিলে চলিবে না। মানুষের অর্থপিপাসা এবং বিলাসপরায়ণতাকেই তখন ধিক্কার দিতে হইবে। প্রজাপতি ও ময়ূরের সুদৃশ্য পক্ষযুগল এবং হস্তীর তুষারশুভ্র কঠিন দন্তযুগ্ম মানুষের ঘর সাজাইবার উপকরণপ্রস্তুতের জন্যই যে ভগবান্ নির্ম্মাণ করেন নাই, এই সহজ কথাটা আধুনিক বৈজ্ঞানিক-যুগের মানুষ যে কেন ভুলিয়া যায়, তাহা জানি না। এই সকল পাপের দণ্ড মানুষকে এক দিন গ্রহণ করিতেই হইবে। যে বজ্রের আঘাত মানব-

জাতি মাথা পাতিয়া লইয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবে, তাহা প্রকৃতির কর্ম্মশালায় প্রস্তুত হইতেছে।

প্রাণিজগৎ ছাড়িয়া দিয়া উদ্ভিদ্‌দিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, মানুষের সংহারকার্য্যের ধারাবাহিকতা সেখানেও দেখা যায়। গাছ কাটিয়া বন পোড়াইয়া, মানুষ জগতের এবং নিজের যে অনিষ্ট করিতেছে তাহা উপেক্ষা করিবার নয়। ভূপৃষ্ঠ নিজেই সচ্ছিদ্র। উদ্ভিদ্‌দিগের গভীর এবং সুদূর-বিস্তৃত মূল মৃত্তিকাকে জমাট বাঁধিতে না দিয়া উহার সচ্ছিদ্রতা আরও বাড়াইয়া তোলে। বর্ষার জল ভূগর্ভে প্রবেশ করিলে শিকড়সংলগ্ন মৃত্তিকা স্পঞ্জের ন্যায় সেই জল ধরিয়া রাখে। তার পর যখন গ্রীষ্মের প্রচণ্ড সূর্য্যতাপে ভূপৃষ্ঠ ও জলাশয়গুলি শুষ্ক হইতে আরম্ভ করে, তখন সেই অরণ্যতলে সঞ্চিত জলরাশি মাটির ভিতর দিয়া ধীরে ধীরে সঞ্চরণ করিয়া জলাশয়গুলিকে পূর্ণ করিতে থাকে। অরণ্যের এই জলসঞ্চয় কাজটি বড় কম ব্যাপার নয়। বড় বড় জঙ্গলগুলি কাটিয়া ফেলিলেই যে দেশে জলকষ্ট ও দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাসে তাহার অনেক প্রমাণ আছে। ডার্টমুর হইতে খাল কাটিয়া ইংলণ্ডের প্লাইমাউথ্ সহরে জল জোগাইবার ব্যবস্থা বহুদিন ধরিয়া চলিয়া আসিতেছিল। ঐ অঞ্চলে যে দুই একটি বড় জঙ্গল ছিল তাহা কাটিয়া ফেলায়, এখন খাল প্রায় শুষ্ক হইয়া আসিয়াছে। সকল দেশেই অরণ্যধ্বংসের এই প্রকার প্রত্যক্ষ কুফল হাতে হাতে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। বৃক্ষসকল তাহাদের মূল দ্বারা কেবল জল আট্‌কাইয়াই যে দেশের হিতসাধন করে, তাহা নয়; স্থানীয় স্বাস্থ্যরক্ষা-ব্যাপারেও ইহাদের অনেক কাজ আছে। খুব শুষ্ক এবং খুব ভিজা বায়ুর মধ্যে কোনটিই স্বাস্থ্যের অনুকূল নয়। এক নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ জলীয় বাষ্প বায়ুতে মিশ্রিত থাকিলে, কেবল তাহাই আমাদের হিতকর হয়। উদ্ভিদদেহ হইতে অবিরাম যে জলীয় বাষ্প বহির্গত হয়, তাহাই শুষ্কতানিবারণ করিয়া

বায়ুকে প্রাণীর স্বাস্থ্যপ্রদ করিয়া তোলে। অরণ্যের ধ্বংসসাধন করিয়া স্পেন যে কুকার্য্য করিয়াছিল, এখন দুর্ভিক্ষ ও জলকষ্টের বেদনায় তাহার প্রায়শ্চিত্ত চলিতেছে। মার্কিনেরাও ধীরে ধীরে অরণ্য-উচ্ছেদের কুফল বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন। চীন এবং তিব্বতের সীমান্তপ্রদেশ কয়েক শত বৎসর পূর্ব্বে উর্ব্বরতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল, দেশ অরণ্যহীন করায় এখন তাহা প্রাণিচিহ্ন-বর্জ্জিত-মহাপ্রান্তরে পরিণত হইয়াছে।

পৃথিবীর নানা অংশে যে সকল বৃহৎ মরুভূমি আছে, তাহাদের উৎপত্তির জন্য মানুষকে অবশ্যই সম্পূর্ণ দায়ী করা যায় না। কিন্তু কতকগুলি স্থানে যে সকল ক্ষুদ্র মরুভূমি ধীরে ধীরে বিস্তার লাভ করিয়া শ্যামল উর্ব্বর ভূখণ্ডকে গ্রাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহার জন্য মানুষই দায়ী। প্রাণিদেহের আহত অংশে ক্ষত দেখা দিলে, তাহা যেন ক্রমেই বিস্তার লাভ করিয়া সুস্থ অংশে জুড়িয়া বসে, ক্ষুদ্র মরুভূমিগুলি সেই প্রকার ক্ষতের ন্যায়ই বিস্তার লাভ করিয়া পার্শ্বস্থ উর্ব্বর ভূভাগকে কুক্ষিগত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। মরুভূমির এই প্রকার ক্রমবিস্তার ভূপৃষ্ঠের ব্যাধিবিশেষ, সুতরাং ইহার নিবারণ মানুষের সাধ্যাতীত। কিন্তু মানুষই যে বন কাটিয়া নানা স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মরুভূমির উৎপাদন করিতেছে, তাহা সুনিশ্চিত। এইগুলি যখন কালক্রমে বিস্তার লাভ করিয়া সমগ্র ভূভাগকে গ্রাস করিয়া ফেলিবে, তখন মানুষ নিজের কুকার্য্যের ফল আরও দেখিতে পাইবে।

ইন্দ্রিয়ের অপূর্ণতা

বিজ্ঞানাচার্য্য নিউটন্ তাঁহার দিব্যচক্ষুর সাহায্যে জলস্থল, আলোক-বিদ্যুৎ ও গ্রহ-তারকায় প্রকৃতির অনন্ত লীলা প্রত্যক্ষ করিয়া অবাক্ হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা ছিল এবং উদ্যমেরও সীমা ছিল না। কিন্তু অনন্যসাধারণ শক্তির অধিকারী হইয়াও তিনি যখন প্রাকৃতিক রহস্যগুলিকে আয়ত্ত করিতে পারিলেন না, তখন তাঁহাকে হতাশভাবে বলিতে হইয়াছিল,—প্রকৃতির রাজ্য অনন্ত সমুদ্রকূলের ন্যায়ই বিশাল; বালকের দুর্ব্বল হস্ত যেমন সেই বেলাভূমিতে বিক্ষিপ্ত শিলাখণ্ডগুলিকে নিঃশেষে আহরণ করিতে পারে না, আমরাও সেই প্রকার প্রকৃতির কার্য্যের খুঁটিনাটিগুলিকে আয়ত্ত করিতে পারি না।

যখন নিউটন্ এই কথাগুলি বলিয়াছিলেন, বিজ্ঞান তখন শৈশবের সীমা উত্তীর্ণ হয় নাই। চক্ষু-কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গুলিকে সজাগ রাখিয়া সম্মুখে যাহা পাইয়াছিলেন, তিনি তাহাকেই আঁকড়াইয়া ধরিয়া দেখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁর মনে হইয়াছিল, জীবনটা যদি অনন্তকালস্থায়ী হয়, তবেই বুঝি সবগুলিকে নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিবার সময় মিলে।

নিউটনের মৃত্যুর পর বহু বৎসর চলিয়া গিয়াছে। যে সকল প্রাকৃতিক ঘটনার কারণ আবিষ্কারের জন্য সময় না পাইয়া তিনি ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন, এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে একে একে তাহার অনেকগুলিরই সুব্যাখ্যা পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু তিনি যে পথ ধরিয়া প্রাকৃতিক রহস্যের উদ্ভেদ সম্ভবপর মনে করিয়াছিলেন, পরবর্ত্তী পণ্ডিতগণ সে পথে চলেন নাই।

নিউটনের সময়ে পণ্ডিতগণ চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের কার্য্যে অযথা বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, ইন্দ্রিয়ের স্বাভাবিক জ্ঞানকেই সর্ব্বোচ্চ আসন দিতেন।

কিন্তু আধুনিক পণ্ডিতগণ বৈজ্ঞানিক গবেষণায় উহাকে অতি নিম্নস্থানে বসাইয়াছেন। মনে হয়, সাধারণ ইন্দ্রিয়-জ্ঞানকে এত নীচে নামানো হইয়াছে বলিয়াই আজ বিজ্ঞানের এত উন্নতি। কেবল চক্ষু-কর্ণাদির স্বাভাবিক শক্তির উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকিলে, জড়-বিজ্ঞান নিউটনের সময় যে স্থানে ছিল, আজও সেই স্থানেই থাকিত।

যে সকল ত্রুটির জন্য ইন্দ্রিয়ের স্বাভাবিক শক্তি বৈজ্ঞানিক গবেষণার অনুপযোগী হইয়াছে, আমরা তাহারি দুই একটির বিষয় আলোচনা করিব।

গুরুত্বের একটা নির্দ্দিষ্ট সীমা পার না হইলে আমরা যে, কোন পদার্থের ওজন বুঝিতে পারি না, তাহার পরিচয় আমরা প্রতিদিনই পাই। বালুকার কয়েকটি ক্ষুদ্র কণা হাতে লইলে, আমরা সেগুলির গুরুত্ব মোটেই বুঝিতে পারি না; কিন্তু এক সের বা আধ সের ওজনের জিনিস হাতে করিবামাত্র সেটার যে গুরুত্ব আছে তাহা অনায়াসে বুঝিয়া ফেলি। সুতরাং দেখা যাইতেছে, আমাদের ইন্দ্রিয় অতি লঘু বস্তুর ভার অনুভব করিতে পারে না।

জিনিস কতটা ভারি হইলে যে, আমরা তাহার ভার বুঝিতে আরম্ভ করি, তাহা স্থির করিবার জন্য এ পর্য্যন্ত অনেক চেষ্টা হইয়াছে কিন্তু অনুসন্ধানে কোন নির্দ্দিষ্ট সীমা পাওয়া যায় নাই। বোধ হয়, গুরুত্ববোধের সীমা মানুষমাত্রেই এক নয়। যে পরিমাণ ভারি হইলে আমি কোন জিনিষের অস্তিত্ব বুঝিতে আরম্ভ করিব, সেই জিনিসটাকেই অপর লোকের হাতে দিলে হয়ত সে তাহার গুরুত্ব বুঝিবে না।

দুই জিনিসের ওজনের পার্থক্য স্থির করা, ইন্দ্রিয়ের আর একটি কার্য্য। এই কাজেও ইন্দ্রিয়ের অযোগ্যতার অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। বিখ্যাত জার্ম্মাণ পণ্ডিত ভেবার্ (Weber) এই বিষয়টি লইয়া অনেক পরীক্ষা করিয়াছিলেন। ইহা হইতে জানা যায়, প্রত্যেক লোকেরই ওজনের

পার্থক্যজ্ঞানের এক একটা সীমা আছে। এই সীমার মধ্যে মানুষ বেশ ওজনের আন্দাজ করিতে পারে, কিন্তু সীমার বাহিরের ওজনের পার্থক্য বুঝা তাহার পক্ষে খুব কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। যিনি তিন সের ও চারি সেরের পার্থক্য আন্দাজ করিতে পারেন, উহাদের দ্বিগুণ ওজন অর্থাৎ ছয় সের ও আট সেরের পার্থক্যও তিনি বেশ বুঝিবেন। কিন্তু সাত ও আট, বা ছয় ও সাত সের ইত্যাদি এলোমেলো ওজনের পার্থক্য স্থির করা তাঁহার পক্ষে অসাধ্য হইয়া পড়িবে।

এই প্রকার অক্ষমতা আমরা প্রত্যেক ইন্দ্রিয়েরই কাজে দেখিতে পাই। তাপালোক, স্বাদ-গন্ধ, শব্দ-স্পর্শ প্রভৃতির অনুভূতিতেও এক একটা সীমা আছে। কতকগুলি ইন্দ্রিয়ের ক্ষমতা ব্যক্তিবিশেষে স্বভাবতঃ অধিক বা অল্প হইতে দেখা যায়। কাজেই, এই সকল ইন্দ্রিয়জ্ঞানের সীমা নির্দ্দেশ করা চলে না। কিন্তু কয়েকটি প্রধান প্রধান ইন্দ্রিয়ের কার্য্যের সীমা মনুষ্যমাত্রে একই দেখা যায়। মানুষের শারীরিক অবস্থাভেদে এগুলির বড় ইতরবিশেষ হয় না।

কোন জিনিসকে আঘাত দিয়া প্রতি সেকেণ্ডে এক হইতে নয়বার পর্য্যন্ত শব্দ করিলে আমরা শব্দগুলিকে বেশ পৃথক্ পৃথক্ শুনিতে পাই। কিন্তু শব্দের সংখ্যা সেকেণ্ডে দশ বা এগার হইয়া দাঁড়াইলে, তখন আর সেগুলিকে ছাড়া ছাড়া ভাবে শুনা যায় না। হারমোনিয়ম্ বা শঙ্খের শব্দের ন্যায় তাহা একটা অবিচ্ছিন্ন শব্দ হইয়া দাঁড়ায়। ইহা আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয়ের কম অক্ষমতার কথা নয়।

আমাদের দৃষ্টিশক্তিরও ঐ প্রকার অক্ষমতা আছে। এক ইঞ্চিকে হাজার ভাগ করিয়া, তাহার একভাগ লইলে যে একটু দূরত্ব পাওয়া যায় সেই প্রকার দূরে দূরে কতকগুলি বিন্দু কাগজের উপরে অঙ্কিত করিলে, আমরা তখন সেগুলিকে বিন্দু বলিয়া চিনিতে পারি না। বিন্দুগুলিকে

একেবারে পরস্পর সংলগ্ন দেখা যায়। কাজেই, কতকগুলি বিন্দুর স্থানে, আমাদের চক্ষু একটা অবিচ্ছিন্ন রেখা দেখিতে আরম্ভ করে।

ইন্দ্রিয়ের উল্লিখিত দুর্ব্বলতাগুলি আমাদের মাংসপেশীর কার্য্য-তৎপরতার ত্রুটিতে উৎপন্ন হয় বলিয়া এখন অনেকে মনে করিতেছেন। বাহির হইতে কৃত্রিম আঘাত উত্তেজনা দিয়া আমরা মাংসপেশীকে সেকেণ্ডে পঞ্চাশ ষাইট বার স্পন্দিত করিতে পারি সত্য, কিন্তু স্বভাবতঃ তাহা দশ এগার বারের অধিক স্পন্দিত হইতে পারে না। এই কারণে কোন অক্ষরকে সেকেণ্ডে দশ বা এগারো বারের অধিক উচ্চারণ করা অসম্ভব হয়, এবং মনে মনেও আমরা সেটিকে দশ বারের অধিক স্মরণ করিতে পারি না। সুতরাং যে শব্দ বা যে আলোক মাংসপেশীর স্বাভাবিক স্পন্দনের সীমাকে অতিক্রম করিয়া ইন্দ্রিয়ে আঘাত দেয়, তাহাকে মাংস-পেশী বা স্নায়ুমণ্ডলী ঠিক বহন করিয়া লইয়া যায় না। কাজেই, অবিরাম দ্রুত শব্দকে আমরা নিরবচ্ছিন্ন শব্দের ন্যায় শুনিতে থাকি, এবং যে আলোক অতি দ্রুত নিবিয়া আবার জ্বলিয়া উঠিতেছে, তাহাকে স্থির আলোকের ন্যায়ই দেখি।

শরীরের কোন অংশে আঘাত দিলে, আমরা তখনি আঘাতের বেদনা অনুভব করি। আঘাতপ্রাপ্তি ও বেদনা-অনুভূতির মধ্যে যেন সময়ের ব্যবধান নাই বলিয়া মনে হয়। কিন্তু বস্তুতঃ একটা ব্যবধান আছে। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, স্নায়ু সেকেণ্ডে এক শত ফুট বেগে আঘাতের উত্তেজনাকে বহিয়া মস্তিষ্কে পৌঁছাইয়া দেয়। অর্থাৎ দুই শত ফিট দীর্ঘ কোন বিশাল প্রাণিদেহের এক প্রান্তে আঘাত দিলে আঘাতের বেদনা অনুভব করিতে প্রায় দুই সেকেণ্ড কাটিয়া যায়।

স্নায়বিক ও মানসিক কার্য্যের বেগকে আমরা এপর্য্যন্ত দ্রুততার চরম আদর্শ বলিয়া মনে করিয়া আসিতেছিলাম, কিন্তু আজকাল সেই মনের

বেগেরই সীমা দেখিয়া অবাক্ হইতে হয়। মনের বেগ বিদ্যুদ্বেগের তুলনায় অনেক মন্থর। হিসাব করিলে দেখা যায়, আমাদের চিন্তা যদি বিদ্যুতের বেগে ছুটিত, তাহা হইলে আমরা এখনকার কার্য্যের তুলনায় ১৮০০ গুণ অধিক মানসিক কার্য্য করিতে পারিতাম।

ইন্দ্রিয়ের কার্য্যের আরো কতকগুলি সীমার কথা বলিবার আছে। কিছুদিন পূর্ব্বে আমাদের চক্ষু ও কর্ণ খুব সুব্যবস্থিত যন্ত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানাগারের নানা সূক্ষ্ম যন্ত্রের সহিত তুলনা করিলে ইহাদিগকে আর সুন্দর যন্ত্র বলিয়া স্বীকার করা যায় না। আকাশের যে স্থানে আমাদের চক্ষু একটিও নক্ষত্র দেখিতে পায় না, সেই স্থানকে লক্ষ্য করিয়া ফোটোগ্রাফের যন্ত্রযুক্ত দূরবীণ যোজনা করিলে তথায় সহস্র সহস্র নক্ষত্রের অস্তিত্ব প্রকাশ পায়। নগ্নচক্ষুতে আমরা যে স্থানটিকে পরিচ্ছন্ন দেখি, অণুবীক্ষণ যন্ত্র সেই স্থানেই সহস্র সহস্র জীবাণুর অস্তিত্ব দেখাইয়া দেয়। উঁচু-নীচু সুর অনুসারে হার্‌মোনিয়মের পর্দ্দা-গুলিকে যেমন কতকগুলি সপ্তকে (Octave) ভাগ করা হয়, ঈথরের যে সকল ক্ষুদ্র-বৃহৎ তরঙ্গ দ্বারা নানা আলোকের উৎপত্তি হয়, আমরা সেগুলিকে নয়টি সপ্তকে ভাগ করিতে পারি। হিসাবে দেখা যায়, এই নয়টি সপ্তকের মধ্যে মানুষ কেবল একটির আলোক দেখিতে পায়। তবেই হইল, একটা বৃহৎ হারমোনিয়মের উপর-নীচের ৬৩ খানি পর্দ্দায় আঙ্গুল না দিয়া কেবল মাঝামাঝি সাত খানি দ্বারা সুর বাহির করিতে থাকিলে, আমরা যেমন যন্ত্রটির মর্য্যাদা বুঝিতে পারি না, সেই প্রকার শত শত ক্ষুদ্র-বৃহৎ ঈথর-তরঙ্গ দ্বারা আমাদের চারিদিকে যে নব নব আলোকের তুফান উঠিতেছে, তাহার মধ্যে কেবল সাতটি আলোককে দেখিয়া আমরা জগদ্ব্যাপী বিচিত্র আলোকের মহিমাও বুঝিতে পারি

না। ফোটোগ্রাফের যন্ত্র আজকাল সেই সকল অদৃশ্যালোকের অস্তিত্ব আমাদিগকে সুস্পষ্ট দেখাইয়া দিতেছে।

চক্ষু যেমন আলোকসাগরে ডুবিয়া থাকিয়াও সকল আলোককে দেখিতে পায় না, সেই প্রকার কর্ণও নানা শব্দদ্বারা তরঙ্গায়িত বায়ুর মধ্যে থাকিয়াও সেই সকল শব্দ আমাদিগকে শুনাইতে পারে না। অত্যন্ত দ্রুত বেগে কম্পিত হইয়া বায়ু যে শব্দ উৎপন্ন করে, আমরা তাহা শ্রবণে চিরবঞ্চিত। ক্ষুদ্র মক্ষিকার পদক্ষেপে যে মৃদুশব্দের উৎপত্তি হয় মাইক্রো-ফোন (Microphone) নামক যন্ত্রদ্বারা তাহা শুনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু আমাদের কর্ণ সেই শব্দের আঘাতে মোটেই সাড়া দেয় না।

তাপের অনুভূতিতেও আমাদের ইন্দ্রিয়ের দৈন্য জানা গিয়াছে। ছায়া হইতে রৌদ্রে গেলে যে, তাপের মাত্রা বৃদ্ধি পায়, আমরা তাহা বেশ বুঝিতে পারি। কিন্তু অতি অল্প মাত্রায় তাপের হ্রাসবৃদ্ধি চলিলে, তাহা অনুভব করিবার শক্তি আমাদের কোন ইন্দ্রিয়েরই নাই। যাঁহাদের স্পর্শজ্ঞান অত্যন্ত প্রবল, এক-পঞ্চমাংশ ডিগ্রি উষ্ণতার হ্রাসবৃদ্ধি তাঁহারা অনায়াসে অনুভব করিতে পারেন। কিন্তু উষ্ণতা এই সীমার নিম্নে গেলে, মানুষের স্পর্শেন্দ্রিয় তাহাতে সাড়া দেয় না। অধ্যাপক ল্যাঙ্‌লে বোলোমিটার (Bolometer) নামক যে একটি যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছেন, সেটি আমাদের স্পর্শেন্দ্রিয়কে সম্পূর্ণ পরাভূত করিয়াছে। এই যন্ত্রের অনুভব শক্তি আমাদের গাত্রচর্ম্মের শক্তি অপেক্ষা প্রায় দুই লক্ষ গুণ অধিক। এক ডিগ্রির দশ লক্ষ ভাগের একভাগে যে অত্যল্প উষ্ণতা থাকে, তাহাও এই যন্ত্রে ধরা পড়ে।

এই সকল যন্ত্র ব্যতীত অধ্যাপক ব্রান্‌লি ও রদারফোর্ড সাহেব তারহীন বার্ত্তাবহন-যন্ত্রে বার্ত্তাগ্রহণের জন্য সম্প্রতি যে কয়েকটি সূক্ষ্ম যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহাদের কার্য্য দেখিলে, আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি যে

কত স্থূল, তাহা আরো স্পষ্ট বুঝা যায়। আধুনিক অনেক যন্ত্রই আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলির নানা দৈন্য অতি স্পষ্ট করিয়া দেখাইতেছে।

ইন্দ্রিয়ের এই দুর্ব্বলতাগুলির কথা আলোচনা করিলে মনে হয়, সূক্ষ্মযন্ত্রের উদ্ভাবনের জন্য গত শতাব্দীতে বিশেষ চেষ্টা না হইলে আজ আমরা বিজ্ঞানকে এত উন্নত দেখিতে পাইতাম না। প্রকৃতিদেবী যে সকল মহান্ সত্যকে শত শত রহস্যের কুহেলিকায় আচ্ছন্ন করিয়া আমাদের অক্ষম ইন্দ্রিয়জ্ঞানের অন্তরালে রাখিয়াছেন, আধুনিক উন্নত যন্ত্রই সেই কুহেলিকা ভেদ করিয়া সত্যকে উদ্ধার করিবার পথ দেখাইতেছে। অতি-প্রাচীনকালের তুলনায় আজ আমরা প্রকৃতই দিব্য ইন্দ্রিয় লাভ করিয়াছি।

উদ্ভিদের আত্মরক্ষা

মানুষের আকৃতি লইয়া জন্মগ্রহণ করিলেই মানুষের মত সংসারে টিকিয়া থাকা যায়না। ঘরে-বাহিরে আমাদের যে সকল শত্রু আছে, তাহাদের আক্রমণ হইতে আমরা যদি নিজেকে রক্ষা করিতে পারি, তবেই এই বিশাল জগতের এক প্রান্তে আমাদের স্থান হয়। নচেৎ বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।

যে গৃহস্থ নিজের ঘটিবাটিগুলাকে না সাম্‌লাইয়া এবং টাকা-কড়ির বাক্স খুলিয়া অবারিতদ্বার গৃহে নিদ্রামগ্ন থাকে, প্রভাতে তাহার যথাসর্ব্বস্ব তো পাওয়াই যায় না, সঙ্গে সঙ্গে গৃহস্বামীর জীবনান্তেরও সম্ভাবনা আসিয়া পড়ে। এ প্রকার গৃহস্থ সংসারে বা সমাজে টিকিয়া থাকিতে পারে না। কাজেই, বাহিরের শত্রুর উৎপাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য বাড়ীখানিকে ঘেরিয়া রাখিতে হয়। টাকা-কড়ির বাক্সে একটা তালা লাগাইতে হয়। টাকা অধিক থাকিলে প্রহরীর ব্যবস্থা করিতে হয় এবং হিংস্র জন্তুর ভয় থাকিলে ঘরে দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া দু' একখানা অস্ত্রশস্ত্রও নিকটে রাখারও প্রয়োজন হইয়া পড়ে। ইহা ছাড়া শত্রুদমনের জন্য মানুষকে অধিক কিছু করিতে হয় না।

প্রকৃতির সহিত মানুষের খুবই বৈরিতা আছে। বাতাস একটু ঘন হইলে তাহাতে শ্বাসকার্য্যের ব্যাঘাত হয়। কাজেই, শরীর টিকে না। সেই বাতাসই একটু পাতলা হইলে হাঁফ লাগে। মানুষ রুদ্ধশ্বাস হইয়া মরিয়া যায়। যে সকল ব্যাধির জীবাণু ঝাঁকে ঝাঁকে চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, কোন গতিতে তাহারা দেহে উপনিবেশ স্থাপন করিলেই সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়। এ সকলই সত্য। কিন্তু ইহাদের দমনের জন্য মানুষকে একটুও

চেষ্টা করিতে হয় না। যে জগদীশ্বর এই সকল প্রবল শত্রুর মধ্যে মানুষকে ছাড়িয়া দিয়াছেন, তিনিই উহাদিগকে দমন করিবার জন্য স্বহস্তে সুব্যবস্থা করিতেছেন। ভগবানের বাণী ও প্রকৃতির নির্দ্দেশ না মানিয়া জীবনযাত্রার উপায়টাকে আমরা যখন অত্যন্ত কৃত্রিম ও জটিল করিয়া তুলি, তখনই প্রকৃতি আমাদের বৈরী হয়। যে সকল রক্তপিপাসু শত্রু চারিদিকে থাকিয়াও পূর্ব্বে আমাদিগকে স্পর্শ করিতে পারিত না, তাহারাই আমাদিগকে ছদ্মবেশে আবৃত দেখিয়া তখন সংহারকার্য্য সুরু করিয়া দেয়।

এক মানুষ লইয়াই জগৎ নয়। কীট, পতঙ্গ, সরীসৃপ, পশু, পক্ষী প্রভৃতি সহস্র সহস্র অপর প্রাণীও মানুষের ন্যায় জাতিবদ্ধ হইয়া বিচরণ করিতেছে। ঠিক আমাদেরি মত উহাদের সুখদুঃখ ও ভয়ক্রোধের অনুভূতি এবং বৈরিতা ও সখ্য বুঝিবার শক্তি আছে। শত্রুর পীড়ন হইতে ত্রাণ পাইয়া সহজে জীবনটাকে কাটাইবার জন্য যেটুকু বুদ্ধির আবশ্যক, ভগবান ইহাদিগকে তাহা মুক্তহস্তে দান করিয়াছেন। জীবরাজ্যে আর একদিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায়, উদ্ভিদ্‌জাতীয় সহস্র জীব ভূতলকে ছাইয়া রহিয়াছে। অতি সূক্ষ্ম আণুবীক্ষণিক উদ্ভিদ্ হইতে আরম্ভ করিয়া শতবর্ষজীবী মহাতরু সকলেই এই বৃহৎ খণ্ডরাজ্যের প্রজা। মানুষ ও ইতর প্রাণীদিগের ন্যায় ইহারা সুখদুঃখ, ভয়ক্রোধ অনুভব করিতে পারে কি না জানি না। তবে যে স্থূল বুদ্ধিদ্বারা বন্য পশুরা নিভৃত স্থানে গুহা রচনা করে এবং পরাক্রান্ত শত্রুর আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া সুখে জীবনটাকে কাটাইয়া দেয়, সে বুদ্ধিটুকু যে উদ্ভিদের নাই তাহা সুনিশ্চিত। যে অনাথ ও নিঃসহায়, এক ভগবানই তাহার সহায় হন। প্রকৃতি তাঁহারি দূত সাজিয়া সহস্র উপায়ে তাহাকে জীবিত রাখে। বহু শত্রুদ্বারা পরিবেষ্টিত অসহায় উদ্ভিদগুলিকে প্রকৃতি কি কৌশলে রক্ষা করে, আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহারি কিঞ্চিৎ আভাস দিব।

প্রাণীদিগের মধ্যে যাহারা দুর্ব্বল, আত্মরক্ষার জন্য তাহাদিগের শরীরেই কতকগুলি সুব্যবস্থা থাকে। কচ্ছপ ও শম্বুকজাতীয় প্রাণীর দেহ কঠিন আবরণে আচ্ছাদিত। শত্রুর আক্রমণের আশঙ্কা উপস্থিত হইলেই, নিজের দেহকে সেই সহজ বর্ম্মের মধ্যে লুকাইয়া ফেলে। মধুমক্ষিকার বিষাক্ত হুল, হরিণ ও গো-জাতির শৃঙ্গ আত্মরক্ষারই অস্ত্র। উদ্ভিদের আত্মরক্ষার ব্যবস্থাও এই প্রকার তাহাদের দেহেই বর্ত্তমান। মানুষ বা অপর প্রাণীদিগের শত্রু এক প্রকার নয়। এজন্য শত্রুর প্রকৃতি বুঝিয়া ইহাদিগকে নিরাপদ থাকিবার উপায় উদ্ভাবন করিতে হয়। উদ্ভিদ্‌গণও ঠিক সেই প্রকারে বিশেষ উপায়ে বিশেষ বিশেষ শত্রুর উপদ্রব নিবারণ করে। যে সকল বৃক্ষের পাতা সুস্বাদ, ক্ষুদ্র পতঙ্গ তাহাদের পরম শত্রু। ইহাদের আক্রমণ নিবারণের জন্য পাতাগুলিকে শুঁয়ো দ্বারা আবৃত থাকিতে দেখা যায়। কচি পাতা স্বভাবতঃ পুরাতন পাতা অপেক্ষা কোমল। কাজেই, কচি পাতাগুলিকে কীটপতঙ্গের উপদ্রব অধিক সহ্য করিতে হয়। এই কারণে যে সকল বৃক্ষের পত্রে বিকৃত স্বাদ নাই, তাহাদের নবপত্রগুলি পরীক্ষা করিলে লম্বা লম্বা অনেক শুঁয়ো দেখিতে পাওয়া যায়। সেগুলি এমন বিচিত্রভাবে পাতার উপর সজ্জিত থাকে যে, কোনক্রমে ক্ষুদ্র পতঙ্গ তাহাদিগকে ঠেলিয়া পাতায় আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে না।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, উদ্ভিদ্-দেহে আত্মরক্ষার অনুকূলে যে সকল পরিবর্ত্তন আসে, তাহা কি প্রকারে উৎপন্ন হয়?

গত শতাব্দীতে ডারউইন্, হক্‌স্‌লি, স্পেন্‌সার, ওয়ালেস প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ এই ব্যাপারটি লইয়া খুবই আলোচনা করিয়াছিলেন। আজকাল আবার মেণ্ডেলের শিষ্যবর্গ ও ডেভ্‌রিজ্-প্রমুখ অনেকে সেই ব্যাপারটিকেই নূতনভাবে আলোচনা করিতেছেন। এই সকল আলোচনা হইতে

উদ্ভিদ্‌দেহের পরিবর্ত্তনের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যান কতকটা বুঝা যাইতেছে বটে, কিন্তু তথাপি ইহার মূলে এত রহস্য রহিয়া গিয়াছে যে, যদি কেহ ব্যাপারটিকে অব্যাখ্যাত বলিয়া প্রচার করেন, তবে অধিক কিছুই বলা হয় না।

যাহা হউক, এখনকার বৈজ্ঞানিকগণ এ সম্বন্ধে কি বলেন, দেখা যাউক। ইহাদের বক্তব্যের স্থূল মর্ম্ম এই যে, একই পিতামাতার সন্তানদিগের মধ্যে যেমন নানা রূপান্তর দেখা যায়, সেই প্রকার বীজ হইতে যখন নূতন বৃক্ষ জন্মায়, তখন সকল সময় তাহাদের আকার প্রকার ঠিক মূল বৃক্ষের অনুরূপ হয় না। কোন গাছের পাতা যদি লম্বা থাকে, কখন কখন তাহারি চারায় অপেক্ষাকৃত গোলাকার পাতা দেখা যায়। মূল বৃক্ষের ফল সুমিষ্ট ও বৃহৎ হইলে হয় ত তাহারি একটি চারার ফল ক্ষুদ্র ও বিস্বাদ হইয়া পড়ে। এই পরিবর্ত্তনগুলির কারণ নির্দ্দেশ করা কঠিন। বৈজ্ঞানিকগণ ইহাকে প্রকৃতির খেয়াল (Freaks) বলিয়াই নিষ্কৃতি পাইয়াছেন। খেয়ালই হউক বা উদ্দেশ্য-মূলকই হউক, এই প্রকার আকস্মিক পরিবর্ত্তন যে আসৃষ্টি চলিয়া আসিতেছে, তাহা সুনিশ্চিত।

জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ পূর্ব্বোক্ত খেয়াল-পরিবর্ত্তনগুলিতেই উদ্ভিদের নানা অঙ্গের স্থায়ী পরিবর্ত্তনের মূল দেখিতে পাইয়াছেন। আত্মরক্ষার উপযোগী যে সকল সুব্যবস্থা উদ্ভিদ্‌দেহে ক্রমে অভিব্যক্ত হইয়াছে, তাহাদেরও মূলে ঐ খেয়াল বর্ত্তমান। জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ বলিতেছেন, যে উদ্ভিদের সুস্বাদ পাতাগুলিকে পতঙ্গে নষ্ট করিতেছে, খেয়ালে পড়িয়া তাহার কোন এক সন্তান যদি কয়েকটি শুঁয়ো লইয়া জন্মগ্রহণ করে, তবে এই খেয়াল তাহার জীবন রক্ষার অনুকূল হইয়া পড়ে। কীটপতঙ্গ ইহার পাতাগুলিকে আর নষ্ট করিতে পারে না। কাজেই, গাছটি নিরুপদ্রবে বাড়িয়া নিজের বীজ দ্বারা শুঁয়োযুক্ত অনেকগুলি নূতন চারা উৎপন্ন করিবার সুযোগ পাইয়া

যায়। অবশেষে বংশধরগণের মধ্যে প্রত্যেকে সেই শুঁয়োর সাহায্যে জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইয়া এমনটি হইয়া দাঁড়ায় যে, তখন ইহাদিগকে সেই কীটবিদ্ধ মূলবৃক্ষের সন্তান বলিয়া চিনিয়া লওয়া কঠিন হইয়া পড়ে।

আমরা কেবল শুঁয়োযুক্ত উদ্ভিদের অভিব্যক্তির একটা উদাহরণ দিলাম। প্রত্যেক উদ্ভিদে আত্মরক্ষা ও বংশবিস্তারের জন্য যে সকল সুব্যবস্থা আছে, তাহার সকলই পূর্ব্বোক্ত প্রকারে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া পণ্ডিতগণ মনে করিতেছেন। যে সকল উদ্ভিদ্ গোমহিষাদির ভক্ষ্য, তাহাদের কোন বংশধর কেবল শুঁয়োযুক্ত হইয়া জন্মিলে সংসারে বিশেষ সুবিধা করিতে পারে না। এই পরিবর্ত্তনে উভয়ের ভক্ষ্য-ভক্ষক সম্বন্ধ লোপ পায় না। কিন্তু উহাদেরি বীজ কোন বিশেষ মৃত্তিকায় পড়িয়া কোন রাসায়নিক ক্রিয়ায় যদি তিক্ত বা উগ্রগন্ধযুক্ত দেহ লইয়া অঙ্কুরিত হয়, তবে পশুদিগের সহিত সংগ্রামে ইহাদের আর পরাজয়ের সম্ভাবনা থাকে না। আমাদের দেশের বেল, লেবু ও তুলসীর পাতার উগ্রগন্ধ এবং প্রথমোক্ত দুইটি উদ্ভিদের কাঁটার উৎপত্তি পশুদিগের সহিত প্রতিযোগিতা হইতে হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। বেল ও লেবুগাছের নীচেকার ডাল-গুলিতেই অধিক কাঁটা দেখা যায়। অনেক সময় উঁচু ডালে মোটেই কাঁটা থাকে না। সুতরাং পশুদিগের উপদ্রব শান্তির জন্যই যে ক্রমে এই সকল উদ্ভিদ্দেহে অভিব্যক্ত হইয়াছে, তাহা সুস্পষ্ট বুঝা যায়।

আমাদের দেশের ময়না গাছ পাঠক হয়ত দেখিয়া থাকিবেন। ইহার প্রত্যেক ডালের প্রত্যেক গ্রন্থিতে লম্বা লম্বা কাঁটা সজ্জিত থাকে। মনে হয়, কোনকালে বন্য পশুগণ পাতা খাইতে গিয়া উহার ডালগুলিকে ভাঙ্গিয়া ফেলিত। কাজেই, এই উপদ্রব হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ডালের সর্ব্বাঙ্গে তীক্ষ্ণ কাঁটা বাহির করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল। খেজুর গাছের পত্রশীর্ষের কাঁটাগুলি যে পশু তাড়াইবার মহা অস্ত্র, তাহা একবার

দেখিলেই বুঝা যায়। কাঁটাগুলি ধারাল সূচের ন্যায় প্রত্যেক পাতার অগ্রভাগে সাজানো থাকে। ইহা দেখিয়া কোন পশুই আহারের চেষ্টায় বৃক্ষ স্পর্শ করে না। ফল পাকিলে পক্ষিগণও কাঁটা ঠেলিয়া সহসা সেগুলিকে নষ্ট করিতে পারে না।

উদ্ভিদের শত্রু কেবল ভূপৃষ্ঠেই বিচরণ করে না। মাটির তলেও ইহাদের শত্রু আছে। মূল ভক্ষণ করিয়া বৃক্ষগুলিকে মারিয়া ফেলা ইহাদের প্রধান কাজ। কাঁটা বা শুঁয়োদ্বারা এই সকল শত্রুকে তাড়ানো যায় না। কাজেই, শত্রুদমনের জন্য অপর কোন সুকৌশলের প্রয়োজন। উদ্ভিদ্‌সকল অন্য কোন উপায় না পাইয়া নিজের মূলগুলিকে অত্যন্ত বিস্বাদ এবং কখন কখন বিষাক্ত করিয়া পোকার উপদ্রব হইতে আত্মরক্ষা করে। ওল ও কচুর মূল সত্যই বিষাক্ত। পোকার উৎপাত এগুলিতে কদাচিৎ দেখা যায়।

আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই, যে ব্যক্তি স্বাবলম্বী ও ক্ষমতাশালী, তাহারি চারিদিকে অনেক অতিথি আসিয়া জোটে। এই প্রকার আশ্রয়াকাঙ্ক্ষীদিগকে প্রায়ই অক্ষম ও দুর্ব্বল হইতে দেখা যায়। কোন গতিকে পরের স্কন্ধে ভর দিয়া দিনযাপন করা তাহাদের জীবনের মূল লক্ষ্য। উদ্ভিদ্‌দিগের মধ্যে যাহারা স্বাবলম্বী ও আত্মরক্ষায় নিপুণ, তাহারাই অনাদৃত অবস্থায় মাঠে-ঘাটে জন্মায়, এবং নিজকে নিজেই নানা উপদ্রব হইতে রক্ষা করিয়া যথাকালে মরিয়া যায়। বেড়ার গায়ে আমরা যে শেয়ালকাঁটা ইত্যাদি গাছ লাগাই, তাহা বাগানের গন্ধরাজ ও মল্লিকা গাছ অপেক্ষা অনেক উন্নত। শেয়ালকাঁটা তাহার কাঁটার সাহায্যে নিজেকে নিজে সর্ব্বদাই রক্ষা করে, কিন্তু এক ঝাড় মল্লিকাকে মাঠের মাঝে পুঁতিয়া দিলে সেগুলি কখনই আত্মরক্ষা করিতে পারে না। যাহা হউক, উদ্ভিদ্‌দিগের মধ্যে যাহারা স্বাবলম্বী, তাহাদিগকে দেখিতে শুনিতে নিতান্ত সাদাসিধে

ও আড়ম্বরহীন হইলেও আশ্রিত প্রতিপালন ব্যাপারে ইহারা সহৃদয় মানুষের মতই উদার। শেয়ালকাঁটা, বুনো খেজুর বা বড় বড় কাঁটার ঝোপগুলির তলা খুঁজিলে অনেক নিঃসহায় ও দুর্ব্বল উদ্ভিদ্‌কে সেখানে জন্মিতে দেখা যায়। আত্মরক্ষার উপযোগী কোন ব্যবস্থাই ইহাদের দেহে থাকে না। কাজেই, কাঁটাঝোপের ন্যায় কোন নিরুপদ্রব স্থান মনোনীত করিয়া না লইলে ইহাদের জীবন সংশয় হইয়া পড়ে।

বিছুটি গাছের পাতায় যে লম্বা লম্বা শুঁয়ো জন্মে, তাহা সত্যই বিষাক্ত। কোন গতিকে পাতা গায়ে ঠেকিলেই গা ফুলিয়া উঠে। এই ব্যবস্থায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণীগুলি বিছুটির নিকটে আসিতে পারে না বটে, কিন্তু গো-মহিষাদি বড় বড় জন্তু শুঁয়ো দেখিয়া একটুও ভয় পায় না। কাজেই, এই সকল প্রাণীদিগের কবল হইতে আত্মরক্ষার জন্য ইহাদিগকে অপর আর একটা কিছু করিতে হয়। পল্লীগ্রামের বনজঙ্গলে পাঠক যদি বিছুটির গাছগুলিকে লক্ষ্য করেন, তবে দেখিবেন, দুর্গম কাঁটা-ঝোপের তলই ইহাদের জন্মস্থান। কেবল বিছুটি নয়, অনেক দুর্ব্বল উদ্ভিদ্‌কে ঠিক এই প্রকারেই মহতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া জীবিত থাকিতে দেখা যায়। কাঁটাঝোপ আমাদের হিসাবে অতি নিকৃষ্ট উদ্ভিদ্‌ হইলেও উদ্ভিদ্‌জগতে তাহারা অগতির গতি স্বাবলম্বী মহৎ জীব।

মানুষ ভগবানের নিকট হইতে যে একটু বুদ্ধি পাইয়াছে, তাহারি সাহায্যে সে এখন অপর জীব হইতে অনেকটা স্বতন্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহাদের চলাফেরা, আচার বিহার প্রভৃতিতে যে কৃত্রিমতা আছে, তাহাই যেন ঐ স্বাতন্ত্র্যকে স্পষ্ট করিয়া দিয়াছে। মানুষ নিজে যে পথ ধরিয়া চলিয়াছে, তাহা যে কোথায় গিয়া শেষ হইবে ভগবানই জানেন। কিন্তু ইহারা কতকগুলি নিকৃষ্ট জীবের উপর আধিপত্য করিয়া যে, তাহাদের ধ্বংসের পথ নিয়তই পরিষ্কার করিতেছে, তাহা আর অস্বীকার করিবার

উপায় নাই। বিড়াল, কুকুর, ঘোড়া, গরু ইত্যাদি প্রাণীগুলিকে মানুষ তাহার কৃত্রিম জীবনের গণ্ডীর ভিতর টানিয়া লইয়া সেগুলিকে এখন এত অসহায় করিয়া তুলিয়াছে যে, এখন জীবনের প্রত্যেক প্রয়োজনটির পূরণের জন্য উহারা মানুষের মুখাপেক্ষী হইয়া পড়িয়াছে।

শৃঙ্গ গো-মহিষাদি পশুর আত্মরক্ষার প্রধান অস্ত্র। মানুষ নানা উপায় অবলম্বন করিয়া শৃঙ্গহীন পশু উৎপন্ন করিতেছে। কুকুর যে সকল গুণ পাইয়া এপর্য্যন্ত নিজের অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া আসিতেছিল, মানুষের আশ্রয়ে থাকিয়া তাহা একে একে হারাইতে বসিয়াছে। কাজেই যদি কোন কারণে আজ হঠাৎ সমগ্র মনুষ্যজাতির উচ্ছেদ হয়, তবে অপর জীবদিগের সহিত সংগ্রামে জয়লাভ করিতে না পারিয়া পূর্ব্বোক্ত পশুদিগের বংশলোপ অনিবার্য্য হওয়ারই সম্ভাবনা অধিক।

মানুষ পূর্ব্বোক্ত প্রকারে অনেক উদ্ভিদ্‌কেও বিকৃত করিয়া তুলিয়াছে। সর্ব্বাঙ্গ কাঁটায় ঢাকিয়া কাঁটানটে গাছগুলি এপর্য্যন্ত বেশ নিরুপদ্রবে জীবন যাপন করিতেছিল। মানুষ কাঁটা ভাঙ্গিয়া তাহাদিগকে এমন করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে যে, এখন এক শ্রেণীর নটে গাছে আর কাঁটা জন্মে না। কাঁটানটের এই নিষ্কণ্টক বংশধরগুলিকে বাগানের বাহিরে পুতিয়া দিলে, তাহারা বোধ হয় একদিনের জন্যও পশুদিগের কবল হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে না। গোলাপ গাছের পিতামহগণ যে খাঁটি বন্য ও স্বাবলম্বী ছিল, গায়ের কাঁটাই তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। কিন্তু মানুষের হাতে পড়িয়া উহাদের দুর্দ্দশা চরম সীমায় পৌঁছিয়াছে। আজকাল নানা কৌশলে যে কাঁটাহীন গোলাপ গাছ উৎপন্ন করা হইতেছে, তাহাদের মত অসহায় উদ্ভিদ্ বোধ হয় আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বাগানের বাহিরে এখন আর ইহাদের স্থান নাই।

আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগ

গত শতাব্দীর মধ্যকাল হইতে বৈজ্ঞানিক যুগের আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া একটা কথা শুনা যায়। কিন্তু সকল দিক্ দিয়া বিবেচনা করিলে, বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভকেই প্রকৃত বৈজ্ঞানিক যুগের আবির্ভাবকাল বলিতে হয়। কোন নূতন ব্যাপার চক্ষে পড়িলে প্রথমে আমাদের মনে একটা বিস্ময়ের ভাব দেখা দেয় এবং তার পরেই তাহাকে আমাদের প্রাত্যহিক কাজে লাগাইবার জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা হয়। গত শতাব্দীতে যে সকল বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হইয়া গিয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকটি চমকপ্রদ ও বিস্ময়কর ; সেগুলিকে পাইয়া সমগ্র পৃথিবী ব্যাপিয়া যে জয়োল্লাস ও আনন্দকোলাহল উঠিয়াছিল, তাহার এখন প্রায় অবসান হইয়া আসিয়াছে। তাছাড়া নবাবিষ্কৃত ব্যাপারগুলিকে প্রাত্যহিক কার্য্যে ব্যবহার করিবার জন্য ছোট বড় বৈজ্ঞানিকদিগের মনে যে প্রবল তৃষ্ণা জাগিয়া উঠিয়াছিল, তাহাও নানা আবশ্যক-অনাবশ্যক যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া নিবৃত্তি লাভ করিতে বসিয়াছে। এখন লাভ-ক্ষতির হিসাব পরীক্ষার সময় উপস্থিত। যে সকল চিন্তাশীল বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞানকে জ্ঞানের চক্ষুতে দেখিতে চাহিতেছেন, তাঁহারা এখন যেন কল-কারখানার ভিতরে তাপালোক ও বিদ্যুৎ-চুম্বকের খেলা দেখিয়া তৃপ্ত হইতে পারিতেছেন না। বিজ্ঞানের গূঢ়তম অংশে যে সকল বৃহৎ তত্ত্ব লুক্কায়িত আছে, সকলে তাহারি সন্ধানে ফিরিতেছেন। ইঁহারা বুঝিয়াছেন, যে এক বৃহৎ ভিত্তির উপর তাপালোক, চুম্বক-বিদ্যুৎ এবং রাসায়নিক শক্তি দাঁড়াইয়া বিচিত্র লীলা দেখাইতেছে, তাহার সন্ধান করিতে না পারিলে সকলি ব্যর্থ হইয়া যাইবে। সুগঠিত যন্ত্র বা অপর কোন নূতন কিছু

পূর্ব্বেকার বৈজ্ঞানিকদিগকে আনন্দ দিতে পারিত, আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ সেগুলি দেখিয়া তৃপ্ত হইতেছেন না।

এই অতৃপ্তি এবং সত্যলাভের প্রবল আকাঙ্ক্ষা এখন অপর কোন বিশেষ দেশের বিশেষ বৈজ্ঞানিকসম্প্রদায়ে আবদ্ধ নাই। সমগ্র জগতেরই বৈজ্ঞানিকগণ এইভাবে ক্ষুব্ধ হইতেছেন। আকাঙ্ক্ষা ও আগ্রহ থাকিলে অতি দুর্লভ জিনিসও করায়ত্ত হইয়া পড়ে। আধুনিক পণ্ডিতদিগের মধ্যে যাঁহারা বৈজ্ঞানিক সারসত্যের জন্য সাধনা আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহারা ক্রমেই সেই বাঞ্ছিতের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। ইহাই প্রকৃত বৈজ্ঞানিক যুগের সূচনা করিয়া দিয়াছে। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে সেই সকল নবসত্যের মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ করিব।

অধিক দিন নয়, কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও বৈজ্ঞানিকগণ জড়ের পরিজ্ঞাত ধর্ম্মগুলিকে নাড়া-চাড়া করিয়া সময় কাটাইতেন। সেগুলির ঘনিষ্ঠ পরিচয় গ্রহণ করাই যে বিজ্ঞানালোচনার চরম সার্থকতা, তাহা তাঁহাদের মনেই হইত না। যে উৎস হইতে সমগ্র শক্তির ধারা বাহির হইয়া অনন্ত বিশ্বকে প্লাবিত করিতেছে, তাহার সন্ধান করিতে পারিলেই যে, সকল অভাব ঘুচিয়া যাইবে এবং সকল সমস্যার মীমাংসা হইবে, একথাও তাঁহারা মনে করিতে পারিতেন না। ইলেক্ট্রন্ (Eleotron) সংক্রান্ত যে সকল সিদ্ধান্ত অল্প দিন হইল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা বৈজ্ঞানিকদিগকে সেই উৎসেরই পথে চালাইতেছে। এটা বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগের সর্ব্বপ্রধান আবিষ্কার।

প্রায় শত বৎসর ধরিয়া বিদ্যুৎ লইয়া বৈজ্ঞানিকগণ নাড়াচাড়া করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু এই সুদীর্ঘ কালে উহার যথার্থ পরিচয় গ্রহণ করা হয় নাই। এই বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই ইহার অনেক রহস্য প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। এখন জড় ও জীবের ধর্ম্মে এবং রাসায়নিক পরিবর্ত্তনাদি

ব্যাপারেও বিদ্যুতের কার্য্য দেখা যাইতেছে। বিজ্ঞানের প্রত্যেক শাখা-প্রশাখাকে এক একটা স্বতন্ত্র ব্যাপার বলিয়া যে একটা বিশ্বাস পূর্ব্ব পণ্ডিতদিগকে অভিভূত করিয়া রাখিয়াছিল, তাহার ভ্রম পদে পদে ধরা পড়িতেছে। দার্শনিকগণই বলিতেছিলেন, সর্ব্বশক্তিমানের একটু শক্তি-কণিকাই বিশ্বে সঞ্চরণ করিয়া তাহাকে এত বিচিত্র করিয়া তুলিয়াছে। আমরা বিজ্ঞানের ভিতর দিয়াও আজ সেই সত্যের সুস্পষ্ট আভাস পাইতেছি। এটাও বড় কম লাভের কথা নয়।

বিজ্ঞানজ্ঞ পাঠক অবগত আছেন, জগতে কোন জিনিসকে একেবারে তাপশূন্য হইতে দেখা যায় না। বৈজ্ঞানিকগণ তথাপি জড়ের এক তাপহীন অবস্থা (Absolute zero) কল্পনা করিয়া অনেক তত্ত্বের মীমাংসা করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু এইপ্রকার কোন বাস্তব পদার্থের সহিত আমাদের পরিচয় না থাকায়, সকল তত্ত্বের সুমীমাংসা হইত না। যে স্থানটুকু জুড়িয়া আমাদের ক্ষুদ্র পৃথিবী বা অপর গ্রহ-নক্ষত্রগণ অবস্থান করিতেছে, কেবল তাহাতেই তাপের লীলা দেখা যায়। অনন্ত বিশ্বের অধিকাংশ স্থানই নিস্তাপ, নিস্পন্দ এবং শুদ্ধ। বর্ত্তমান যুগেই অধ্যাপক ডিওয়ার (Prof. Dewar) দীর্ঘ সাধনার ফলে পদার্থকে নিস্তাপ করিবার উপায় উদ্ভাবন করিয়া সেই শুদ্ধ প্রকৃতির সহিত আমাদের পরিচয় করাইয়া দিয়াছেন। ইহাতে বৈজ্ঞানিকগণ এখন জড়কে এক নূতন দিক্ দিয়া দেখিয়া জড়ধর্ম্মের মূল অনুসন্ধান করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

অণুবীক্ষণ যন্ত্র বহুকাল হইল নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার সাহায্যে ছোট জিনিসকে বড় করিয়া দেখিয়া জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ অনেক গভীর তত্ত্বেরও আবিষ্কার করিয়াছেন, কিন্তু কেহ কখন এই যন্ত্রে অণুর সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারেন নাই। আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগেই উহার নামটি সার্থক হইতে চলিয়াছে। ধাতব পদার্থের অণুর সংগঠন আজকাল অণুবীক্ষণ যন্ত্র

দ্বারা ধরা পড়িতেছে। বিশেষতঃ চাপ প্রয়োগ করিলে বা টানিলে ঐ সকল পদার্থে আণবিক বিন্যাসের যে একটু আধটু পরিবর্ত্তন হয়, তাহা বৈজ্ঞানিকগণ প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছেন। এই আবিষ্কারটিকেও আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগের একটা প্রধান আবিষ্কার বলা যাইতে পারে।

নিউটন্ সাহেব তাপ ও আলোকের রশ্মিকে জড়কণার প্রবাহ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার বিশ্বাস হইয়াছিল, উজ্জ্বল বা উত্তপ্ত পদার্থ-মাত্রই নিজদেহের অতি সূক্ষ্ম কণা ত্যাগ করিয়া তাপ ও আলোকরশ্মির উৎপত্তি করে। কিন্তু সেই সময়ে প্রত্যক্ষ ঘটনার সহিত নিউটনের এই সিদ্ধান্তের মিল দেখা যায় নাই। কাজেই, তাঁহাকে বর্জ্জন করিতে হইয়াছিল। ইহার ফলে গত শতাব্দীর মধ্যকালে ঈথরীয় সিদ্ধান্তের জন্ম হইয়াছিল। আজকাল বৈজ্ঞানিকগণ অধিকাংশ পদার্থকেই অল্পাধিক পরিমাণে রশ্মিবিকিরণক্ষম দেখিতে পাইতেছেন। এই রশ্মিগুলি সাধারণ তাপ বা আলোকের রশ্মি নয়। পদার্থের দেহেরই অতি ক্ষুদ্র কণা রশ্মির আকার গ্রহণ করিয়া চারিদিকে ছুটিয়া চলে। এগুলি বৈজ্ঞানিকদিগের কল্পিত অণু অপেক্ষাও ক্ষুদ্র।

জড়পদার্থের বিয়োগধর্ম্মটি আধুনিক বিজ্ঞানে এক নূতন আলোক পাত করিয়াছে। জগতের সমগ্র জিনিসই ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে, এবং তাহাদেরই দেহের ভস্মকণিকা হইতে নূতন পদার্থের সৃষ্টি হইতেছে। এই সুন্দর জড়জগতের তলায় তলায় যে, এত ভাঙাগড়া, জন্মমৃত্যু, ঘাত-প্রতিঘাত, হাস্য-ক্রন্দন নীরবে চলিতেছে, তাহা বোধ হয় বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকগণই বিজ্ঞানের ভিতর দিয়া দেখাইতে পারিয়াছেন। তিথি, মাস, ঋতু, সম্বৎসর, চেতন-অচেতন এবং প্রাণী-উদ্ভিদ্ সকলই সেই ভাঙাগড়ার ভিতরে পড়িয়া এত সুন্দর এবং এত আনন্দময় হইয়াছে। তাই আমাদের কবি সমগ্র বিশ্বকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন,—

"পারবি নাকি যোগ দিতে এ ছন্দে রে!
এই খসে' যাবার ভেসে যাবার ভাঙবারই আনন্দে রে।
পাতিয়া কান শুনিস্ না যে
দিকে দিকে গগন মাঝে
মরণবীণায় কি সুর বাজে
তপন-তারা-চন্দ্রে রে,

* * * *

ছেড়ে দেবার ফেলে দেবার মরবারই আনন্দে রে॥"

যখন ওয়াট্ সাহেব বাষ্পীয় যন্ত্রের উদ্ভাবন করেন, তখন জগৎ ব্যাপিয়া এক ভীষণ আনন্দকোলাহল উত্থিত হইয়াছিল। কলের সাহায্যে অল্পব্যয়ে বহুকার্য্য সম্পন্ন হইতেছে ভাবিয়া সকলেই আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু বৈজ্ঞানিকগণ তখন হিসাবের খাতা পরীক্ষা করিবার সুযোগ পান নাই। কতটা শক্তি খাটাইয়া কল হইতে কতটা কাজ আদায় করা গেল, তখন তাহা হিসাব করা যাইত না। শক্তি ও কার্য্যের মাপকাঠিও জানা ছিল না। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ মাপ-কাঠি গড়িয়া এখন শক্তি এবং কার্য্যকে মাপিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আজকাল বাজারে সর্ব্বোৎকৃষ্ট যন্ত্র বলিয়া যে সকল কল প্রসিদ্ধ, তাহাতে প্রযুক্ত শক্তির শতকরা কেবল ১৮ ভাগ মাত্র কাজে লাগে; অবশিষ্ট ৮২ ভাগ কলের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলিকে বৃথা গরম করাইয়া ব্যয়িত হয়। ইহা দেখিয়া আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ অবাক্ হইয়া পড়িয়াছেন। এখন এই বাজে খরচের পরিমাণ কি প্রকারে কমানো যাইতে পারে, তাহা স্থির করিবার জন্য সকলে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন।

প্রাণিদেহের মাংসপেশী খাদ্য হইতে যে শক্তি আহরণ করে, তাহার সমস্তটাই বাহিরের কাজে ব্যয় করে না। ইহার অনেকটা দেহের উত্তাপ

রক্ষার জন্য ব্যয়িত হয়। তথাপি খাদ্য হইতে সংগৃহীত শক্তির অন্ততঃ শতকরা ২৫ ভাগ আমরা বাহিরের কাজে লাগাইতে পারি। একজাতীয় সমুদ্রচর মৎস্য (Electric Eel) ইচ্ছামত শরীর হইতে বিদ্যুৎ নির্গত করিতে পারে। এই বিদ্যুতের দ্বারা তাহারা ক্ষুদ্র জলচরদিগকে বধ করিয়া আহার করে। সহজ অবস্থায় সূক্ষ্ম তড়িদ্-বীক্ষণ যন্ত্রে এই তড়িতের সন্ধান পাওয়া যায় না, কিন্তু শিকারের সময় উপস্থিত লইলেই মেরুদণ্ডের স্নায়বিক কোষসকল উত্তেজিত হইয়া হঠাৎ এত বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে যে, দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। অথচ তড়িৎ উৎপন্ন করিবার জন্য মৎস্য-দেহে কোন প্রকার জটিল যন্ত্র নাই, এবং বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইলে তাহার এক কণাও বৃথা তাপ উৎপাদন করিয়া ব্যয়িত হয় না। জোনাকি-পোকা যে আলোক প্রদান করে তাহা একেবারে তাপশূন্য। শক্তির ষোল আনাই তাহাদের দেহের বাহুল্যবর্জ্জিত যন্ত্রদ্বারা আলোকে পরিণত হইয়া পড়ে। প্রকৃতি দেবী তাঁহার অন্তঃপরের নিভৃত কক্ষে বসিয়া যে কৌশলে বাজে খরচ নিবারণের উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন, বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকগণ এখন তাহারই সন্ধানে ব্যস্ত। জৈবপদার্থের অনুরূপ কোন জিনিস প্রস্তুত করিতে হইলে বৈজ্ঞানিকগণ যন্ত্রের এবং নানা রাসায়নিক দ্রব্যের সাহায্য গ্রহণ করিয়া থাকেন। কিন্তু উদ্ভিদ্ এবং প্রাণীর দেহে সেই বস্তুকে অনায়াসে অতি দ্রুত উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। এই কার্য্যের জন্য বৈদ্যুতিক উনান্ বা সুসজ্জিত পরীক্ষাশালা কিছুই আবশ্যক হয় না। প্রকৃতি যে কৌশলে প্রত্যেক শক্তিকণিকার সদ্ব্যবহার করিতেছেন, তাহারই অনুকরণে যন্ত্রগুলিকে বাহুল্যবর্জ্জিত ও সরল করাই যে প্রধান কর্ত্তব্য, আধুনিক যুগের বৈজ্ঞানিকগণই তাহা বুঝিয়াছেন।

গত শতাব্দীর শেষকালে প্রসিদ্ধ ফরাসী বৈজ্ঞানিক পাষ্টুর সাহেব চিনি হইতে সুরার উৎপত্তি পরীক্ষা করিতে গিয়া যখন জীবাণুর কার্য্যের সন্ধান

পাইয়াছিলেন, তখন সেই জীবাণুর তত্ত্ব লইয়া যে বিজ্ঞ[illegible] এক মহাশাখা গঠিত হইতে পারিবে, একথা কাহারও মনে হয় নাই। জীবাণুর (Bact[illegible]a) নাম শুনিলেই আমরা তাহাদিগকে নানাপ্রকার ব্যাধির উৎপাদক এবং প্রাণীর পরম শত্রু ভাবিয়া আতঙ্কিত হই। জীবাণু একজাতীয় জীব নয়। প্রাণীর যে বৃহৎ বিভাগটিকে আমরা পতঙ্গ বলি, তাহা যেমন ছোট-বড় নানা আকারের সহস্র সহস্র প্রাণী লইয়া গঠিত, জীবাণুও সেই প্রকারে এক বৃহৎ জীব-পরিবারের নাম মাত্র। ইহাও নানা শ্রেণীর এবং নানা প্রকৃতির আণুবীক্ষণিক জীবের সমষ্টি। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে বৈজ্ঞানিকগণ প্রায় দেড়হাজার বিচিত্র জীবাণুর সন্ধান করিয়াছেন, কিন্তু এই বিশাল জীব-পরিবারের মধ্যে কেবলমাত্র পঞ্চাশটিকে মানবের শত্রু বলিয়া স্থির করা হইয়াছে। অবশিষ্ট সকলে সুশীল এবং প্রাণী ও উদ্ভিদের পরম সুহৃদ্। ইহাদের জীবনের ইতিহাস লক্ষ্য করিলে মনে হয়, উচ্চতর জীবের কল্যাণ সাধনের জন্যই যেন ইহাদের জন্ম। কেহ বায়ু হইতে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করিয়া উদ্ভিদ্‌কে পুষ্ট করিতে ব্যস্ত, কেহ গলিত জীবাবশেষের বিশ্লেষণ করিয়া মৃত্তিকাকে উর্ব্বর করিবার জন্য নিযুক্ত। নদী, সমুদ্র ইত্যাদি জলাশয়ের জলরাশিকে যে আমরা এত নির্ম্মল দেখি, তাহাতেও জীবাণুর হস্তচিহ্ন বর্ত্তমান। আধুনিক চিকিৎসকগণ এই সকল ক্ষুদ্র জীবের জীবনের ইতিহাস অনুসন্ধান করিয়াই আজকাল নানা ঔষধের আবিষ্কার করিতেছেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্যাধিগ্রস্ত সহস্র সহস্র নরনারীর রোগ-যাতনা দূর হইয়া পড়িতেছে। ব্যবসায়-বাণিজ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেও ইহাদের অশেষ মঙ্গল কার্য্য ধরা পড়ে। মদ্য প্রস্তুত, দধি, ক্ষীর ও মাখন উৎপাদন, এমনি কি, উৎকৃষ্ট রুটি প্রস্তুত প্রকরণেও বিশেষ বিশেষ জীবাণুর বিচিত্র কার্য্য দেখা যাইতেছে। জীবাণুবিদ্‌গণ এখন জীবাণুগুলির মধ্যে যেগুলি সুশীল, তাহাদিগকে চিনিয়া লইতে

শিখিয়াছেন, [illegible] লালন পালন করিয়া তাহাদিগকে নানা কাজেও [illegible]াইতেছেন।

কোন বিশেষ আবিষ্কার দ্বারা আমাদের প্রাত্যহিক কাজকর্ম্মের কতটা সুবিধা হইল, ইহাই বিবেচনা করিয়া আবিষ্কারের মূল্য নির্দ্ধারণ করা জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত থাকিলেও, তাহাকে বিজ্ঞানের মাপদণ্ড বলিয়া স্বীকার করা যায় না। স্বীকার করিলেই বিজ্ঞানের প্রতি অবিচার করা হয়, এবং তাহাকে অসম্ভব খাটো করিয়া দেখা হয়। জ্ঞান ও বিজ্ঞানের মধ্যে কোন পার্থক্যই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। যে জ্ঞান প্রকৃতির সহিতই পরিচয় স্থাপন করাইয়া মানুষকে জগদীশ্বরের এই অনন্ত সৃষ্টির মহিমা দেখায়, তাহাই বিজ্ঞান। যিনি প্রকৃত বৈজ্ঞানিক, তিনি কেবল জ্ঞানী নহেন, জ্ঞানের বৃদ্ধি করাও তাঁহার একটা কাজ। আণুবীক্ষণিক জীবাণুর সাহায্যে উৎকৃষ্ট দধি প্রস্তুত হইল কি না, কেবল তাহা দেখিয়াই আধুনিক বিজ্ঞানে জীবাণুতত্ত্বের স্থান নির্দ্দেশ করিলে চলিবে না। জীবাণুর আবিষ্কারে প্রাকৃতিক কার্য্যের যে-সকল কৌশল জানা গিয়াছে, কেবল তাহাদেরি গুরুত্ব দেখিতে হইবে। জীবাণুতত্ত্ব এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। আমরা কেবল এই জন্যই জীবাণুতত্ত্বকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগের একটা প্রধান আবিষ্কার বলিয়া স্বীকার করিতেছি।

জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানে ফোটোগ্রাফি

যন্ত্র ব্যবহারে আজকাল অনেক দুঃসাধ্য কাজ অনায়াসসাধ্য হইতেছে। কৃষিশিল্প, ব্যবসায়বাণিজ্য, যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতি অনেক ব্যাপারে এখন যন্ত্রই প্রধান অবলম্বন। বিজ্ঞানও যন্ত্রের নিকট অশেষ প্রকারে ঋণী। দূরবীক্ষণ, অণুবীক্ষণ এবং স্পেক্‌ট্রোস্কোপ্ (Spectroscope) প্রভৃতি যন্ত্রগুলি যে কত বৈজ্ঞানিক প্রহেলিকার মীমাংসা করিয়াছে, সুতাই তাহার ইয়ত্তা হয় না। প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে হার্শেল সাহেব যখন তাঁহার স্বহস্ত-নির্ম্মিত দূরবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্যে ইউরেনস্ গ্রহ আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তখন জ্যোতিঃশাস্ত্রের ন্যায় একটা গণিতপ্রধান বিদ্যায় যন্ত্র ব্যবহারের উপযোগিতা দেখিয়া বৈজ্ঞানিকগণ বিস্মিত হইয়াছিলেন। এখন আর সে বিস্ময়ের কারণ নাই। ফরাসী জ্যোতির্ব্বিদ্ লেভেরিয়ার (Le Verier) এবং ইংরাজ বৈজ্ঞানিক আডাম্‌স্ সাহেব যে দিন কেবল গণিতের সাহায্যে নেপচুন গ্রহের আবিষ্কার সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন, সেইদিন হইতে আজ পর্য্যন্ত কেবল গাণিতিক হিসাবে আর কোন জ্যোতিষ্কের আবিষ্কার হয় নাই। আবিষ্কর্ত্তারা এখন যন্ত্রকেই গবেষণার প্রধান অবলম্বন করিয়া তুলিয়াছেন।

নানা জ্যোতিষিক যন্ত্রের মধ্যে জ্যোতির্ব্বিদ্ মহলে আজকাল ফোটোগ্রাফের ক্যামেরার বড়ই আদর। এই ক্ষুদ্র যন্ত্রটির সাহায্যে গত ষাট বৎসরের মধ্যে যে সকল জ্যোতিষিক আবিষ্কার সুসম্পন্ন হইয়াছে, আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহাদেরি একটু স্থূল বিবরণ দিবার চেষ্টা করিব। পূর্ব্বে ফোটোগ্রাফের যন্ত্র কেবল ছবি তোলার জন্যই ব্যবহৃত

হইত; ইহাঁ যে, কোন কালে বৈজ্ঞানিকদিগের হস্তে পড়িয়া চক্ষুর অগোচর নানা জ্যোতিষ্কের পরিচয় সংগ্রহ করিতে থাকিবে, তাহা সেই সময়ে কেহ কল্পনাই করিতে পারেন নাই।

মানবচক্ষুর গঠনপ্রণালী খুব সুন্দর হইলেও বিধাতা ইহাকে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর করিয়া দেন নাই। অতিদূর-জ্যোতিষ্কের ক্ষীণ আলোকে মানব-চক্ষু সাড়া দেয় না। কিন্তু রাসায়নিক প্রলেপ-যুক্ত ফোটোগ্রাফের কাচের উপর সেই ক্ষীণালোকই দীর্ঘকাল ধরিয়া পড়িতে থাকিলে কাচে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য ক্ষুদ্র জ্যোতিষ্কটির ছবি আপনা হইতে ফুটিয়া উঠে। বহুক্ষণ কোন অস্পষ্ট জিনিসের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিলে মানবচক্ষু অবসন্ন হইয়া আসে। তখন আর সে জিনিসটিকে দেখা যায় না। ফোটোগ্রাফের কাচের অবসাদ নাই। রাত্রির পর রাত্রি একটি অনুজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের দিকে উন্মুক্ত রাখ, তাহার খুঁটিনাটি সকল বিবরণ কাচের উপরকার চিত্রে ফুটিয়া উঠিবে। আজ প্রায় পঞ্চাশ বৎসর হইল, আকাশ পর্য্যবেক্ষণে ফোটোগ্রাফ যন্ত্রের এই সকল উপযোগিতা বৈজ্ঞানিকদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, এবং কিছুদিন পরেই ইঁহারা এই যন্ত্রের সাহায্যে জ্যোতিষ্কের চিত্র সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কেবল চিত্রদৃষ্টে গত কয়েক বৎসরের মধ্যে যে সকল ধূমকেতু, নীহারিকা এবং ক্ষুদ্রগ্রহ (Asteroids) আবিষ্কৃত হইয়া পড়িয়াছে, তাহার সংখ্যা বড় কম নয়।

গত ১৮৬০ সালে স্পেন্ অঞ্চলে যে পূর্ণগ্রাস সূর্য্যগ্রহণ হইয়াছিল, তাহারি পর্য্যবেক্ষণে সর্ব্বপ্রথম ফোটোগ্রাফ্ যন্ত্রের ব্যবহার হয়। পূর্ণগ্রহণে যখন সূর্য্যমণ্ডল চন্দ্রদ্বারা সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, তখন চন্দ্রের ঘোর কৃষ্ণ-বিম্বের চারিদিক হইতে রক্তশিখাকারে একপ্রকার আলোক বাহির হইতে আরম্ভ করে। এগুলি চন্দ্রমণ্ডল হইতে বহির্গত হয় বলিয়া পূর্ব্ববৈজ্ঞানিকগণ অনুমান করিতেন। কিন্তু এই অনুমানের পোষক কোন প্রমাণই তাঁহারা

দেখাইতে পারিতেন না। স্পেনের সূর্য্যগ্রহণের ছবি উঠাইয়া বিষয়টির মীমাংসা করিবার জন্য দুই জন জ্যোতিষী নানা আয়োজন করিয়াছিলেন। যথাসময়ে ছবি উঠাইয়া পরীক্ষা করায় দেখা গিয়াছিল, নগ্নচক্ষুতে দৃষ্ট শিখাগুলি ব্যতীত আরো কতকগুলি ক্ষীণ শিখার সুস্পষ্ট ছবি চিত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ফোটোগ্রাফের ক্যামেরার দৃষ্টিশক্তি মানবদৃষ্টিশক্তির তুলনায় যে কত প্রখর, বৈজ্ঞানিকগণ তাহা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছিলেন, এবং কেবল পূর্ব্বোক্ত ছবি পরীক্ষা করিয়া, রক্তশিখাগুলি যে সূর্য্য হইতেই নির্গত হয়, তাহাও বুঝিয়াছিলেন। ইহার পর অনেক পূর্ণগ্রাস সূর্য্যগ্রহণ হইয়া গিয়াছে, এবং প্রত্যেক গ্রহণেরই শত শত ছবি উঠানো হইয়াছে। এই সকল চিত্র পরীক্ষা করিয়া সূর্য্যের আকাশমণ্ডল ও তাহার প্রাকৃতিক অবস্থা সম্বন্ধে যে সকল নব নব তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইতেছে, তাহা অন্য উপায়ে আবিষ্কার করিবার কোনই সম্ভাবনা ছিল না।

সৌরতত্ত্বাবিষ্কারে ফোটোগ্রাফির যতটা সাহায্য পাওয়া গিয়াছে, গ্রহতত্ত্ব নিরূপণে ইহার তত সাহায্য পাওয়া যায় নাই। ফোটোগ্রাফের ছবিতে নিকটস্থ গ্রহজাতীয় জ্যোতিষ্কের উপরকার দ্রষ্টব্যগুলি ভাল করিয়া ফুটিয়া উঠে না। এইজন্য ভাল দূরবীণ দ্বারা গ্রহবিম্ব পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সাধারণ নিয়মে তাহাদের ছবি অঙ্কন করিবার রীতি আজও প্রচলিত রহিয়াছে। কিন্তু ক্রমে ফোটোগ্রাফির যে প্রকার উন্নতি হইতেছে, তাহাতে আশা করা যায়, গ্রহগণের নিখুঁৎ ফোটো উঠাইবার উপায় শীঘ্রই আবিষ্কৃত হইবে।

যে দিন জ্যোতিষিক পর্য্যবেক্ষণে ফোটোগ্রাফির ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছিল, জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ সেই দিনই বুঝিয়াছিলেন নক্ষত্র পর্য্যবেক্ষণে ইহা একটি প্রধান সহায় হইবে। এখন তাঁহাদের সেই অনুমান সম্পূর্ণ সত্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে জ্যোতিষীদিগের নিকট ভাল

নাক্ষত্রিক মানচিত্র ছিল না। নগ্নচক্ষুতে আকাশে প্রায় ছয় হাজার নক্ষত্র দেখিতে পাওয়া যায়। এইগুলির অবস্থান স্থির করিয়া তাহা যথাযথ ভাবে মানচিত্রে নির্দ্দেশ করা সহজ ব্যাপার নয়। কাজেই, হস্তাঙ্কিত প্রাচীন মানচিত্রে অনেক ভুল থাকিয়া যাইত। ফোটোগ্রাফির সাহায্যে আকাশের চিত্রাঙ্কন এখন অতি সহজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ফ্রান্সের দুইজন জ্যোতিষী নক্ষত্রখচিত সমগ্র আকাশের চিত্র প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। নানা দেশের জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতেছেন। কার্য্য শেষ হইলে মানচিত্রটি নিশ্চয়ই এক অপূর্ব্ব সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইবে।

এতদ্ব্যতীত পরিবর্ত্তনশীল নক্ষত্রের (Variable Stars) আবিষ্কারে ফোটোগ্রাফির অনেক সাহায্য পাওয়া গিয়াছে। এই শ্রেণীর নক্ষত্রগুলির জ্যোতিঃ সকল সময় সমান থাকে না। এক একটি নির্দ্দিষ্ট কালের শেষে ইহাদের উজ্জ্বলতা স্পষ্ট কমিয়া আসে। জ্যোতিষিক পর্য্যবেক্ষণে ফোটোগ্রাফির প্রচলন হইবার পূর্ব্বে জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ কেবল কয়েকটি মাত্র পরিবর্ত্তনশীল তারকার সহিত পরিচিত ছিলেন। এখন একই নক্ষত্রপুঞ্জের নানা সময়ের ছবি তুলনা করিয়া শত শত নক্ষত্রকে পরিবর্ত্তনশীল দেখা যাইতেছে। আমেরিকার হার্‌ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের জগদ্বিখ্যাত জ্যোতিষী পিকারিং সাহেব অল্পদিনের মধ্যে শতাধিক পরিবর্ত্তনশীল নক্ষত্রের আবিষ্কার করিয়াছেন।

নূতন নক্ষত্রের আকস্মিক আবির্ভাব ও তিরোভাব আজকাল একটি অতি সুলভ জ্যোতিষিক ঘটনা বলিয়া পরিচিত। প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ কেবলমাত্র দুই একটি নক্ষত্রের আকস্মিক প্রজ্বলন প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। নক্ষত্রমণ্ডলীর ফোটোগ্রাফের ছবি গ্রহণ করার পদ্ধতি প্রচলিত হওয়ার পর, নূতন নক্ষত্র আর জ্যোতিষীদিগের দৃষ্টির অন্তরালে থাকিতে পারিতেছে না। নক্ষত্রপুঞ্জের নানাকালের বহু চিত্র তুলনা করিয়া ইঁহারা

অনেকগুলি নূতন নক্ষত্রের সন্ধান পাইয়াছেন। গত ১৮৯২ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি তারিখে প্রজাপতি (Auriga) রাশিতে হঠাৎ একটি নূতন উজ্জ্বল নক্ষত্র দেখা গিয়াছিল। জ্যোতিষিগণ মনে করিয়াছিলেন, ঐ দিনেই বুঝি নক্ষত্রটি প্রজ্বলিত হইয়া পড়িয়াছে। ডিসেম্বর মাসে উক্ত রাশির যে ছবি উঠানো হইয়াছিল, অনুসন্ধান করায় তাহাতেও ঐ নক্ষত্রটিকে ক্ষীণাকারে দেখা গিয়াছিল। সুতরাং বলিতে হয়, জন্মের দুইমাস পরে, নূতন জ্যোতিষ্কটি জ্যোতির্ব্বিদ্‌দিগের নিকট ধরা দিয়াছিল। এই ঘটনার পর জ্যোতিষিগণ আকাশের সর্ব্বাংশে খরদৃষ্টি রাখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। নূতন নক্ষত্রগুলির লুক্কায়িত থাকিবার এখন আর উপায় নাই।

নানাশ্রেণীর নক্ষত্রগুলির মধ্যে যুগলজাতীয় নক্ষত্রের (Double Stars) গতিবিধি লইয়া জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ প্রায়ই আলোচনা করিয়া থাকেন। এই নক্ষত্রগুলি যুগলাবস্থায় থাকিয়া এবং কখনো কখনো তিন চারিটি একসঙ্গে থাকিয়া তাহাদের সাধারণ ভারকেন্দ্রের (Centre of Gravity) চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ কয়েকটিমাত্র যুগল-তারকার সন্ধান জানিতেন। ফোটোগ্রাফের ছবি পরীক্ষা করায় এখন যুগলনক্ষত্রের সংখ্যা প্রায় দুই হাজার হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এবং ঐ উপায়ে ইহাদের অনেকগুলির গতির পরিমাণও নির্দ্ধারিত হইয়াছে। যেসকল যুগলনক্ষত্রের জ্যোতিষ্কদ্বয় অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী থাকে, তাহাদের যুগ্মতা বুঝিয়া লওয়া বড়ই কঠিন। সাধারণ যুগলনক্ষত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আমরা নগ্নচক্ষুতে তাহাকে যেমন একক নক্ষত্রের ন্যায়ই দেখি, বৃহৎ দূরবীণ্ দিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিলে অতিনিকট যুগলগুলিকে সেইপ্রকার একক নক্ষত্র বলিয়াই ভ্রম হয়। ফোটোগ্রাফের ছবিদ্বারা এই শ্রেণীর অনেক নক্ষত্রের যুগ্মতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। রশ্মিনির্ব্বাচনযন্ত্রের (Spectroscope) সাহায্যে ইহাদের যে বর্ণচ্ছত্র (Spectrum) উৎপন্ন হয়, তাহার

ছবি উঠাইলে, ফোটোগ্রাফের কাচে দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক্ বর্ণচ্ছত্র উপর্য্যুপরি অঙ্কিত হইয়া পড়ে। কাজেই, নক্ষত্রগুলিকে দূরবীক্ষণে একক দেখাইলেও তাহারা যে বাস্তবিক একক নয়, তাহা বর্ণচ্ছত্রের যুগলছবি দেখিয়া বেশ বুঝা যায়।

নীহারিকাপুঞ্জের (Nebula) সহিত অতিপ্রাচীন জ্যোতির্ব্বিদ্‌দিগেরও পরিচয় ছিল। দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বেকার জ্যোতিষিগণ এন্‌ড্রোমিডা (Andromeda) ও মৃগশিরা রাশির বৃহৎ নীহারিকা দুইটিকে নগ্নচক্ষুতে দেখিয়াছিলেন, এবং পরবর্ত্তী পণ্ডিতগণ এগুলিকে দূরবীণ্ দিয়াও পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। কিন্তু কেহই ইহাদের প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিতে পারেন নাই। ফোটোগ্রাফির সাহায্যে এখন এই নীহারিকাদ্বয়ের শত শত ছবি অঙ্কিত হইতেছে। ইহা ছাড়া আকাশের নানা অংশের ছবি তুলিয়া আরো যে কত বিচিত্র আকারের নীহারিকার সন্ধান পাওয়া যাইতেছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। যে সকল নীহারিকাকে বৃহৎ দূরবীণেও দেখা যায় নাই, ফোটোগ্রাফের কাচে তাহাদের ছবি ফুটিয়া উঠিতেছে।

ধূমকেতুর উচ্ছৃঙ্খলতা চিরপ্রসিদ্ধ। সুতরাং ইহার ন্যায় জ্যোতিষ্ক যে ফোটোগ্রাফের ছবিতে ধরা দিয়া নিজের পরিচয় প্রদান করিবে, কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ তাহা মনে করিতে পারেন নাই। ১৮৯২ সালে অধ্যাপক বারনার্ড (Barnard) সর্ব্বপ্রথমে ফোটোগ্রাফের ছবি দেখিয়া একটি ধূমকেতুর আবিষ্কার করেন। দূরবীণে ইহার সন্ধান পাওয়া যায় নাই, কেবল ছবি দেখিয়াই তাহার আকার-প্রকার, গতিবিধি আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এই ঘটনার পর শত শত ধূমকেতুর ছবি উঠানো হইতেছে, এবং সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হইতে আরম্ভ করিলে ইহাদের পুচ্ছ ও ...ত্তাদি কি প্রকার বিচিত্র আকার ধারণ করিতে আরম্ভ করে, একই ...মকেতুর নানা সময়ের ছবি তুলনা করিয়া তাহা সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছে।

অনন্ত নক্ষত্রলোকের কথা ছাড়িয়া দিয়া আমাদের সৌরজগতের ক্ষুদ্র পরিধির ভিতর ফোটোগ্রাফি কি কার্য্য করিয়াছে, এখন আলোচনা করা যাউক। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গ্রহতত্ত্বের গবেষণায় ফোটোগ্রাফি বৈজ্ঞানিকদিগকে বিশেষ সাহায্য করে নাই। কিন্তু উপগ্রহতত্ত্বের আলোচনা আরম্ভ করিলে আর সে কথা বলা চলে না। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে যে কয়েকটি নূতন উপগ্রহের আবিষ্কার হইয়াছে, তাহার প্রায় সকল গুলিরই সন্ধানে জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ ফোটোগ্রাফির শরণাপন্ন হইয়াছেন।

আমাদের পৃথিবীর চারিদিকে যেমন একটিমাত্র চন্দ্র ঘুরিয়া বেড়ায়, দূরবীণ্ দিয়া দেখিলে শনিগ্রহের চারিদিকে সেইপ্রকার আটটি চন্দ্রকে ঘুরিতে দেখা যায়। সুতরাং এপর্য্যন্ত শনির উপগ্রহের সংখ্যা আটটি বলিয়াই স্থির ছিল। গত ১৮৯৮ সালে মার্কিন জ্যোতির্ব্বিদ্ পিকারিং সাহেব শনির নিকটবর্ত্তী আকাশের ছবিতে হঠাৎ একটি নূতন জ্যোতিষ্কের সন্ধান পাইয়াছিলেন। পুনঃপুনঃ ছবি উঠাইয়া পরীক্ষা করায়, প্রত্যেক চিত্রেই জ্যোতিষ্কটিকে স্পষ্ট দেখা গিয়াছিল, এবং সেটি যেন ক্রমে স্থান পরিবর্ত্তন করিতেছে বলিয়াও বোধ হইয়াছিল। এই প্রকারে জ্যোতিষ্কটি ধরা দিলে, অধ্যাপক পিকারিং ও বারনার্ড সাহেব তাহাকে শনিরই একটি উপগ্রহ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। আজ কয়েক বৎসর হইল ঐ পিকারিং সাহেবই ফোটোগ্রাফ্ পরীক্ষা করিয়া শনির আর একটি উপগ্রহের সন্ধান দিয়াছেন। কেবল ফোটোগ্রাফির সাহায্যে কয়েকবৎসর পূর্ব্বেকার অষ্ট উপগ্রহযুক্ত শনি এখন দশচন্দ্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

গ্রহরাজ বৃহস্পতিরও চন্দ্রসংখ্যা ফোটোগ্রাফির সাহায্যে সম্প্রতি বৃদ্ধি পাইয়াছে। গ্যালিলিয়োর সময় হইতে এ পর্য্যন্ত এই গ্রহটির

চারিটি চন্দ্র আছে বলিয়াই স্থির ছিল। গত ১৮৯২ সালে ইহার পঞ্চম গ্রহের আবিষ্কার হইয়াছিল। এই ঘটনার পর প্রায় দশবৎসর কালের মধ্যে বৃহস্পতিপরিবারস্থ কোন নূতন জ্যোতিষ্কের আর সন্ধান পাওয়া যায় নাই। গত ১৯০৪ এবং ১৯০৫ সালে পেরিন্ (Perrine) সাহেব বৃহস্পতিক্ষেত্রের ছবি পরীক্ষা করিতে গিয়া ক্রমে আরো দুইটি উপগ্রহের অস্তিত্ব দেখাইয়াছিলেন, এবং সম্প্রতি ইংরাজ জ্যোতিষী মেলট্ (Melotte) সাহেব গ্রীনউইচ্ মানমন্দির হইতে ছবি উঠাইয়া বৃহস্পতির আর একটি উপগ্রহ আবিষ্কার করিয়াছেন। সুতরাং বলা যাইতে পারে, এক ফোটোগ্রাফির দ্বারাই বৃহস্পতির উপগ্রহসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া এখন আটটি হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

চক্ষু উন্মীলিত রাখিয়া প্রকৃতির দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, কত তুচ্ছ ব্যাপারের ভিতর দিয়া যে জগদীশ্বরের অপার মহিমার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা ভাবিলে বিস্ময়াবিষ্ট না হইয়া থাকা যায় না। জ্যোতিষ্কলোকের স্থূল জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি জানা গিয়াছে ভাবিয়া যখন বৈজ্ঞানিকগণ নিশ্চিন্ত ছিলেন, ফোটোগ্রাফের ক্যামেরার ন্যায় একটি ক্ষুদ্র যন্ত্র মানুষের জ্ঞানবুদ্ধি যে কত অল্প, তাহা স্পষ্ট প্রতিপন্ন করিয়া দিয়াছিল। জগদীশ্বরের অনন্ত শক্তির যে এক ক্ষুদ্রকণা এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে শৃঙ্খলিত করিয়া কঠোর নিয়মে আবদ্ধ রাখিয়াছে, তাহা যে কত বিশাল ও দূরব্যাপী, ক্ষুদ্রযন্ত্রটি সঙ্গে সঙ্গে সেটিও চাক্ষুষ দেখাইয়াছিল। যে সকল মানুষ জগদীশ্বরের আনন্দময় অসীম শক্তির এই সকল অদ্ভুত লীলা অহরহ দেখিয়াও তাহাদের মর্ম্ম-গ্রহণ করিতে পারে না, তাহারা বাস্তবিকই অন্ধ এবং কৃপার পাত্র।

নূতন নক্ষত্র

আমাদের ক্ষুদ্র পৃথিবীটির চারিদিকের আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া যতগুলি নক্ষত্র অবস্থান করিতেছে, আধুনিক উন্নত জ্যোতিষিক যন্ত্রাদি সাহায্যে তাহাদের সকলেরই ফোটোগ্রাফ্ অঙ্কিত হইয়াছে। নগ্নচক্ষে আমরা যে সকল নক্ষত্র দেখিতে পাই, উক্ত আকাশচিত্রে সেগুলির ছবি ত আছেই, তাছাড়া বড় দূরবীণ্ দিয়া যে সকল ছোট নক্ষত্র দেখা যায়, তাহাদেরও ছবি ইহাতে অঙ্কিত থাকে।

নাক্ষত্রিক ফোটোগ্রাফের কথা শুনিলেই আমাদের মনে হয়, বুঝি ছবির সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে নক্ষত্রগুলি এত ঘনসন্নিবিষ্ট হইয়া প্রকাশ পাইবে যে, কোন্ নক্ষত্রটি কোন্ রাশিস্থ তাহা ঠিক করা যাইবে না। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তাহা নয়,—গণনা দ্বারা দেখা গিয়াছে, আমরা অর্দ্ধাকাশে তিন হাজারের অধিক নক্ষত্র দেখিতে পাই না। তবেই হইল, আমাদের দৃষ্টিশক্তি এতই সঙ্কীর্ণ যে, মোট ছয় হাজারের অধিক নক্ষত্র চোখে পড়ে না। আকাশে বিস্তৃত নক্ষত্রগুলির সংখ্যা অপরিমেয় বলিয়া যে আমাদের একটা ধারণা আছে, সেটা একটা বৃহৎ ভ্রান্তি ব্যতীত আর কিছুই নয়। নক্ষত্রগুলি এলোমেলো ভাবে আকাশের যেখানে সেখানে ছড়াইয়া থাকায় গণনার সুবিধা হয় না বলিয়াই এই দৃষ্টি-বিভ্রমের উৎপত্তি। সুতরাং ছয় হাজার নক্ষত্রের মধ্যে কোন্‌টি কোথায় আছে, তাহা চিত্রের সহিত আকাশস্থ নক্ষত্রের অবস্থাদির তুলনা করিয়া ঠিক রাখা খুব কঠিন হয় না। দূরবীণ্ সাহায্যে ফোটো উঠাইলে নক্ষত্রসংখ্যা বাড়িয়া যায় সত্য,

কিন্তু সমগ্র আকাশটাকে সুনিয়মে ভাগ করিয়া, পরে বৃহৎ বৃহৎ নক্ষত্রগুলিকে লইয়া এক একটি রাশির গঠন করিলে, এই তারকা-বহুল চিত্রের সহিতও সহজে পরিচয় লাভ হইয়া যায়। সমগ্র আকাশস্থ নক্ষত্রগুলি চিত্রে ও নক্ষত্রতালিকায় এমন সুবিন্যস্ত ও শ্রেণীবদ্ধ থাকে যে, আকাশের যে কোন ক্ষুদ্র বা বৃহৎ নক্ষত্রকে দেখাইয়া দিলে সেটির জ্ঞাতব্য সকল ব্যাপারই তৎক্ষণাৎ বলিয়া দিতে পারা যায়।

পাঠক অবশ্যই অবগত আছেন, নক্ষত্রগুলির পরস্পরের মধ্যেকার ব্যবধানের কোনই পরিবর্ত্তন নাই। আজ যে নক্ষত্রটি কোন নিকটস্থ বা দূরবর্ত্তী নক্ষত্র হইতে যতদূরে অবস্থান করিতেছে, কল্য কিংবা শত বৎসর পরেও সেটিকে ঠিক সেই স্থানেই দেখা যাইবে। পৃথিবী দিবারাত্রি লাটিমের মত ঘুরিতেছে সত্য এবং তাছাড়া ঠিক এক বৎসরে ইহাকে সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিয়া আসিতে হয়ও বটে; কিন্তু অধিকাংশ নক্ষত্রই খুব দূরবর্ত্তী বলিয়া, এই আবর্ত্তন ও পরিভ্রমণ তাহাদের পরস্পরের অবস্থানের কোনই পরিবর্ত্তন করিতে পারে না। পৃথিবীর আবর্ত্তন গতিদ্বারা নক্ষত্রের উদয়াস্ত হয় মাত্র। রেলের গাড়ীতে যাইবার সময় পাঠক অবশ্যই দেখিয়াছেন, লাইনের পাশের যে দুটা গাছ কিছু পূর্ব্বে খুব কাছাকাছি ছিল, গাড়ী সেদিকে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিলে, গাছ দুটা যেন ফাঁক ফাঁক হইয়া পড়ে। কিন্তু দিগন্তসংলগ্ন অতি দূরের দু'টা গাছের দিকে তাকাইলে, তাহাদের পরস্পরের মধ্যেকার ব্যবধান অত শীঘ্র পরিবর্ত্তিত হইতে দেখা যায় না। ঘণ্টায় চল্লিশ বা পঞ্চাশ মাইল বেগে চলিয়া, যখন তিন চারি মাইল দূরবর্ত্তী পদার্থদ্বয়ের অবস্থানের এত অল্প পরিবর্ত্তন হইতেছে, তখন পৃথিবী দ্রুতবেগে চলিলেও যে, কোটি কোটি মাইল দূরবর্ত্তী নক্ষত্রগুলির কোন স্থানচ্যুতিই ঘটিবে না, এটা আমরা সহজেই বুঝিতে

পারি। পৃথিবী হইতে অধিকাংশ তারকারই দূরত্ব অত্যন্ত অধিক, এই জন্যই আকাশের চিত্রে তাহাদের স্থান চিরনির্দ্দিষ্ট থাকে। পৃথিবীর পরিভ্রমণ গতি দ্বারা দু'একটি নিকটস্থ তারকার অবস্থানের যে একটু আধটু বিচলন হয়, তাহাতে বিচলিত তারকাকে চিনিয়া লওয়া কঠিন হয় না, বরং বিচলন হইতেছে কি না, তাহাই ঠিক করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে।

এখন পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, বুধ-বৃহস্পতি-চন্দ্র-শুক্রাদি গ্রহ-উপগ্রহের যে নিজের এক একটা গতি আছে, নক্ষত্রগুলির কি সে প্রকার কোন গতিই নাই? জ্যোতির্বিদগণ এই প্রশ্নের উত্তরে বলেন, কোন জ্যোতিষ্কই নিশ্চল নয়। অতি ক্ষুদ্র গ্রহ-উপগ্রহ বা উল্কাপিণ্ড হইতে আরম্ভ করিয়া সহস্র সূর্য্যোপম নক্ষত্র পর্য্যন্ত সকলেই এক এক নির্দ্দিষ্ট পথ ধরিয়া মহাশূন্যে ভীম গতিতে চলাফেরা করিতেছে। গ্রহ-উপগ্রহগুলি আমাদের অতি নিকটবর্ত্তী, তাই তাহাদিগকে আমরা গতিসম্পন্ন দেখি, কিন্তু নক্ষত্রগুলি অতি দূরবর্ত্তী থাকিয়া চলিতেছে বলিয়া দুই এক শত বৎসরে তাহাদের স্থানচ্যুতি চোখে পড়ে না। পাঁচ হাত দূরে কোন এক পথিক খুব মন্থরভাবে চলিতে আরম্ভ করিলে, লোকটা যে চলিতেছে তাহা আরম্ভমাত্রেই বেশ বুঝা যায়, কিন্তু একটা খোলা মাঠে তিন মাইল তফাতে কোন লোক ঘোড়ায় চড়িয়া ছুটিলে, লোকটা সচল কি নিশ্চল পাঁচ মিনিটেও স্থির করা কঠিন হইয়া পড়ে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, নক্ষত্রগুলির স্বকীয় গতি থাকা সত্ত্বেও তাহারা আমাদের চক্ষে প্রায় গতিহীন। কাজেই, আকাশচিত্রে প্রত্যেক নক্ষত্রের স্থান একপ্রকার চিরনির্দ্দিষ্ট থাকিয়া যায়; স্বকীয় গতি, পরস্পরের মধ্যেকার ব্যবধান পরিবর্ত্তনের কোনই সহায়তা করে না। অবশ্য

পৃথিবীর আবর্ত্তনজনিত নক্ষত্রদিগের উদয়াস্তকালের পরিবর্ত্তন, আকাশ-চিত্রের কোন পরিবর্ত্তনই ঘটাইতে পারে না।

আজকাল বিজ্ঞানের শাখাপ্রশাখা যেমন দ্রুতগতিতে উন্নতিপথে চলিতেছে, জ্যোতিঃশাস্ত্রও সেই প্রকার প্রাচীন হিন্দু ও পারসীয় কীটদষ্ট পুঁথি হইতে বাহির হইয়া দ্রুতপদক্ষেপে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। অধিক দিনের কথা নয়, পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে যে সকল আবিষ্কার বর্ষব্যাপী পর্য্যবেক্ষণেও সুসিদ্ধ হইত না, এখন কেবলমাত্র কয়েক সপ্তাহের যত্নে সেগুলি সুসম্পন্ন হইয়া পড়িতেছে। আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধি দ্বারা যে কোন কালে কোটি কোটি যোজন দূরবর্ত্তী নক্ষত্রগণের দূরত্ব, গুরুত্ব, গঠনোপাদান প্রভৃতি আবিষ্কার করিতে পারিব, অর্দ্ধশতাব্দীর পূর্ব্বেকার জ্যোতিষিগণ তাহা মনেও করিতে পারেন নাই। কিন্তু আজকাল সেই অচিন্তনীয় ব্যাপার প্রকৃতই বাস্তব সত্যে পরিণত হইতেছে। পদার্থবিদ্যা বা রসায়ন প্রভৃতি শাস্ত্রের গবেষণায় যেমন ক্ষুদ্র-বৃহৎ নানা যন্ত্রের প্রয়োজন দেখা যায়, জ্যোতিষিক পর্য্যবেক্ষণে তাহার কিছুরই আবশ্যক হয় না। একটি বৃহৎ দূরবীণ্ এবং ফোটোগ্রাফ্ ও রশ্মিনির্ব্বাচন যন্ত্র (Spectroscope) আধুনিক জ্যোতিষিক পর্য্যবেক্ষণের প্রধান অবলম্বন। পর্য্যবেক্ষক দূরবীণ্ ও ক্যামেরার সাহায্যে আকাশের নানা অংশের ছবি উঠাইয়া, তাহাই পূর্ব্ব জ্যোতিষিগণ-কৃত নক্ষত্রতালিকা ও আকাশচিত্রের সহিত মিলাইয়া থাকেন। এই তুলনায় কোন একটি নক্ষত্রের উজ্জ্বলতা বা অবস্থানের অতি সূক্ষ্ম পরিবর্ত্তন দেখিলেই জ্যোতিষিগণ সর্ব ছাড়িয়া তাহারই কারণ অনুসন্ধানে নিযুক্ত হইয়া পড়েন। এই পর্য্যবেক্ষণ-প্রথায় আজকাল অনেক জ্যোতিষিক তথ্য সংগৃহীত হইতেছে।

অধ্যাপক এণ্ডারসন্ (Anderson)-নামক জনৈক ইংরাজ জ্যোতিষী

ঐ প্রকারে একটি নূতন তারকা পর্য্যন্ত আবিষ্কার করিয়াছেন। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে সেই নক্ষত্রটির একটু পরিচয় দিব।

বিজ্ঞানের নানা শাখা প্রশাখার বৃহৎ বৃহৎ আবিষ্কারগুলির ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে, প্রায়ই এক একটি অসম্ভব ব্যাপারে আবিষ্কারের সূচনা দেখা যায়। নিউটন মহাকর্ষণের নিয়মের পরিচয়, একটি অতি তুচ্ছ ব্যাপারেই পাইয়াছিলেন; ল্যাভোসিয়ার ও এডাম্‌স্‌ একটা অবান্তর পর্য্যবেক্ষণে নেপ্‌চুন্‌ গ্রহের সন্ধান পাইয়াছিলেন। এণ্ডারসনের পূর্ব্বোক্ত নবনক্ষত্রের আবিষ্কার ব্যাপারেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই।

১৯০১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে একদিন আকাশটাকে বেশ পরিচ্ছন্ন দেখিয়া অধ্যাপক এণ্ডারসন্‌ পর্য্যবেক্ষণ-প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারেন নাই। রাত্রি দশটার সময় দূরবীণ্‌ খাটাইয়া আকাশ-চিত্রের সাহায্যে নানা পর্য্যবেক্ষণ আরম্ভ করিয়াছিলেন। কয়েক ঘণ্টা খুব উৎসাহের সহিত পর্য্যবেক্ষণ চলিতেছিল, কিন্তু রাত্রি আড়াইটার সময় এণ্ডারসন অবিরাম পরিশ্রমে এত অবসন্ন ও নিদ্রাতুর হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, দূরবীণে চক্ষু সংলগ্ন রাখা তাঁহার পক্ষে কষ্টকর হইয়া পড়িয়াছিল। কাজেই, তখন পর্য্যবেক্ষণ বন্ধ রাখিয়া বিশ্রাম করা ব্যতীত আর অন্য উপায় ছিল না। হইলও তাই, এণ্ডারসন যন্ত্রাদি বন্ধ করিয়া শয়নগৃহে প্রবেশের আয়োজন করিতে লাগিলেন, কিন্তু গৃহপ্রবেশের পূর্ব্বে পর্য্যবেক্ষিত নক্ষত্রগুলিকে একবার নগ্নচক্ষে দেখিয়া লইবার সুযোগ তিনি ছাড়িতে পারিলেন না। বৃহৎ বৃহৎ নক্ষত্র ও রাশিগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই কোন্‌টি কোন্‌ রাশিস্থ নক্ষত্র জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ অবিলম্বে বলিয়া দিতে পারেন। উত্তর আকাশে পারসিয়স্‌ (Perseus) নামক একটি ক্ষুদ্র রাশি আছে, আল্‌গল্‌ (Algol)-নামক একটি ঘন পরিবর্ত্তনশীল নক্ষত্র এই রাশিভুক্ত থাকায়, জ্যোতিষিগণ সুবিধা পাইলে প্রায়ই এক একবার সেইদিকে দূরবীণ্‌

চালাইয়া থাকেন। এণ্ডারসন্ গৃহপ্রবেশকালীন উত্তরাকাশে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র, উক্ত রাশিতে একটি নূতন নক্ষত্র দেখিতে পাইয়া বিস্মিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। মুহূর্ত্তে নিদ্রা ও অবসাদ কোথায় চলিয়া গেল, এণ্ডারসন্ দূরবীণ্ খাটাইয়া প্রাচীন ও আধুনিক আকাশচিত্রের সহিত পার্‌সিয়স্ রাশির ছবি মিলাইয়া দেখিলেন, সেই রাশির সেই স্থানে এ পর্য্যন্ত কেহ কোন নক্ষত্র দেখিতে পান নাই,—নক্ষত্রটি নূতনই বটে। তখন রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, উষার আলোকে ম্লান তারকাটি ম্লানতর হইয়া ক্রমে নিভিয়া গেল। কাজেই, সে রাত্রিতে তৎসম্বন্ধে আর কোন পর্য্যবেক্ষণ হইল না।

পররাত্রিতে পার্‌সিয়স্ রাশির উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে পর্য্যবেক্ষণ আরম্ভ হইতে পারে, তাহারই আয়োজনে এণ্ডার্‌সনের সমস্ত দিনটাই কাটিয়া গেল। যথাসময়ে দূরবীণ্ খাটাইয়া নক্ষত্রটির পর্য্যবেক্ষণ আরম্ভ করিলে, এণ্ডারসন্ সেটিকে আর পূর্ব্বের ন্যায় দেখিতে পান নাই, পূর্ব্ব-রাত্রি অপেক্ষা সেদিন তারকাটিকে স্পষ্ট উজ্জ্বলতর দেখাইয়াছিল। বলা বাহুল্য, সেই রাত্রেই নবনক্ষত্রের জন্ম-সমাচার দেশ-বিদেশে প্রচারিত হইয়া পড়িল; এবং আকাশের সেই ক্ষুদ্র অংশটি শত শত জ্যোতিষীর দূরবীণের লক্ষ্যস্থল হইয়া দাঁড়াইল।

আবিষ্কারের রাত্রিতে এণ্ডার্‌সন্ নক্ষত্রটিকে তৃতীয় শ্রেণীর ক্ষুদ্র তারকাকারে দেখিয়াছিলেন। দ্বিতীয় দিনে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সেটি প্রথম শ্রেণীর তারকার ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া পড়িয়াছিল। আধুনিক ইংরাজ জ্যোতিষিগণের অগ্রণী সার্ নর্‌মান্ লকিয়ার্ নক্ষত্রটিকে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সুপ্রসিদ্ধ রয়েল্ সোসাইটিতে তাহার যে একটি বিশেষ বিবরণী পাঠ করিয়াছিলেন, তাহা হইতে জানা যায়, নব তারকাটি চতুর্থ দিনে প্রথম দিন অপেক্ষা দশহাজার গুণ অধিক উজ্জ্বল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। অনন্ত

আকাশের এক অংশে কি বিশাল অগ্নিরাশি জলিয়া উঠিয়াছিল, পাঠক অনুমান করুন, এবং একশত ঘণ্টায় যে অগ্নিস্তূপ দশহাজার-গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তাহার প্রসারই বা কত, তাহাও ভাবিয়া দেখুন!

কিন্তু এই নূতন নক্ষত্রটির উজ্জলতা অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। জন্মের পাঁচদিনের মধ্যেই ইহার শৈশব ও যৌবন অতিবাহিত হইয়া গিয়াছিল এবং ষষ্ঠ রজনীতে উহার উজ্জল দেহে বার্দ্ধক্যের সুস্পষ্ট কালিমা স্পর্শ করিয়াছিল। ইহার দু'দিন পরে নক্ষত্রটিকে আর দেখা যায় নাই। জ্যোতিষ্কটির আয়ুষ্কাল যে অল্প, জ্যোতির্ব্বিদগণ প্রথম হইতেই তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং সেই অল্পকালের মধ্যেই তাঁহারা বিভিন্নাবস্থার অনেকগুলি ফোটো ও বর্ণচ্ছত্র (Spectrum) উঠাইয়া রাখিয়াছিলেন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, নক্ষত্রমাত্রেরই স্থান আকাশে প্রায় চিরনির্দ্দিষ্ট থাকে, দুইচারি শত বৎসরের ধারাবাহিক পর্য্যবেক্ষণেও তাহাদের অবস্থানের বিশেষ কোনো পরিবর্ত্তন দেখা যায় না ·· ছাড়া ইহাদের প্রত্যেকটিই লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া আকাশে জলিতেছে এবং এখন যে আরো কতকাল জলিবে, তাহার ইয়ত্তা নাই। পাঠক এখন প্রশ্ন করিতে পারেন, কল্পান্তস্থায়ী অতি প্রবীণ নক্ষত্রগুলির পার্শ্বে কি প্রকারে একটা স্বল্পায়ু নক্ষত্রের জন্ম হইল? এই প্রকার নূতন তারকার আবির্ভাব ও তিরোভাব জ্যোতিষ্করাজ্যের দুর্ল্লভ ঘটনা হইলেও ইহা একেবারে নূতন নয়। গত ১৮৯২ সালে অরিগা (Auriga) রাশির একস্থানে অবিকল ঐ প্রকার একটি নক্ষত্রের আকস্মিক প্রজ্বলন ও নির্ব্বাণ দেখা গিয়াছিল। কয়েক বৎসরের মধ্যে এই প্রকার দুইটি নক্ষত্রের আবির্ভাব দেখিয়া আধুনিক জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ বিষয়টির সুমীমাংসার জন্য সম্প্রতি অনেক গবেষণা ও পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন। অরিগা রাশির নক্ষত্র প্রজ্বলন সময়ে ফোটোগ্রাফ বা বর্ণচ্ছত্রের চিত্র উঠাইবার সুব্যবস্থা ছিল না, কাজেই,

সেই সময়ে তৎসম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করিবার সুযোগ পাওয়া যায় নাই। পার্সিয়স্ নক্ষত্রের নানা অবস্থার ছবি প্রস্তুত থাকায়, জ্যোতিষিগণ গবেষণার্থ খুব সুবিধা পাইয়াছিলেন। কোন একটা নূতন প্রাকৃতিক ব্যাপারের মীমাংসার জন্য বৈজ্ঞানিকগণ স্বাধীন গবেষণা আরম্ভ করিলে অনেক সময়েই গবেষণাফলের ঐক্য দেখা যায় না। এই জ্যোতিষ্কের গবেষণাতেও তাহাই দাঁড়াইয়াছে, এসম্বন্ধে আজকাল অনেকে অনেক কথা বলিতেছেন। যাহাই হউক, আধুনিক জ্যোতিষিগণের নেতা লকিয়ার্ যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, আমরা এখানেই তাহা লিপিবদ্ধ করিব।

পাঠকপাঠিকাগণ বোধ হয় জানেন, মহাশূন্যটা যে কেবল কতকগুলি বৃহৎ বৃহৎ নক্ষত্রপুঞ্জ ও তাহাদের সহচরগুলি দ্বারাই অধ্যুষিত, তাহা নয়। উল্কাপিণ্ডের ন্যায় অনুজ্জ্বল ও অতি ক্ষুদ্রকায় জ্যোতিষ্ক আকাশের অনেক স্থানেই প্রচুর পরিমাণে আছে; তাছাড়া ধূলিকণার ন্যায় একপ্রকার লঘু পদার্থও যে মহাকাশের স্থানে স্থানে কোটি কোটি মাইল অংশ জুড়িয়া রহিয়াছে, তাহারও প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়। এই ধূলিরাশিগুলিকে উজ্জ্বল ও অনুজ্জ্বল উভয় অবস্থাতেই আকাশে দেখিতে পাওয়া যায়। উজ্জ্বল হইলেই এগুলিকে দূরবীণে ও ফোটোগ্রাফ্ চিত্রে নীহারিকার আকারে দেখা গিয়া থাকে। আচার্য্য লকিয়ার্ এই মহাকাশ-ব্যাপ্ত বিশাল ধূলিস্তূপ ও ভ্রাম্যমাণ উল্কারাশির সাহায্যে নূতন তারকার প্রজ্বলন সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্ত খাড়া করিয়াছেন। ইনি বলেন, নিশ্চয়ই বৃহৎ উল্কা বা কোন অনুজ্জ্বল নক্ষত্র ভীম বেগে চলিতে চলিতে, একটি অনুজ্জ্বল নীহারিকাস্তূপে আসিয়া ধাক্কা দিয়াছিল এবং সেই সংঘর্ষণেই লঘু ধূলিকণাগুলি প্রজ্বলিত হইয়া নূতন তারকাটির সৃষ্টি করিয়াছে।

নক্ষত্রটির উৎপত্তিতত্ত্ব বেশ বুঝা গেল, এবং সেই সংঘর্ষণজাত অগ্নি নির্ব্বাপিত হইলেই যে তারকাটি অদৃশ্য হইবে, তাহাও অনুমান করা যাইতে

পারে। কিন্তু জন্মের পর হইতে যে উহাতে উজ্জ্বলতার বৃদ্ধি দেখা গিয়াছিল, তাহার কারণ কি? এই প্রশ্নের উত্তরে লকিয়ার্ সাহেব বলিতেছেন, সম্ভবতঃ কোটি কোটি যোজন বিস্তৃত কোনও অনুজ্জ্বল ধূলিস্তূপের কেবলমাত্র একটি ক্ষুদ্র অংশ উল্কারাশির ধাক্কা পাইয়াছিল। কাজেই, সেই আঘাতপ্রাপ্ত ক্ষুদ্র অংশ প্রথমে জ্বলিয়া উঠায় আমরা নক্ষত্রটিকে প্রথমে ক্ষুদ্রাকার-বিশিষ্ট দেখিয়াছিলাম। তারপর সেই অত্যুজ্জ্বল আলোক কালক্রমে পার্শ্বস্থ বহুদূরব্যাপী অনুজ্জ্বল ধূলিকণাগুলিকে আলোকিত করিয়া তুলিতে আরম্ভ করিলে, আমরাও নক্ষত্রটিকে ক্রমে পুষ্টাবয়বসম্পন্ন হইতে দেখিয়াছি।

লকিয়ার্ সাহেবের এই উক্তি কেবল অনুমানমূলক নয়। কোনও দুইটি গতিশীল পদার্থের সংঘর্ষণেই যে জ্যোতিষ্কটির উৎপত্তি হইয়াছে, ইহার বর্ণচ্ছত্রের রেখার বিচলন পরীক্ষা করিয়া তাহা স্পষ্ট দেখা গিয়াছে।

রশ্মিনির্ব্বাচন যন্ত্র সাহায্যে প্রাপ্ত বর্ণচ্ছত্র ও ফোটোগ্রাফের ছবি দ্বারা আজকাল যে সকল অদ্ভুত জ্যোতিষিক আবিষ্কার সুসম্পন্ন হইতেছে, তাহা দেখিয়া সমগ্র জগৎ স্তম্ভিত হইয়া পড়িয়াছে। প্রকৃতই, এই দুইটি ক্ষুদ্র যন্ত্র জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানে এক নবযুগের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। কেবল বর্ণচ্ছত্র পরীক্ষা করিয়া, পার্সিয়স্ রাশির নূতন নক্ষত্রটিতে কি কি মৌলিক পদার্থ ছিল, স্থিরীকৃত হইয়াছে। ইহা অপেক্ষা আর বিস্ময়কর কি হইতে পারে!

পৃথিবী হইতে নব জ্যোতিষ্কটি কতদূরে অবস্থিত, স্থির করিবার জন্যও অনেক গণনাদি হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এটির দূরত্ব অত্যন্ত অধিক বলিয়া পর্য্যবেক্ষণে বিচলন-কোণ (Parallax) ধরা পড়ে নাই এবং কোণ পরিমাপের উপযোগী প্রচুর সময়ও ছিল না। কাজেই, জ্যোতিষিগণ ইহার দূরত্বের সূক্ষ্ম হিসাব করিতে পারেন নাই। তথাপি লকিয়ার্

সাহেব নক্ষত্রটির দূরত্বের একটু আভাস দিতে ছাড়েন নাই। ইনি বলিতেছেন, আজ যে নক্ষত্রটির আকস্মিক প্রজ্বলন জ্যোতির্ব্বিদ্‌মণ্ডলীকে বিস্মিত করিয়া তুলিয়াছে, তাহা কোন ক্রমেই অল্পকার ঘটনা নয়। অগ্নিকাণ্ডটি নিশ্চয়ই অন্যূন পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল এবং তাহারই সংবাদ অতিদূরবর্ত্তী পৃথিবীতে পৌঁছিতে এতটা সময় লাগিয়াছে।

আলোক প্রতি সেকেণ্ডে একলক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল বেগে চলিয়া থাকে। যে আলোক ঐ প্রকার ভীমবেগে ছুটিয়া পৃথিবীতে আসিতে পথিমধ্যেই পঁচিশ বৎসর অতিবাহিত করে, তাহার উৎপত্তিস্থান কতদূরে, পাঠক অনুমান করুন।

যে নক্ষত্রটির আবিষ্কারের ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইল, তাহাই একমাত্র নূতন নক্ষত্র নয়। এপর্য্যন্ত প্রায় ৩৬টি নূতন নক্ষত্রের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। খৃষ্টপূর্ব্ব ১৩৪ সালে সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত হিপার্কস্ (Hipparchus) সর্ব্বপ্রথম এই শ্রেণীর নক্ষত্র আবিষ্কার করেন। গত ১৯১০ সালে তিন মাসের মধ্যে আকাশের নানা অংশে চারিটি নূতন নক্ষত্রের প্রজ্বলন দেখা গিয়াছে।

উল্কাপিণ্ড

মেঘহীন পরিষ্কার রাত্রিতে অল্পক্ষণের জন্য আকাশের দিকে চাহিয়া থাকিলে আমরা প্রায়ই দুই একটি উল্কাপাত দেখিতে পাই। আকাশের সমস্ত নক্ষত্রের আমরা হিসাব রাখি না, তাই মনে হয়, অগণ্য তারকার মধ্য হইতেই বুঝি তাহারা ছুটিয়া আসিতেছে।

বলা বাহুল্য, উল্কাপাত নক্ষত্রপাত নয়। প্রত্যেক নক্ষত্রই এক একটি সূর্য্যের ন্যায় বৃহৎ জ্যোতিষ্ক। কতকগুলি আবার সূর্য্য অপেক্ষাও শত শত গুণ বৃহৎ। আমাদের ক্ষুদ্র পৃথিবী হইতে কোটি কোটি মাইল দূরে থাকিয়া ইহাদের প্রত্যেকেই এক একটি গ্রহ-উপগ্রহময় জগৎ রচনা করিয়া অবস্থান করিতেছে। কাজেই, নক্ষত্রের ন্যায় বৃহৎ এবং অতি দূরবর্ত্তী জ্যোতিষ্কগুলিকে টানিয়া আনা আমাদের ক্ষুদ্র পৃথিবী বা সূর্য্যের সাধ্যাতীত।

জ্যোতিঃশাস্ত্রের মতে উল্কাপিণ্ডগুলি অতি ক্ষুদ্র জ্যোতিষ্ক ব্যতীত আর কিছুই নয়। ইহারা আমাদের পৃথিবীর মতই এক এক নির্দ্দিষ্ট-পথে দলে দলে সূর্য্যের চারদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়, কিন্তু আকারে অত্যন্ত ক্ষুদ্র বলিয়া বৃহৎ দূরবীণেও ইহাদের সন্ধান পাওয়া যায় না। পৃথিবী নিজের নির্দ্দিষ্ট কক্ষে ঘুরিতে ঘুরিতে যখন ঐ সকল উল্কাপিণ্ডের ভ্রমণপথের নিকটবর্ত্তী হয়, তখন পৃথিবীর আকর্ষণে কতকগুলি পিণ্ড ভূপৃষ্ঠে পড়িতে আরম্ভ করে।

পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ সর্ব্বদাই প্রায় পঞ্চাশ মাইল গভীর বায়ুর আবরণে মণ্ডিত রহিয়াছে। কাজেই, পৃথিবীর দিকে আসিতে হইলে উল্কাপিণ্ড

গুলিকে সেই গভীর বায়বীয় আবরণ ভেদ করিয়া আসিতে হয়। বায়ু অত্যন্ত লঘু বাষ্প হইলেও, ইহার ভিতর দিয়া কোন বস্তু দ্রুতবেগে চলিতে আরম্ভ করিলে ঘর্ষণে গরম হইয়া পড়ে। কামান বা বন্দুকের মুখ হইতে যখন গোলাগুলি ছুটিয়া বাহির হয়, তখন প্রথম সেগুলি শীতলই থাকে। তার পর বায়ুর ভিতর দিয়া চলিবার সময় তাহারা বায়ুর সংঘর্ষণে উত্তপ্ত এবং শেষে প্রজ্বলিত হইয়া পড়ে। উল্কাপিণ্ড-সকল বায়ুমণ্ডলের ভিতর দিয়া নামিবার সময় ঠিক পূর্ব্বোক্ত কারণে প্রজ্বলিত হইয়া পড়িতে আরম্ভ করে। এই প্রজ্বলিত অবস্থাতেই উহারা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। যেগুলি আয়তনে অতি ক্ষুদ্র, পৃথিবীর দিকে অগ্রসর হইবার সময় পথিমধ্যেই তাহারা নিঃশেষে ভস্মীভূত হইয়া যায়। কেবল বৃহৎগুলিই পুড়িতে পুড়িতে ভূপৃষ্ঠে আসিয়া পড়ে। উল্কাপিণ্ডের এই প্রকার দগ্ধাবশেষ পৃথিবীর নানাস্থানে পাওয়া গিয়াছে। অদ্যাপি প্রতি বৎসর গড়ে প্রায় পাঁচটি করিয়া উল্কাপিণ্ড পৃথিবীর নানা অংশ হইতে সংগৃহীত হইতেছে। কলিকাতার কলা-ভবনেই (Museum) অনেকগুলি উল্কাপিণ্ডের দগ্ধাবশেষ সংগৃহীত আছে।

প্রতিদিন আমাদের বায়ুমণ্ডলে কতগুলি উল্কাপিণ্ড প্রবেশ করে, অধ্যাপক নিউটন সাহেব তাহার গণনা আরম্ভ করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, এ প্রকার গণনা কখনই নির্ভুল বা সূক্ষ্ম হয় না। যাহা হউক, নিউটন্ সাহেবের হিসাবে দিবারাত্রিতে গড়ে প্রায় দুই কোটি উল্কাপিণ্ড আমাদের বায়ুমণ্ডলে আসিয়া ভস্মীভূত হইয়া যায় বলিয়া স্থির হইয়াছিল। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই সকল উল্কাপিণ্ডের মধ্যে বৎসরে কেবল চারি পাঁচটি পুড়িতে পুড়িতে ভূপৃষ্ঠে আসিয়া পড়ে, এবং অবশিষ্ট সকলই নীচে নামিবার সময়ই নিঃশেষে পুড়িয়া যায়। পুড়িয়া গেলেও ইহাদের ভস্ম চিরকাল আকাশে ভাসমান থাকিতে পারে না, উল্কাদাহে যাহা কিছু উৎপন্ন হয়,

সকলই ধীরে ভূপৃষ্ঠে আসিয়া পড়ে। মেরুপ্রদেশ এবং সমুদ্রতল হইতে উল্কাভস্ম সংগ্রহ করিয়া বৈজ্ঞানিকগণ অনেক পরীক্ষা করিয়াছেন। হিসাব করিলে প্রতি বৎসর ভূপৃষ্ঠে তিনহাজার মণ উল্কাভস্মের সন্ধান পাওয়া যায়।

উল্কাপিণ্ড সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যে কয়েকটি কথা লেখা হইল, গত শতাব্দীর মধ্যভাগের জ্যোতিষিগণ তাহার অধিক আর বিশেষ কিছু জানিতেন না। পরবর্ত্তী জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণই উল্কাপিণ্ডের গতিবিধি লইয়া দীর্ঘকাল গবেষণা করিয়াছিলেন, এবং সেই সকল গবেষণার ফলেই ইহার স্থূলতত্ত্বগুলি ক্রমে প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে।

যাঁহারা আধুনিক জ্যোতিঃশাস্ত্রের একটু খবর রাখেন, তাঁহাদিগের নিকট সুপ্রসিদ্ধ বায়েলার (Biela's comet) ধূমকেতুর পরিচয় প্রদান করা নিষ্প্রয়োজন। গত ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রিয়াবাসী জ্যোতিষী বায়েলা সাহেব এই ধূমকেতুটির আবিষ্কার করেন। গণনায় তাহার সূর্য্য-প্রদক্ষিণ-কাল সাড়ে ছয় বৎসর বলিয়া স্থির হইয়াছিল এবং হিসাব মত ১৮৩২ এবং ১৮৩৯ সালে ধূমকেতুটি যথাসময় দেখা দিয়াছিল। কিন্তু ১৮৪৫ সালে তাহাকে আর পূর্ব্বের আকারে দেখা যায় নাই; কোনও অজ্ঞাত কারণে * দ্বিধা-বিভক্ত হইয়া সেটি যুগল ধূমকেতুর আকারে আকাশে উদিত হইয়াছিল। জ্যোতিষ্কটির এই অদ্ভুত পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া পরবর্ত্তী উদয়কালে তাহার অবস্থা কি প্রকার দাঁড়ায়, দেখিবার জন্য জ্যোতিষিগণ উদ্‌গ্রীব হইয়াছিলেন। ১৮৪৫ সালে উভয় ধূমকেতুরই

* বায়েলার ধূমকেতুর ধ্বংস হওয়ার অনেকগুলি কারণ সাধারণ জ্যোতিষিক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ দেখা যায়। অনেক জ্যোতিষীই বৃহস্পতির আকর্ষণকেই প্রধান কারণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ইহাই প্রকৃত কারণ কি না, তাহা এখনো বিচার্য্য বলিয়া মনে হয়।

উদয় হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাদের পরস্পরের দূরত্ব লক্ষাধিক মাইল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, এবং শেষে ১৮৫৭ সালে তাহাদের প্রত্যাবর্ত্তনের সময় উপস্থিত হইলে, বৃহৎ দূরবীণে তাহাদের একটিরও সাক্ষাৎ পাওয়া যায় নাই। বায়েলার ধূমকেতুর প্রদক্ষিণ পথ এখনো নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। ১৮৫৭ সালের পর প্রতিবৎসর সেপ্টেম্বর মাসে আমাদের পৃথিবী যখন ঐ পথ ভেদ করিয়া অগ্রসর হয়, তখন লক্ষ লক্ষ উল্কাপিণ্ড বৃষ্টির ধারার ন্যায় পৃথিবীর দিকে পড়িতে আরম্ভ করে।

বায়েলার ধূমকেতুর ধ্বংসের পর ঐ নির্দ্দিষ্ট সময়ে উল্কাপাতের সংখ্যা বাড়িতে দেখিয়া উল্কাপিণ্ডের সহিত ধূমকেতুর কোন বিশেষ সম্বন্ধ আছে বলিয়া অনেকেরই মনে হইয়াছিল। সেই সময়ের প্রধান জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ বিচার আরম্ভ করিয়াছিলেন, এবং শেষে স্থির হইয়াছিল, বায়েলার ধূমকেতুই চূর্ণিত হইয়া ক্ষুদ্র উল্কাপিণ্ডে পরিণত হইয়াছে, এবং অদ্যাপি সেগুলি ঐ ধূমকেতুরই পথে পরিব্যাপ্ত থাকিয়া সূর্য্য প্রদক্ষিণ করিতেছে। কাজেই, সেই পথের নিকটবর্ত্তী হইয়া পৃথিবী তাহাদের মধ্যে কতকগুলিকে টানিয়া নিজের আকাশের ভিতর আনিতে পারিতেছে।

বৎসরের সকল দিনে উল্কাবর্ষণ সমান হয় না। প্রতি বৎসরই এপ্রিল, আগষ্ট এবং নবেম্বর মাসের কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট দিনে উল্কাপাতের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক হইতে দেখা যায়। বায়েলার ধূমকেতুর সহিত উল্কাপাতের পূর্ব্বোক্ত সম্বন্ধ আবিষ্কৃত হইলে, এপ্রিল, আগষ্ট এবং নবেম্বরের বর্ষণের সহিতও কোন কোন ধূমকেতুর সম্বন্ধ আছে বলিয়া জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের মনে হইয়াছিল। অনুসন্ধানে দেখা গিয়াছিল, পৃথিবী সূর্য্য-প্রদক্ষিণ করিতে করিতে ঐ তিন সময়ে তিনটি নির্দ্দিষ্ট ধূমকেতুর ভ্রমণপথ ভেদ করিয়া চলিয়া আসে। কাজেই, ঐ সাময়িক উল্কাবর্ষণগুলি

যে, ধূমকেতুর অঙ্গচ্যুত খণ্ডজ্যোতিষ্ক দ্বারা উৎপন্ন হয়, তাহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছিলেন।

সাময়িক উল্কাবর্ষণের পূর্ব্বোক্ত কারণটি আজও সত্য বলিয়া গৃহীত হইয়া আসিতেছে। বরং আকাশ-পর্য্যবেক্ষণের উপযোগী নানা উৎকৃষ্ট যন্ত্র নির্ম্মিত হওয়ায় উল্লিখিত ব্যাখ্যানটির সম্বন্ধে যে সকল ক্ষুদ্র সন্দেহ ছিল, তাহা এখন একে একে দূর হইয়া গিয়াছে। কিন্তু নির্দ্দিষ্ট উল্কাবর্ষণ ছাড়া মাঝে মাঝে আকাশে যে দুই একটি বৃহৎ উল্কাপিণ্ড (Meteorite) আবির্ভাব হয়, তাহাদের উৎপত্তি-রহস্য আজও ভাল করিয়া জানা যায় নাই। সাময়িক বর্ষণের উল্কাপিণ্ডগুলি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ভিতর দিয়া নামিবার সময় নিঃশেষে পুড়িয়া ভস্ম হইয়া পড়ে, কিন্তু শেষোক্ত পিণ্ডগুলি আকারে অত্যন্ত বৃহৎ বলিয়া, একেবারে পুড়িয়া যায় না। উহাদের কিয়দংশ প্রায়ই ভূতলে আসিয়া পতিত হয়। এই সকল দগ্ধাবশেষ লইয়া বৈজ্ঞানিকগণ অনেক পরীক্ষা করিয়াছেন। পরীক্ষার ফলে কতকগুলিতে কেবল লৌহ ও নিকেল এবং অপরগুলিতে কেবল প্রস্তরের অস্তিত্ব দেখা গিয়াছে। আমাদের পৃথিবী যে সকল উপাদানে গঠিত, উল্কাদেহে তাহারি সন্ধান পাইয়া, এককালে এই বৃহৎ পিণ্ডগুলি যে পৃথিবীরই অঙ্গীভূত ছিল, আজকাল জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ তাহাই অনুমান করিতেছেন।

কিপ্রকারে পূর্ব্বোক্ত শিলা ও ধাতুপিণ্ডগুলি পৃথিবীর দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, আধুনিক পণ্ডিতগণ তাহারও আভাস দিতে ছাড়েন নাই। একদল বৈজ্ঞানিক বলিতেছেন, সম্ভবতঃ অতি প্রাচীন কালে পৃথিবীর উপরে অসংখ্য বৃহৎ আগ্নেয় পর্ব্বত ছিল। এইগুলি যখন ভীমবেগে অনল উদ্গিরণ করিত, তখন নানা বাষ্পীয় পদার্থের সহিত বৃহৎ বৃহৎ শিলা ও ধাতুখণ্ড আকাশে উৎক্ষিপ্ত হইত। কোন

বস্তুকে সবলে আকাশের দিকে ছুড়িয়া ফেলিলে সেটি যদি পৃথিবীর আকর্ষণের সীমা অতিক্রম করিয়া ধাবিত হয়, তবে তাহার ভূপৃষ্ঠে ফিরিয়া আসিবার আর সম্ভাবনা থাকে না। এই অবস্থায় তাহাকে ক্ষুদ্র জ্যোতিষ্কের ন্যায়ই আকাশে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ বলিতেছেন, প্রাচীন যুগের সেই বৃহৎ আগ্নেয়গিরিগুলি হইতে যে সকল শিলা উৎক্ষিপ্ত হইত, তাহাদের মধ্যে অন্ততঃ কতকগুলি নিশ্চয় আকর্ষণের সীমা অতিক্রম করিয়া যাইত। কাজেই, তাহারা আর পৃথিবীতে না ফিরিয়া এক একটি নির্দ্দিষ্ট পথে পরিভ্রমণ সুরু করিয়া দিত। পৃথিবী হইতে উৎক্ষিপ্ত এই শিলাগুলিকেই পূর্ব্বোক্ত পণ্ডিতগণ বৃহৎ উল্কাপিণ্ড বলিতে চাহিতেছেন।

চন্দ্রমণ্ডল যে এককালে সহস্র সহস্র ছোট-বড় আগ্নেয় পর্ব্বতে আচ্ছাদিত ছিল, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। ছোটখাটো দূরবীণ্‌ দিয়া দেখিলেও চন্দ্রমণ্ডলে এখনো নির্ব্বাপিত আগ্নেয়গিরিগুলির বিবর সুস্পষ্ট ধরা পড়ে। ইহা দেখিয়া আর একদল জ্যোতিষী বলিতেছেন, কেবল পৃথিবীরই আগ্নেয়গিরি উল্কাপিণ্ডের উৎপত্তি করে নাই। চন্দ্রের অসংখ্য পর্ব্বতশিখর হইতে যখন অগ্ন্যুদ্গম হইত, তখনও লক্ষ লক্ষ প্রস্তরখণ্ড ঊর্দ্ধে উঠিয়া চন্দ্রের আকর্ষণের সীমা অতিক্রম করিত। সেগুলিও এখন বৃহৎ উল্কাপিণ্ডের আকারে নিশ্চয়ই পৃথিবীর আকর্ষণের সীমার মধ্যে আসিয়া জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ডের আকারে ভূপতিত হইতেছে।

বৃহৎ উল্কাপিণ্ডের উৎপত্তি সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি আধুনিক জ্যোতিষিক গ্রন্থে স্থান পাইলেও, সেগুলিকে অবিসম্বাদে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা চলিতেছে না। সম্প্রতি হার্‌ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী পিকারিং সাহেব, প্রচলিত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য

প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন, আকর্ষণের সীমা অতিক্রম করিয়া যাইতে হইলে পৃথিবী এবং চন্দ্রের আগ্নেয়গিরির উৎক্ষেপণ-বেগ প্রতি সেকেণ্ডে অন্ততঃ সাত মাইল এবং দুই মাইল হওয়া আবশ্যক। কিন্তু এই প্রকার ভীমবেগসম্পন্ন আগ্নেয়গিরির অস্তিত্বের কোন চিহ্নই ভূপৃষ্ঠে বা চন্দ্রমণ্ডলে দেখা যায় না। কাজেই, প্রচলিত সিদ্ধান্তে কখনই পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা চলে না।

ভুবনবিখ্যাত পণ্ডিত ডারউইনের বংশধর জর্জ্জ ডারুইন সাহেব (Sir G. H. Darwin) গাণিতিক প্রমাণ প্রয়োগে চন্দ্রের যে উৎপত্তি-তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাতে বিশ্বাস করিলে বলিতে হয়, চন্দ্র এককালে পৃথিবীরই কুক্ষিগত ছিল। তারপর পৃথিবী হইতে ছিন্ন হইয়া জোয়ার-ভাটার (Tides) প্রভাবে সেটি ধীরে ধীরে পিছাইয়া গিয়া, এখন প্রায় আড়াই লক্ষ মাইল দূরে পড়িয়াছে। পিকারিং সাহেব ডারউইনের পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তটিকে মানিয়া লইয়া উল্কাপিণ্ডের উৎপত্তির এক নূতন কারণ দেখাইয়াছেন। ইনি বলিতেছেন, যেদিন হঠাৎ পৃথিবীর কতক অংশ ছিন্ন হইয়া চন্দ্রের উৎপত্তি করিয়াছিল, সেদিন পৃথিবীর উপরকার চাপও হঠাৎ কমিয়া গিয়া ভূপৃষ্ঠের রুদ্ধ বায়ু বা অপর বায়বীয় পদার্থগুলিকে অকস্মাৎ মুক্তি দিয়াছিল। কাজেই, ইহাতে ভূপৃষ্ঠ আর পূর্ব্বের ন্যায় অচঞ্চল থাকিতে পারে নাই। নূতন শক্তিতে পৃথিবীর উপরকার কঠিন স্তরগুলি ছিন্ন হইয়া উপরে উঠিতে আরম্ভ করিয়াছিল। পিকারিং সাহেব বলিতেছেন, সেই চাপনির্ম্মুক্ত অবস্থায় পৃথিবীর যে কঠিন অংশ অতি উর্দ্ধে উঠিয়াছিল, তাহাই এখন উল্কাপিণ্ড হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ভূপৃষ্ঠ হইতে উৎক্ষিপ্ত হইবার পর কি প্রকার পথ অবলম্বন করিয়া সেই শিলাখণ্ডগুলি ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিল, পিকারিং সাহেব গণিতের সাহায্যে তাহাও দেখাইয়াছেন। এই সকল গাণিতিক হিসাব দেখিলে,

এবং তাহার সহিত উল্কাপিণ্ডগুলির আধুনিক অবস্থা মিলাইয়া লইলে পিকারিংয়ের নূতন সিদ্ধান্তটিকে সত্য বলিয়া মনে হয়।

যাহা হউক, সাময়িক উল্কাবর্ষণের পিণ্ডগুলি যে ধূমকেতুরই দেহচ্যুত ক্ষুদ্র অংশ, তাহাতে আর এখন সন্দেহ করা যায় না; এবং বৃহৎ পিণ্ডগুলির গঠনোপাদান নির্ণয় করিয়া পরীক্ষা করিলে, সেগুলি যে এককালে পৃথিবীরই অঙ্গীভূত ছিল না, তাহাও কোনক্রমে বলা চলে না। আমরা এপর্য্যন্ত ভূস্তরে যতগুলি মূল পদার্থের সন্ধান পাইয়াছি, উল্কাপিণ্ডে তাহার মধ্যে প্রায় ২৯টির অস্তিত্ব ধরা পড়িয়াছে। অদ্যাপি কোন অপার্থিব বস্তুই উহাতে পাওয়া যায় নাই। সুতরাং বৃহৎ উল্কাপিণ্ডগুলিকে পৃথিবীরই সামগ্রী ব্যতীত অপর কিছুই বলা চলিতেছে না। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে, কি চন্দ্রের জন্মকালে, এগুলি পৃথিবীচ্যুত হইয়াছিল—তাহাই এখন বিচার্য্য।

হ্যালির ধূমকেতু

গত বৎসর শীতের শেষে হ্যালির ধূমকেতু একবার সূর্য্য-প্রদক্ষিণ করিয়া পৃথিবীকে দেখা দিয়া গিয়াছে। নানা দেশের জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ এই সুযোগে জ্যোতিষ্কটিকে ভাল করিয়া দেখিয়া লুইয়াছেন। এই ধূমকেতুটি বহুকাল সৌরপরিবারভুক্ত হইয়া পড়িয়াছে, কাজেই, ইহাকে অপর গ্রহের ন্যায় সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। প্রসিদ্ধ ইংরাজ জ্যোতির্ব্বেত্তা হালি সাহেব ইহার আবিষ্কারক, এই জন্যই হালি সাহেবের নামানুসারে ধূমকেতুটির নামকরণ হইয়াছিল। সাধারণ ধূমকেতুর তুলনায় এটির আকার অনেক বড় এবং অন্ততঃ দুইমাস ধরিয়া ইহাকে দেখা গিয়া থাকে। কিন্তু কেবল এই সকল কারণেই হ্যালির ধূমকেতু প্রসিদ্ধ নয়। ইহাকে আবিষ্কার করিয়া হ্যালিসাহেব ধূমকেতুমাত্রেরই গতিবিধি সম্বন্ধে যে সকল নূতন তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহাই জ্যোতিষ্কটিকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। হ্যালির ধূমকেতুর আবিষ্কারের পর সত্যই জ্যোতিঃশাস্ত্রে এক নূতন অধ্যায় যোজিত হইয়াছে। আমাদের পৃথিবী যেমন এক বৎসরে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে, এই ধূমকেতুটি সেই প্রকার প্রায় ৭৬ বৎসরে সূর্য্যকে ঘুরিয়া আইসে। গত ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে ইহার শেষ সাক্ষাৎ পাওয়া গিয়াছিল। কাজেই, ১৯১০ সালে ইহার পুনরাগমন একপ্রকার নিশ্চিত ছিল।

হ্যালির বৃহৎ ধূমকেতুটির বিশেষ বিবরণ আলোচনা করিবার পূর্ব্বে, ধূমকেতু জিনিসটা কি, তাহা জানা আবশ্যক।

জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ বলেন, বৃহস্পতি, শনি, মঙ্গল প্রভৃতি যে সকল

ছোট-বড় গ্রহ লইয়া সৌরজগৎ গঠিত হইয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকটিই সূর্য্যের আত্মজ। যখন এক বিশাল নীহারিকারাশি হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া, সূর্য্য নিজেকে গড়িয়া তুলিতেছিল, তখন নিজের দেহেরই এক একটি ক্ষুদ্র অংশ দিয়া গ্রহগুলিকেও সৃষ্টি করিয়াছিল। সুতরাং দেখা যাইতেছে, সৌরপরিবারস্থ জ্যোতিষ্কগণ সূর্য্যের চিরসহচর। সূর্য্য নিশ্চল এবং ক্ষুদ্র-বৃহৎ গ্রহ-উপগ্রহগুলি তাহার চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে বলিয়া একটা কথা আছে।• কিন্তু সত্যই সূর্য্য নিশ্চল নয়। যাত্রী-বোঝাই গাড়ী যখন ছুটিতে আরম্ভ করে, তখন উপবিষ্ট আরোহিগণ যেমন বলেন, যানের ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে তাঁহারা নিশ্চল হইয়া বসিয়া আছেন, সূর্য্যের নিশ্চলতা কতকটা সেই প্রকারের। পথের পার্শ্বস্থ গাছপালা মাঠ-ঘাটের তুলনায় গাড়ী বা আরোহী কেহই নিশ্চল নয়। সূর্য্যও অনন্ত আকাশের দূরবর্ত্তী নক্ষত্রগণের তুলনায় নিশ্চল নয়। তাহার ছোট-বড় গ্রহ-উপগ্রহগুলিকে চারিদিকে রাখিয়া, সে এক নির্দ্দিষ্ট দিক্ লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে।

পৃথিবীর উপরকার পথ-ঘাটের তুলনায় ব্যোমপথ কতকটা নিষ্কণ্টক হইলেও, ব্যোমবিচরণ ব্যাপারটা একেবারে নিরাপদ নয়। অনন্ত আকাশের সর্ব্বাংশ কেবল দূরবিচ্ছিন্ন নক্ষত্রেরই আবাসস্থান নয়। ইহার অনেক স্থানেই ক্ষুদ্র-বৃহৎ নীহারিকারাশি এবং উল্কাপুঞ্জ (Meteoric clouds) ভাসিয়া বেড়াইতেছে। সুতরাং সূর্য্য তাহার গ্রহগুলিকে পক্ষপুটে রাখিয়া যখন ভীমগতিতে ছুটিয়া চলে, তখন ঐ প্রকার জ্যোতিষ্কগুলির সহিত তাহার ছোটখাটো সংঘর্ষণ হওয়া বিচিত্র নয়। বলা বাহুল্য, ইহাতে সৌরজগতের অণুমাত্র ক্ষতি হয় না। যাহারা গতিরোধ করিতে দাঁড়ায়, তাহাদিগকেই নানা প্রকারে লাঞ্ছিত হইতে হয়। অনেক সময়েই ইহারা সূর্য্য এবং তাহার গ্রহগুলির আকর্ষণ এড়াইতে পারে না, কাজেই, অন্ততঃ কিছুকালের জন্য তাহাদিগকে সৌরজগতে আতিথ্য গ্রহণ

করিতে হয়। এই শ্রেণীর আগন্তুক জ্যোতিষ্কই ধূমকেতুর আকার পরিগ্রহ করিয়া মাঝে মাঝে আমাদিগকে দেখা দেয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, গ্রহগুলির সহিত সূর্য্যের যেমন শোণিত-সম্পর্ক বর্ত্তমান, ধূমকেতুগুলির সহিত মোটেই তাহা নাই। ইহারা সৌরজগতের আগন্তুকমাত্র। অনেকেই কেবল কয়েকদিনের জন্য কোন অজ্ঞাত রাজ্য হইতে ছুটিয়া আসিয়া সূর্য্যের আতিথ্য গ্রহণ করে, এবং সেই অল্পকালে একবার মাত্র গ্রহপতিকে প্রদক্ষিণ করিয়া, চিরদিনের জন্য সৌরজগতের নিকট বিদায় গ্রহণ করে।

অতিথিবেশে প্রবেশ করিয়া শেষে গৃহস্বামীর অনুগ্রহে পরিবারভুক্ত হইয়া পড়া, আমাদের ক্ষুদ্র গার্হস্থ্যজীবনের খুব সুলভ ঘটনা নয়। কিন্তু সূর্য্যের বৃহৎ পরিবারে এই ঘটনা প্রায়ই দেখা যায়। অতিথি ধূমকেতুগুলির যখন যাত্রাকাল উপস্থিত হয়, সূর্য্য বাছিয়া বাছিয়া তাহাদের কতকগুলিকে নিজের পরিবারভুক্ত করিয়া লয়। বৃহস্পতি, শনি প্রভৃতি বৃহৎ গ্রহগুলিও এই ধরাপাকড়া-ব্যাপারে কম দক্ষ নয়। সূর্য্যের নিকট হইতে কোন গতিকে বিদায় গ্রহণ করার পর যদি ঐ সকল গ্রহের সহিত সাক্ষাৎ হয়, তবে আগন্তুকদিগের প্রায়ই পলায়নের উপায় থাকে না। অনেক সময়েই শনি, বৃহস্পতি প্রভৃতির আকর্ষণে উহাদিগকে সৌরপরিবারভুক্ত হইয়া পড়িতে হয়, এবং অপর গ্রহের ন্যায় চিরজীবন সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়াই কাটাইতে হয়। সৌরজগতের সৃষ্টির পর এই প্রকার যে কত ধূমকেতুর আগমন-নিষ্ক্রমণ হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা হয় না; এবং যাহারা ঘটনাক্রমে সূর্য্যের পরিবারভুক্ত হইয়া পড়িয়াছে, তাহাদের সংখ্যাও বড় কম নয়।

সৌরজগতে আবদ্ধ ধূমকেতুগুলির ভ্রমণপথ (Orbit) ইত্যাদি আধুনিক জ্যোতিষিগণ সূক্ষ্মভাবে গণনা করিয়াছেন। তাছাড়া কোন্ ধূমকেতু কোন্ গ্রহের আকর্ষণে সৌরপরিবারে চির-আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছে, তাহাও সুস্পষ্ট জানা গিয়াছে। গ্রহগুলির মধ্যে বৃহস্পতি

সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, আয়তনে আমাদের পৃথিবী অপেক্ষা প্রায় ১৩০০ গুণ বড়। সুতরাং এই প্রকার একটা বড় গ্রহের নিকটবর্ত্তী হইলে, ধূমকেতুর ন্যায় ক্ষুদ্র জ্যোতিষ্কের পরিত্রাণের অতি অল্পই সম্ভাবনা থাকে। জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন, একা বৃহস্পতিই ঐ প্রকারে প্রায় ষোলটি ধূমকেতুকে সৌরজগতে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। এইগুলির প্রত্যেকটিরই ভ্রমণপথ বৃহস্পতির ভ্রমণপথের নিকটবর্ত্তী প্রদেশে আসিয়া শেষ হইয়াছে, এবং সূর্য্যপ্রদক্ষিণ করিতে ইহাদের মধ্যে কেহই আট বৎসরের অধিক সময় গ্রহণ করে না। নেপ্‌চুন, ইউরেনস্ এবং শনি, বৃহস্পতি অপেক্ষা আয়তনে ক্ষুদ্র হইলেও প্রত্যেকে কতকগুলি ধূমকেতু বাঁধিয়া রাখিয়াছে। শনির অনুগত ধূমকেতুর সংখ্যা দুইটিমাত্র। কিন্তু নেপ্‌চুন ও ইউরেনস্ যথাক্রমে ছয়টি এবং তিনটি ধূমকেতুকে বন্দী করিয়াছে। আমাদের আলোচ্য ধূমকেতুটি নেপচুনের বন্দীদিগের মধ্যে একটি।

ধূমকেতুর নাম শুনিলেই বৃহৎপুচ্ছবিশিষ্ট এক প্রকাণ্ড জ্যোতিষ্কের কথা আমাদের মনে পড়িয়া যায়। কিন্তু ইহাই ধূমকেতুর নির্দ্দিষ্ট আকার নয়। সূর্য্য হইতে যখন অতি দূরবর্ত্তী স্থানে থাকে, তখন দূরবীণ বা ফোটোগ্রাফের চিত্রে তাহাদিগকে অতি ক্ষুদ্র গ্রহের ন্যায়ই দেখায়। তার পর উহারা যত সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হইতে আরম্ভ করে, ততই উহাদের আকার ও উজ্জ্বলতা বাড়িয়া যায়। মুণ্ড, পুচ্ছ ইত্যাদি যে সকল বিশেষ চিহ্ন দেখিয়া, আমরা এই জ্যোতিষ্কগুলিকে ধূমকেতু বলিয়া চিনিয়া লই, তাহা সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হইলেই উহাদের দেহ হইতে স্বতঃই বাহির হয়।

পূর্ব্বোক্ত বিচিত্র আকার পরিগ্রহের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে জ্যোতিষিগণ বলেন, ধূমকেতুমাত্রেরই দেহ বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র উল্কাপিণ্ড দ্বারা গঠিত। পিণ্ডগুলির আয়তন ইত্যাদি সম্বন্ধে বিশেষ পরিচয় জানিবার উপায় নাই। তবে সেগুলি যে আয়তনে খুবই ছোট, এবং ধূমকেতুর দেহে অবস্থানকালে

তাহারা যে খুব নিবিড়ভাবে থাকে না, তাহার প্রমাণ আছে। আকাশে বৃহৎ পুচ্ছ বিস্তার করিয়া যখন কোন ধূমকেতু উদিত হয়, তখন সেই পুচ্ছদ্বারা আকাশের নক্ষত্রগুলি আচ্ছাদিত হয় না। কাজেই, দুরবিচ্ছিন্ন উল্কাকণা দ্বারা গঠিত না হইলে, পুচ্ছ কখনই ঐ প্রকার স্বচ্ছ হইতে পারিত না। যাহা হউক, ক্ষুদ্র কণাময় ধূমকেতুগুলি সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হইতে আরম্ভ করিলে, উহাদের দেহস্থ অসংখ্য উল্কাকণাতে সূর্য্যের আকর্ষণে একপ্রকার জোয়ার-ভাঁটার (Tidal Disturbance) উৎপত্তি হয়, এবং তাহাতে উল্কাকণাগুলি পরস্পরকে সবেগে ধাক্কা দিতে আরম্ভ করে। সংঘর্ষণ হইলে তাপের উৎপত্তি অনিবার্য্য। কাজেই, এখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিণ্ডগুলি সংঘর্ষণের তাপে ভয়ানক উত্তপ্ত হইয়া জ্বলিতে আরম্ভ করে, এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রজ্বলিত বাষ্পরাশি ক্ষুদ্রতর পিণ্ডগুলিকে লইয়া জ্যোতিষ্কের চারিদিক্ দিয়া ছুটিয়া বাহির হইবার জন্য চেষ্টা করিতে থাকে। কিন্তু সূর্য্যের দিকে সেগুলি একপদও অগ্রসর হইতে পারে না। একই প্রকারের বিদ্যুতে পূর্ণ দুই পদার্থকে কাছাকাছি রাখিলে, তাহারা যেমন পরস্পর দূরে যাইবার চেষ্টা করে, এখানেও সেই প্রকার সূর্য্যের আকাশমণ্ডল ও ধূমকেতু-নির্গত বাষ্প কোন কারণে একই বিদ্যুতে পূর্ণ হইয়া পড়ায়, সেই লঘু বাষ্পরাশি সূর্য্য হইতে দূরে যাইতে আরম্ভ করে, এবং শেষে তাহারই সেই একদিগ্‌গামী ধারা আমাদের নিকট ধূমকেতুর পুচ্ছ হইয়া দাঁড়ায়।*

তাপ পাইলে প্রায় সকল পদার্থেরই আয়তন বাড়িয়া যায়। চক্ষুর অগোচর দূরবর্ত্তী ধূমকেতু সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হইয়া যখন নিজেরই

* কি কারণে ধূমকেতুর বাষ্প ও সৌরাকাশ একই জাতীয় বিদ্যুতে পূর্ণ হইয়া পড়ে, অদ্যাপি কোন বৈজ্ঞানিকই তাহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারেন নাই। সূর্য্যের তাপ ও আলোক-রশ্মি ধূমকেতুর অতি লঘু উল্কাকণাগুলিকে চাপ দিয়া বিতাড়িত করে বলিয়া, আজকাল অনেক বৈজ্ঞানিক অনুমান করিতেছেন।

দেহোৎপন্ন তাপে নিজে উত্তপ্ত হইয়া পড়ে, তখন তাহারও আকার বাড়িয়া যায়। গত ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে যে একটি বৃহৎ ধূমকেতুর (Donati's Comet) উদয় হইয়াছিল, গণনায় তাহার কেবল মুণ্ডটিরই ব্যাসের পরিমাণ আড়াই লক্ষ মাইল দেখা গিয়াছিল। পুচ্ছটি অবশ্যই ইহা অপেক্ষা বহুশত গুণ বড় ছিল। এপর্য্যন্ত যতগুলি ধূমকেতুর আয়তন গণনা করা হইয়াছে, তাহাদের কাহারও পুচ্ছের দৈর্ঘ্য এক কোটি মাইলের কম দেখা যায় নাই। কোন কোন ধূমকেতুতে ইহার পরিমাণ দশ কোটি মাইলেরও অধিক হইতে দেখা গিয়াছে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ধূমকেতুমাত্রই দূরবিচ্ছিন্ন অতি ক্ষুদ্র উল্কাকণা দ্বারা গঠিত। এই প্রকার একটা লঘু জিনিস তাপ পাইয়া ফাঁপিয়া দাঁড়াইলে, তাহার ঘনতা যে খুব কম হইয়া পড়িবে, তাহা আমরা অনায়াসে অনুমান করিতে পারি। জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণও তাহাই অনুমান করেন। অনেক সময় বড় বড় ধূমকেতু পৃথিবী, মঙ্গল প্রভৃতি ক্ষুদ্র গ্রহের নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, কিন্তু তাহারা এই ছোট গ্রহগুলিকেও অণুমাত্র বিচলিত করিতে পারে নাই ; বরং নিজেরাই পৃথিবী ও মঙ্গলের টানে বিচলিত হইয়া পড়িয়াছে। বলা বাহুল্য, ধূমকেতুগুলি আমাদের বায়ুর ন্যায়ও ভারবিশিষ্ট হইলে, এপ্রকার হইত না। জগদ্বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ্‌ হার্শেল সাহেব গণনা করিয়া বলিয়াছিলেন, বৃহৎ ধূমকেতুর পুচ্ছ আকাশের কোটি কোটি মাইল স্থান অধিকার করিয়া থাকিলেও তাহার সমবেত গুরুত্ব কখনই দুই তিন সেরের অধিক হইতে পারে না।

প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ ধূমকেতুগুলিকে গুরুভার বৃহৎ জ্যোতিষ্ক মনে করিয়া উহাদের উদয়কালে বড় শঙ্কিত হইয়া পড়িতেন। কোনক্রমে ধূমকেতুর সহিত সংঘর্ষণ হইলে, পৃথিবী ভস্মীভূত হইয়া পড়িবে বলিয়া তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল। আধুনিক জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ ধূমকেতুর লঘুতার যে

সকল প্রমাণ প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা মনে করিলে প্রাচীন জ্যোতিষী-দিগের আশঙ্কা যে কত অমূলক, তাহা আমরা বুঝিতে পারি। সংঘর্ষণ হইলে পৃথিবীর অণুমাত্র হানির সম্ভাবনা নাই, বরং তাহাতে ধূমকেতুরই চূর্ণিত দেহ বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবারই কথা। গত ১৮৬১ সালে আমাদের পৃথিবী ও চন্দ্র সত্যই একটি ধূমকেতুর পুচ্ছের ভিতর আসিয়া পড়িয়াছিল। বলা বাহুল্য, পৃথিবী সেই পুচ্ছাঘাত সহ্য করিয়া ঠিক্ পূর্ব্ববৎ রহিয়াছে। মার্সেলিস্ মানমন্দিরের জ্যোতিষী ভাল্জ (M. Valz) সাহেব এবং ইংরাজ জ্যোতির্ব্বিদ্ অধ্যাপক হিণ্ড (Hind) এই ঘটনার সময় সতর্কতার সহিত আকাশ পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। কেহই বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যাপার দেখিতে পান নাই। যে কয়েক দিন পৃথিবী ধূমকেতুর পুচ্ছাভ্যন্তরে ছিল, কেবল মাত্র সেই কয়েক দিন আমাদের বায়ুমণ্ডল লোহিতাভ হইয়া পড়িয়াছিল; এবং রাত্রিতে আকাশের সর্ব্বাংশে যেন একপ্রকার অতি ক্ষীণ আলোক দেখা যাইত।

এই ত গেল ধূমকেতুর সাধারণ কথা। হ্যালি সাহেবের আবিষ্কৃত যে ধূমকেতুটি কয়েক বৎসর পূর্ব্বে উদিত হইয়াছিল, এখন তাহার আলোচনা করা যাউক।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বহু ধূমকেতুর মধ্যে যেগুলি সূর্য্য ও বৃহৎ গ্রহগুলির আকর্ষণে সৌরজগতে আবদ্ধ হইয়া পড়ে, তাহাদিগকে গ্রহের ন্যায়ই এক এক নির্দ্দিষ্ট পথ অবলম্বন করিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ে সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। প্রাচীন জ্যোতির্বিদগণ এই ব্যাপারটি লক্ষ্য করিতে পারেন নাই। তাঁহারা সকলেই বলিতেন, হঠাৎ সৌরজগতে প্রবেশ করিয়া এগুলি একবার মাত্র সূর্য্য-প্রদক্ষিণ করে এবং তার পর এক অনুবৃত্তাকারপথ (Parabolic) অবলম্বন করিয়া সৌরজগৎ হইতে চির-দিনের জন্য বাহির হইয়া যায়। অনুবৃত্তাকার-পথ ছাড়া বৃত্তাভাস

(Eliptical) পথ অবলম্বন করিয়াও যে তাহারা চলিতে পারে, তাহা ইঁহারা জানিতেন না। হ্যালি সাহেব নিউটনের মহাকর্ষণের নিয়মগুলি লইয়া আলোচনা করিবার সময় দেখিয়াছিলেন, কোন জ্যোতিষ্ক অনুবৃত্তাকার-পথে চলিয়া যদি পথিমধ্যে কোন বৃহৎ গ্রহের আকর্ষণের ফাঁদে পড়ে, তবে তাহার গতি অবস্থাবিশেষে কখন হ্রাস, কখন বা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। গতি বৃদ্ধি পাইলে সেটি আর সৌরজগতে আবদ্ধ থাকিতে পারে না। তখন হাইপারবোলা (Hyperbola) নামক এক বক্রপথ অবলম্বন করিয়া তাহারা বর্দ্ধিত বেগে নিরুদ্দেশ-যাত্রা আরম্ভ করে। কিন্তু বেগ কমিয়া আসিলে ইহারা পলায়নের এই সুবিধাটা একেবারে পায় না। তখন সৌরজগতে চিরবন্দী হইয়া বৃত্তাকার-পথে সূর্য্যপ্রদক্ষিণ করা ব্যতীত তাহাদের আর গত্যন্তর থাকে না।

হ্যালি সাহেব গতিতত্ত্বের পূর্ব্বোক্ত গাণিতিক সত্যটির পরিচয় পাইয়া মনে করিয়াছিলেন, আমরা যুগ-যুগান্তর ধরিয়া যে সকল বিচিত্র আকারের ধূমকেতু দেখিয়া আসিতেছি, তাহাদের সকলই চিরকালের জন্য জগৎ ত্যাগ করিয়া যায় না ; অন্ততঃ কতকগুলি বৃত্তাভাস-পথ অবলম্বন করিয়া নিশ্চয়ই আমাদিগকে পুনঃপুনঃ দেখা দিতেছে। অতি প্রাচীনকাল হইতে এ পর্য্যন্ত যতগুলি ধূমকেতুর উদয় হইয়াছে, হ্যালি সাহেব তাহাদের এক তালিকা সংগ্রহ করিয়া তন্মধ্যে কোন্ কোন্‌টি পুনঃপুনঃ সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে, তাহার অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিছুদিনের গবেষণার পর বহু ধূমকেতুর মধ্যে কেবল চব্বিশটিকে বৃত্তাভাস-পথাবলম্বী বলিয়া তাঁহার মনে হইয়াছিল। তন্মধ্যে আবার ১৫৩১, ১৬০৭, এবং ১৬৮২ খৃষ্টাব্দের ধূমকেতুগুলির ভ্রমণপথের প্রায় অবিকল একতা দেখিয়া সেগুলি যে একই ধূমকেতু, তাহা তিনি স্পষ্ট বুঝিয়াছিলেন।

১৬৮২ সালের ধূমকেতুটিকে হ্যালি সাহেব স্বচক্ষে দেখিয়া তাহার

কক্ষাদির অবস্থান পূর্ব্বেই গণনা করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং ১৫৩১ ও ১৬০৭ সালের ধূমকেতুর বিশেষ বিবরণ আপিয়ানস্ (Apienus) ও কেপ্‌লার (Kepler) সাহেব কর্ত্তৃক জ্যোতিষিকগ্রন্থে লিপিবদ্ধ ছিল। সুতরাং এই তিনটিকে তুলনা করিয়া একটা সিদ্ধান্ত দাঁড় করানো কষ্টকর হয় নাই। হ্যালি সাহেব গবেষণা শেষ করিয়া স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছিলেন, ১৬৮২ সালের ধূমকেতুটিই ১৫৩১ এবং ১৬০৭ সালে দেখা দিয়াছিল এবং ১৭৫৭ বা ১৭৫৮ সালের কোন সময়ে সেইটিই ঘুরিয়া আসিয়া নিশ্চয় দেখা দিবে। হিসাবে উহার পরিভ্রমণকাল ৭৬ বৎসর বলিয়া স্থির হইয়াছিল।

এই ঘটনার পূর্ব্বে অনেক জ্যোতিষিক গণনা হইয়া গিয়াছিল এবং গণনার সহিত প্রত্যক্ষদৃষ্ট ব্যাপারেরও মিল দেখা গিয়াছিল, কিন্তু কোন জ্যোতিষীই হ্যালি সাহেবের ন্যায় দৃঢ়তার সহিত ভবিষ্যদ্বাণী প্রচার করিতে পারেন নাই। জগতের জ্যোতিষিসম্প্রদায় তাঁহার অসমসাহসিকতা দেখিয়া অবাক্ হইয়া গিয়াছিলেন। ১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে ৮৬ বৎসর বয়সে অতিবৃদ্ধ হ্যালি সাহেব পরলোক গমন করেন। কাজেই, নিজের গণনার সার্থকতা স্বচক্ষে দেখিবার সুযোগ তিনি পাইলেন না; কিন্তু সমগ্র জগৎ সেই গণনার সত্যতা দেখিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট সময়ের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

ক্রমে ধূমকেতুর নির্দ্দিষ্ট উদয়কাল নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ সতর্কতার সহিত জ্যোতিষ্কটির অনুসন্ধানের আয়োজন করিতে লাগিলেন। গত ১৬৮১ সালে সেটি যখন বৃহস্পতির নিকটবর্ত্তী হইয়াছিল, তখন ঐ বৃহৎ গ্রহের আকর্ষণে তাহাকে কিঞ্চিৎ কক্ষভ্রষ্ট হইতে হইয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী পণ্ডিত ক্লেরোসাহেব (Clairaut) সেই কথা স্মরণ করিয়া, এই সময়ে বৃহস্পতির টানে তাহার আগমনকাল কতদিন পিছাইয়া পড়িবার সম্ভাবনা, তাহার একটা হিসাব প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। গণনায় দেখা গেল, পূর্ব্বোক্ত কারণে সেটি সম্ভবতঃ নির্দ্দিষ্ট

কালের প্রায় ছয় শত দিন পরে সূর্য্যের নিকটতম দেশে আসিয়া উপস্থিত হইবে।

১৭৫৮ সালের শীতকাল উপস্থিত হইবামাত্র নানাদেশের জ্যোতিষি-গণ দূরবীণ্ সাহায্যে হ্যালির ধূমকেতুর অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু দুই তিন মাসের অবিরাম পর্য্যবেক্ষণে তাহার কোন কিছু দেখা যায় নাই। শেষে সেই বৎসরেরই ২৩ ডিসেম্বর তারিখে ধূমকেতুর ক্ষীণা-লোক দূরবীক্ষণে ধরা দিয়াছিল, এবং তারপর সেই অনুজ্জ্বল মেঘখণ্ডবৎ পদার্থটি বৃহৎকায় ও উজ্জ্বলতর হইয়া সমগ্র জগতের বিস্ময় উদ্রেক করিয়াছিল।

বলা বাহুল্য, এই আবিষ্কারে জ্যোতিষিসম্প্রদায় হ্যালি সাহেবের অভ্রান্ত গণনার পরিচয় পাইয়া অবাক্ হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং হ্যালির ধূমকেতুর ন্যায় আরও যে অনেক বন্দী জ্যোতিষ্ক সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে, তাহাও বুঝিয়াছিলেন। ১৭৫৮ সালের ২৩শে ডিসেম্বর অদ্যাপি জ্যোতিষিক ইতিহাসের এক স্মরণীয় দিন বলিয়া গণ্য হইতেছে। এক হ্যালি সাহেবেরই আবিষ্কারপ্রথা সুসংস্কৃত করিয়া পরবর্ত্তী জ্যোতিষিগণ অনেকগুলি বৃত্তাভাস-পথাবলম্বী ধূমকেতুর আবিষ্কার করিয়াছেন।

১৭৫৮ সালের পর ৭৬ বৎসর কয়েক মাসে কক্ষ পরিভ্রমণ করিয়া হ্যালির ধূমকেতু গত ১৮৩৫ সালে আর একবার পৃথিবীকে দেখা দিয়াছিল।

জ্যোতিষিক পর্য্যবেক্ষণে ফোটোগ্রাফির ব্যবহার প্রবর্ত্তিত হওয়ার পর নূতন জ্যোতিষ্ক আবিষ্কার অপেক্ষাকৃত সহজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পূর্ব্বে পর্য্যবেক্ষককে কেবল চক্ষু ও দূরবীণের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হইত। আজকাল বড় বড় দূরবীণের সহিত ফোটোগ্রাফের যন্ত্র সংলগ্ন করিয়া আকাশের নিখুঁত ছবি উঠানো হইতেছে এবং সেই ছবি দেখিয়াই নূতন

জ্যোতিষ্কের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। বৃহৎ দূরবীণ্ যে সকল দূরবর্ত্তী জ্যোতিষ্কের ক্ষীণ রশ্মি পুঞ্জীভূত করিয়া আমাদের চক্ষুকে জাগাইতে পারে না, ফোটোগ্রাফের কাচে সেই সকল ক্ষুদ্র জ্যোতিষ্কেরই স্পষ্ট ছবি ফুটিয়া উঠিতেছে। এই প্রকারে জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ হ্যালির ধূমকেতুর ক্ষীণ আলোক-রেখা উদয়ের ছয় মাস পূর্ব্বে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। ইহার পর সেটি যখন সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হইতে আরম্ভ করিল, তখন তাহাকে দেখিবার জন্য আর ফোটোগ্রাফের ছবি বা দূরবীণের আবশ্যক হয় নাই। এই সময় হইতে তাহার সুদীর্ঘ পুচ্ছ এবং বৃহৎ মুণ্ড অন্ততঃ দুইমাস ধরিয়া পূর্ব্ব ও পশ্চিম গগনে নগ্নচক্ষেই দেখা গিয়াছিল।

চন্দ্র যখন পৃথিবী ও সূর্য্যের মধ্যে আসিয়া ঠিক্ সমসূত্রে দাঁড়ায়, তখন চন্দ্রের দেহে সূর্য্য ঢাকিয়া যায়। ইহাই সূর্য্যগ্রহণ। ধূমকেতু বা অপর কোন জ্যোতিষ্ক এই প্রকারে মাঝে আসিয়া দাঁড়াইলে ছোটখাটো সূর্য্যগ্রহণ হইবার সম্ভাবনা থাকে। গত ১৯১০ সালে যখন হ্যালির ধূমকেতু দেখা গিয়াছিল, তখন (১৯ মে তারিখে) ধূমকেতুর দ্বারা সূর্য্যমণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়া পড়িবে বলিয়া স্থির ছিল। সেদিন পৃথিবীর প্রধান প্রধান মান-মন্দির হইতে সূর্য্যের সহস্র সহস্র ফোটোগ্রাফ তোলা হইয়াছিল; কিন্তু কোন ছবিতেই উপগ্রহণের (Transit) পরিচয় পাওয়া যায় নাই। কাজেই, বলিতে হইতেছে, ধূমকেতুর দেহস্থ পিণ্ডগুলি এত ক্ষুদ্র যে, সেগুলি কোন-ক্রমে সূর্য্যালোককে আট্‌কাইতে পারে না। দূর হইতে ধূমকেতুর পুরোভাগটাকে নিবিড় বলিয়া বোধ হইলেও তাহা সত্যই নিবিড় নয়।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সূর্য্য হইতে যখন দূরে অবস্থান করে, তখন ধূমকেতুর পুচ্ছ থাকে না। সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হইতে থাকিলেই ইহাদের পুচ্ছ দেখা দিতে আরম্ভ করে। তার পর সূর্য্য হইতে দূরে চলিয়া গেলেই পুচ্ছ ছোট হইয়া পড়ে। গত ১৯০৮ সালে পূর্ব্বগগনে কয়েক দিন

যে একটি বৃহৎ ধূমকেতু (Moreshouse Comet) দেখা গিয়াছিল, জ্যোতিষিগণ তাহার পুচ্ছের আকার পরিবর্ত্তন বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছিলেন। ইহাতে সিদ্ধান্ত হইয়াছিল যে, ধূমকেতুগুলি সূর্য্যের নিকটে আসিয়া যতটা পুচ্ছ নির্গত করে, দূরে চলিয়া যাইবার সময় তাহার সমস্তটাকে গুটাইয়া লইয়া যাইতে পারে না,—পুচ্ছের কতক অংশ মহাকাশে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকিয়া যায়। হ্যালির ধূমকেতুর আগমনে জ্যোতিষিগণ এই ব্যাপারটির বিশেষ অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। ইহাতেও সেই প্রকার পুচ্ছের ক্ষয় সুস্পষ্ট ধরা পড়িয়াছিল। সুতরাং বলিতে হইতেছে. প্রত্যেক প্রদক্ষিণের শেষে ধূমকেতুগুলির দেহের একটু একটু ক্ষয় হইতেছে। এই ক্ষয় পুঞ্জীভূত হইয়া বৃহৎ সাময়িক ধূমকেতু-গুলিকে হয়ত কোন একদিন এমন ক্ষীণ করিয়া দিবে যে, মহাকাশে তাহাদের আর চিহ্নমাত্র খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।

——

নূতন গ্রহের সন্ধান

গ্রহ-নক্ষত্রের পর্য্যবেক্ষণে বড় বড় দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সহিত ফোটো-গ্রাফের ছবি উঠাইবার পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হওয়ায়, গত ষাট বৎসরের মধ্যে অনেক যুগলনক্ষত্র, নীহারিকাপুঞ্জ এবং নূতন তারকার আবিষ্কার হইয়াছে। তাছাড়া সূর্য্যের প্রাকৃতিক অবস্থা এবং ধূমকেতুর গতিবিধি সম্বন্ধেও অনেক নব নব তথ্য ঐ উপায়ে সংগ্রহ করা গিয়াছে। কিন্তু আমাদের ক্ষুদ্র পৃথিবীটি যে সৌরজগতের অধিবাসী, এই সুদীর্ঘকালে তাহার সম্বন্ধে কোন উল্লেখযোগ্য নূতন তত্ত্বই আবিষ্কৃত হয় নাই। মঙ্গল (Mars) এবং পৃথিবীর কক্ষার মধ্যে যে সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র গ্রহ (Asteroids) পরিভ্রমণ করিতেছে, তাহাদেরই দুই চারিটির আবিষ্কারের কথা আমরা মধ্যে মধ্যে শুনিতে পাইয়াছি বটে, কিন্তু এগুলিকে কখনই বৃহৎ আবিষ্কার বলা যায় না। সম্প্রতি পিকারিং (Pickering) ও পেরিন্ (Perrine) সাহেব ফোটোগ্রাফির সাহায্যে আকাশের চিত্র অঙ্কন করিয়া শনি ও বৃহস্পতি-গ্রহের যে কয়েকটি নূতন উপগ্রহের সন্ধান পাইয়াছেন, কেবল তাহাকেই আধুনিক যুগের একমাত্র উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার বলা যাইতে পারে।

আকাশের যে অংশটি অধিকার করিয়া সূর্য্যের পরিবার বাস করিতেছে, তাহা অনন্ত মহাকাশের তুলনায় ক্ষুদ্র হইলেও মানবের জ্ঞান ও বুদ্ধির নিকট অতি বৃহৎ। এই ক্ষুদ্র সৌরজগতের গূঢ় রহস্যগুলিকে মানুষ যে কোন কালে নিঃশেষে আবিষ্কার করিতে পারিবে, তাহার আশা করা যায় না। বহু সহস্র বৎসর ধরিয়া নানা দেশের জ্যোতিষিগণ নানা প্রকারে সৌরজগতের পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আজও ইহার বড় বড় জ্যোতিষ্ক-

গুলিকেও নিঃশেষে আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। দেড়শত বৎসর পূর্ব্বেকার জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি এবং শনি এই ছয়টি মাত্র গ্রহের অস্তিত্বের পরিচয় পাইয়াছিলেন। এগুলি ছাড়া আরো যে বৃহৎ গ্রহ সৌরজগতে থাকিতে পারে, একথা সেই সময়ে কাহারো মনেই আইসে নাই। হার্শেল এবং লেভেরিয়ার সাহেব কর্ত্তৃক ইউরেনস্ (Uranus) ও নেপ্‌চুন (Neptune) গ্রহদ্বয়ের আবিষ্কারে পর আমাদের জ্যোতিষিক জ্ঞান যে কত সঙ্কীর্ণ, তাহা সকলে প্রত্যক্ষ দেখিয়াছিলেন।

যাহা হউক, গত ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে নেপ্‌চুনের আবিষ্কারের পর এপর্য্যন্ত সৌরজগতে আর কোন বৃহৎ জ্যোতিষ্কের সন্ধান পাওয়া যায় নাই। শত শত বৃহৎ দূরবীণের অতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টির অন্তরালে কোন বৃহৎ গ্রহ প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারে না ভাবিয়া জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণও একপ্রকার নিশ্চিন্ত ছিলেন। ইউরেনস্ গ্রহকে তাহার নির্দ্দিষ্ট পথ হইতে ঈষৎ বিচলিত হইতে দেখিয়া ইংরাজ জ্যোতিষী আডাম্‌স্ (Adams) ও ফরাসী বৈজ্ঞানিক লেভেরিয়ার কেবল গণিতের সাহায্যে যেমন নেপ্‌চুনের আবিষ্কার করিয়াছিলেন, এখন আবার ঠিক সেই প্রকার গণনায় আর কয়েকটি বৃহৎ গ্রহের আবিষ্কার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই নবগ্রহগুলির আবিষ্কার-সম্ভাবনার কথা সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

আমাদের পরিজ্ঞাত গ্রহগুলির মধ্যে নেপ্‌চুনই সূর্য্য হইতে সর্ব্বাপেক্ষা দূরবর্ত্তী। জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ ইহার কক্ষার বাহিরে সৌর-পরিবার-ভুক্ত কোন জ্যোতিষ্কেরই সন্ধান পান নাই। আজ প্রায় ত্রিশ বৎসর হইল, অধ্যাপক টড্ (Prof. Todd) ইউরেনস্ গ্রহের গতিবিধি লইয়া গবেষণা করিয়াছিলেন। নেপ্‌চুনের আকর্ষণে ইহার ভ্রমণপথের যে বিচলন হয়, তাহা হিসাবের মধ্যে আনিয়াও তিনি গণনালব্ধ পথের

সহিত উহার প্রত্যক্ষ দৃষ্টপথের মোটেই একতা দেখিতে পান নাই। এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া নেপ্‌চুনের কক্ষার বাহিরে নিশ্চয় একটি বৃহৎ গ্রহ আছে বলিয়া টড্ সাহেবের মনে হইয়াছিল। আমেরিকার ওয়াশিংটন্ মানমন্দিরের বৃহৎ দূরবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা তিনি কিছু দিন ধরিয়া নবগ্রহটির অন্বেষণ করিয়াছিলেন। কিন্তু গ্রহের কোন চিহ্নই দেখা যায় নাই এবং গণনায় ভুল আছে ভাবিয়া এই অনুসন্ধানে অপর কোন জ্যোতিষী যোগদান করেন নাই। কাজেই, টড্ সাহেবের গণনাবৃত্তান্তটি আধুনিক জ্যোতিষিক ইতিহাসে স্থায়ী চিহ্ন রাখিয়া যাইতে পারে নাই।

সম্প্রতি অধ্যাপক ফরবিস (G. Forbes) সাহেব টড্ সাহেবের সেই পুরাতন হিসাব পরীক্ষা করিয়া তাহাকে সম্পূর্ণ অভ্রান্ত দেখিতে পাইয়াছেন, এবং নূতন গ্রহের খোঁজে নেপ্‌চুনের নিকটবর্ত্তী প্রদেশ পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্ম বৈজ্ঞানিকদিগকে আহ্বান করিতেছেন। কেবল সেই প্রাচীন গণনার উপর নির্ভর করিয়া ফরবিস সাহেব আমন্ত্রণবাণী প্রচার করেন নাই। গাণিতিক প্রমাণ ব্যতীত নূতন গ্রহের অস্তিত্বের ইনি আরো অনেক প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন।

ফরবিস সাহেবের প্রমাণগুলি বুঝিতে হইলে ধূমকেতু সম্বন্ধে দুই একটি কথা জানিয়া রাখা আবশ্যক। সৌরজগতের নানা জ্যোতিষ্কের মধ্যে ধূমকেতুগুলিই তাহাদের উচ্ছৃঙ্খল গতিবিধির জন্য চিরপ্রসিদ্ধ। কখন কোন্ গ্রহ-উপগ্রহের আকর্ষণে তাহাদের ভ্রমণপথ কতটা পরিবর্ত্তিত হইল, তাহার হিসাব বড়ই কঠিন। তথাপি সূর্য্য, বৃহস্পতি প্রভৃতি বৃহৎ গ্রহগণের আকর্ষণে যে সকল ধূমকেতু চিরদিনের জন্য সৌরজগতে বন্দী হইয়া সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহাদের গতিবিধির মধ্যে একটা মোটামুটি শৃঙ্খলা দেখা যায়। ইহারা পৃথিবী ইত্যাদি গ্রহের ন্যায়ই এক এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে সূর্য্যপ্রদক্ষিণ করে।

কিন্তু ভ্রমণপথে হঠাৎ কোন বৃহৎ গ্রহের সহিত সাক্ষাৎ হইলে সকল নিয়মই ভঙ্গ হইয়া যায়। তখন পূর্ব্বের ভ্রমণপথ ত্যাগ করিয়া ঐ সকল প্রবল গ্রহের নিকটবর্ত্তী এক এক নূতন পথে ইহারা চলিতে আরম্ভ করে। প্রবল গ্রহের নিকট দুর্ব্বল ধূমকেতুগুলির এই প্রকারে আনুগত্য-স্বীকার জ্যোতিষিক ইতিহাসের দুর্লভ ঘটনা নয়।

জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ বলেন, মহাকাশের নানা অংশে যে সকল উল্কাপিণ্ড-ময় ক্ষুদ্র জ্যোতিষ্ক দলে দুলে ছুটিয়া বেড়াইতেছে, তাহারাই সূর্য্যের আকর্ষণের সীমার ভিতরে আসিয়া পড়িলে ধূমকেতুর আকার পরিগ্রহ করে। এই অবস্থায় তাহারা আর গন্তব্য স্থানের দিকে চলিতে পারে না। সূর্য্য তাহাদিগকে মহাপুচ্ছবিশিষ্ট ধূমকেতুতে রূপান্তরিত করিয়া এক এক অনুবৃত্তাকার (Parabolic) পথে নিজের চারিদিকে ঘুরাইতে আরম্ভ করে।

এই প্রকারে একবার সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া ধূমকেতুগুলি যখন সৌরজগৎ ত্যাগ করিবার জন্য পিছাইতে আরম্ভ করে, তখনই ইহাদের প্রকৃত সঙ্কটকাল উপস্থিত হয়। পথিমধ্যে বৃহৎ গ্রহের সহিত সাক্ষাৎ হইলে যদি তাহার আকর্ষণে ইহাদের গতি হ্রাস হইয়া পড়ে, তবে কেহই নিস্তার পায় না। চিরদিনের জন্য সৌরজগতে বন্দী হইয়া ধূমকেতুগুলিকে সেই আকর্ষক গ্রহের আনুগত্য স্বীকার করিতে হয়। গতি বৃদ্ধি পাইলে ইহারা হাইপারবোলা (Hyperbola) আকারের পথ অবলম্বন করিয়া চিরদিনের জন্য সৌরজগৎ ছাড়িয়া চলিয়া যায়। বহুদিন হইল, লেক্‌সেলের ধূমকেতুটিতে (Lexell's Comet of 1770) গতিবৃদ্ধির কার্য্য প্রত্যক্ষ দেখা গিয়াছিল। এই জ্যোতিষ্কটি সৌরজগতে বন্দী হইয়া বৃত্তাভাস-পথে সূর্য্যপ্রদক্ষিণ করিয়া আসিতেছিল। তারপর হঠাৎ একদিন বৃহস্পতির সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় তাহার গতি এত বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, সেই দিন

হইতে লেক্‌সেলের ধূমকেতুর আর সন্ধান পাওয়া যায় না। কেবল গতিবৃদ্ধির জন্য হাইপারবোলা-পথ অবলম্বন করিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ অনুমান করিতেছেন।

ধূমকেতু-সম্বন্ধীয় পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি যে কাল্পনিক নয়, তাহার শত শত প্রমাণ আছে। বৃহস্পতি, শনি প্রভৃতি প্রধান প্রধান গ্রহের ক্ষেত্র পর্য্যবেক্ষণ করিলে হঠাৎ ধূমকেতুগুলির কক্ষাকে ঐসকল স্থানে আসিয়া শেষ হইতে দেখা যায়। এন্‌কি (Encke), ব্রর্সেন্‌ (Brorsen) প্রভৃতি ধূমকেতুগুলি বৃহস্পতির নিকট দিয়াই পরিভ্রমণ করে। হ্যালি (Halley), অল্‌বার (Alber) এবং পনের (Pon) ধূমকেতুগুলি নেপ্‌চুনগ্রহের নিকটবর্ত্তী প্রদেশ ত্যাগ করিয়া যাইতে পারে না। সুবিখ্যাত টেম্‌পেলের ধূমকেতুর (Tempel's Comet) সহিত আরো দুইটি ধূমকেতু মিলিয়া সেই প্রকার ইউরেনসের সঙ্গ ত্যাগ করিতে চাহে না। প্রধান গ্রহগুলির সহিত ধূমকেতুদিগের এইপ্রকার ঘনিষ্ঠতা দেখিলে, গ্রহগণই যে ধূমকেতুগুলিকে নিজেদের রাজ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখে, তাহা সহজেই বুঝা যায়।

গত ১৮৪৩ এবং ১৮৮২ সালে যে তিনটি ধূমকেতুর উদয় হইয়াছিল, তাহাদের গতিবিধি গণনা করিতে গিয়া অধ্যাপক ফর্‌বিস্‌ সাহেব গণনার ফলে এক অত্যাশ্চর্য্য একতা দেখিয়াছিলেন। ভ্রমণ-পথ গণনা করা হইলে, তাহাদের প্রত্যেকেরই কক্ষাকে নেপ্‌চুন গ্রহের বাহিরে এক স্থানে মিলিত হইতে দেখা গিয়াছিল, এবং অনুসন্ধানে আরো সাতটি ক্ষুদ্র ধূমকেতুর পথ ঐ প্রদেশে শেষ হইয়াছে বলিয়া বোধ হইয়াছিল। কোন বৃহৎ জ্যোতিষ্কের আকর্ষণ না থাকিলে, একই প্রদেশে বহু ধূমকেতুর কক্ষার এই প্রকার মিলন একবারে অসম্ভব। টড্‌ সাহেবের গাণিতিক প্রমাণের সহিত এই প্রমাণ যোগ করিয়া ফরবিস্‌ সাহেব

নেপচুনের কক্ষার বাহিরে নিশ্চয়ই এক বৃহৎ গ্রহ আছে বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতেছেন।

আবিষ্কর্ত্তা তাঁহার গণনালব্ধ গ্রহের অস্তিত্ব সমাচার প্রচার করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; ইহার সূর্য্যপ্রদক্ষিণকাল এবং দূরত্বাদিও গণনা করিয়াছেন। এই হিসাব হইতে দেখা যায়, আমাদের পৃথিবী সূর্য্য হইতে যতদূরে অবস্থিত, তাহার প্রায় ১০৫ গুণ দূরে থাকিয়া নূতন গ্রহটি হাজার বৎসরে এক একবার সূর্য্য প্রদক্ষিণ করিতেছে। সূর্য্য হইতে পৃথিবী প্রায় নয় কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত। নূতন গ্রহ যে কত দূরে থাকিয়া সূর্য্য-প্রদক্ষিণ করিতেছে, এখন পাঠক অনুমান করুন। জ্যোতির্বিবদ্‌গণ বলিতেছেন, সূর্য্য হইতে এত দূরবর্ত্তী বলিয়াই এপর্য্যন্ত গ্রহটি দূরবীণে ধরা দেয় নাই। পর্য্যবেক্ষকগণ সম্ভবতঃ ইহাকে একটি ক্ষীণ নক্ষত্র ভাবিয়া উপেক্ষা করিয়া আসিতেছেন।

মঙ্গল, বৃহস্পতি প্রভৃতি পরিজ্ঞাত গ্রহগুলির কক্ষা পৃথিবীর কক্ষার সহিত প্রায় এক সমতলে অবস্থিত। কেবল বুধ, শুক্র এবং শনির কক্ষাকে ধরাকক্ষার তল হইতে কিঞ্চিৎ অধিক বাঁকিয়া থাকিতে দেখা যায়। কাজেই, মেষ-বৃষাদি নক্ষত্রপুঞ্জযুক্ত রাশিচক্রের মধ্যে সৌরজগতের জ্যোতিষ্কগুলির সন্ধান পাওয়া গিয়া থাকে। এইকারণে গ্রহ-উপগ্রহের সন্ধানের জন্য জ্যোতিষীরা এপর্য্যন্ত রাশিচক্রের মধ্যে তাঁহাদের দৃষ্টি সংলগ্ন করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু নূতন গ্রহেব ভ্রমণপথ ধরাকক্ষের তলের সহিত প্রায় ৫২ অংশ কোণ উৎপন্ন করিয়া অবস্থান করিতেছে। সুতরাং রাশিচক্রের বহির্ভূত প্রদেশে ইহাকে অধিকাংশ কাল কাটাইতে হয়। নূতন গ্রহটির এই বিশেষত্বটিই ইহাকে শত শত দূরবীণের দৃষ্টি হইতে প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছে বলিয়াও অনেকে অনুমান করিতেছেন।

ফরবিস্ সাহেবের সংগৃহীত তত্ত্বগুলি প্রচারিত হইলে, আমেরিকা

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত পিকারিং (Prof. Pickering) সাহেব ফোটোগ্রাফ চিত্রে নেপ্‌চুন্‌ হইতেও দূরবর্ত্তী একটি গ্রহের অস্তিত্ব দেখিয়াছিলেন। এই আবিষ্কার সমাচার প্রচারিত হইলে, ফরবিসের গ্রহই পিকারিঙের চিত্রে ধরা দিয়াছে বলিয়া জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি পিকারিং সাহেব তাঁহার গ্রহের অবস্থানাদির সম্বন্ধে যে বিশেষ বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা দেখিলে উহা যে ফরবিসের গ্রহ নয়, তাহা বেশ বুঝা যায়।

যাহা হউক, আকাশের যে প্রদেশ গ্রহবর্জ্জিত বলিয়া উপেক্ষিত হইয়া আসিতেছিল, সেইস্থানেই একই সময়ে দুইটি বৃহৎ গ্রহের অস্তিত্বের আভাস পাইয়া, জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ বিস্মিত হইয়া পড়িয়াছেন। ষাট বৎসর পূর্ব্বে আডাম্‌স্‌ এবং লেভেরিয়ার নেপ্‌চুন গ্রহের অস্তিত্বের প্রমাণপ্রচার করিলে, সমগ্র বৈজ্ঞানিক জগতে যে মহা আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল, দুইটি নূতন গ্রহের আবিষ্কার সম্ভাবনায় আজ ঠিক সেই প্রকার আন্দোলনের সূচনা হইয়াছে। জগতের প্রধান প্রধান মানমন্দিরের জ্যোতিষিগণ গ্রহ দুইটিকে দেখিবার জন্য নানা আয়োজন করিতেছেন। ১৮৪৭ সালের ২৩ সেপ্টেম্বরের ন্যায় অদূর ভবিষ্যতের কোন একদিন হয় তো জ্যোতিষিক ইতিহাসের এক স্মরণীয় দিন বলিয়া গণ্য হইতে থাকিবে।

অতি দূরবর্ত্তী গ্রহগুলির সন্ধান করা যেমন দুঃসাধ্য, সূর্য্যের অতি নিকটস্থ গ্রহের অন্বেষণ তেমনি কষ্টকর। আমাদের পরিজ্ঞাত জ্যোতিষ্ক-গুলির মধ্যে এখন বুধ গ্রহটিই (Mercury) সূর্য্যের নিকটতম বলিয়া প্রসিদ্ধ। নিকট হইলেও এটি সূর্য্য হইতে প্রায় তিন কোটি ষাট লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত। বহুদিন হইল, নেপ্‌চুন গ্রহের আবিষ্কারক লেভেরিয়ার সাহেব বুধগ্রহের গতিবিধি লইয়া কিছুকাল পর্য্যবেক্ষণ করিতে গিয়া তাহার সুস্পষ্ট বিচলন প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। নিকটে অপর আর একটি বৃহৎ

জ্যোতিষ্ক না থাকিলে কোন গ্রহেরই বিচলন হয় না। কাজেই, সূর্য্যের আরো নিকটবর্ত্তী প্রদেশে থাকিয়া কোন একটি অপরিচিত গ্রহ বুধকে টানিতেছে বলিয়া সিদ্ধান্ত হইয়াছিল। কিন্তু লেভেরিয়ার সাহেব বহু পর্য্যবেক্ষণেও সেই অপরিচিতটিকে চাক্ষুষ দেখিতে পান নাই।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে ১৮৫৯ সালে ডাক্তার লেস্‌কারবল্ট (Dr. Lescarbault) নামক জনৈক অজ্ঞাতনামা বৈজ্ঞানিক সূর্য্যবিম্বের উপর দিয়া একটি ক্ষুদ্র গ্রহকে যাইতে দেখিয়াছিলেন। এই সংবাদ প্রচারিত হইলে লেভেরিয়ার সাহেব আর স্থির থাকিতে পারেন নাই। ডাক্তার লেস্‌কারবল্টের নিকট স্বয়ং উপস্থিত হইয়া এবং সূর্য্যবিম্বে দৃষ্ট গ্রহসম্বন্ধে সকল ব্যাপার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানিয়া লইয়া গণনা আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই গ্রহের আকর্ষণেই যে বুধ তাহার নির্দ্দিষ্ট পথ হইতে স্খলিত হইয়া পড়ে, গণনার ফল দেখিয়া তাহা স্পষ্ট বুঝা গিয়াছিল। লেভেরিয়ার সাহেব ইহার কক্ষাদি নিরূপণ করিয়া ইহাকে ভল্‌কান (Vulcan) নামে অভিহিত করিয়াছিলেন।

ডাক্তার লেস্‌কারবল্ট ব্যতীত অপর কোন জ্যোতির্ব্বিদ্ অদ্যাপি ভল্‌কান গ্রহকে দেখিতে পান নাই। বুধ এবং সূর্য্যের মধ্যস্থিত আকাশে কোন জ্যোতিষ্ক আছে কি না, তাহা নিঃসংশয়ে স্থির করিবার জন্য অনেক জ্যোতির্ব্বিদ্ অনেক পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন, কিন্তু অদ্যাপি কেহই কৃতকার্য্য হন নাই।

সূর্য্যের প্রখর আলোক তাহার নিকটস্থ জ্যোতিষ্কগুলিকে বড়ই অস্পষ্ট করিয়া রাখে। কেবল এই কারণে সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী জ্যোতিষ্কের পর্য্যবেক্ষণ বড়ই কষ্টসাধ্য ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়। পূর্ণ সূর্য্যগ্রহণের সময় উজ্জ্বল সূর্য্যবিম্ব যখন কৃষ্ণবর্ণ চন্দ্রের দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, তখন আর এই অসুবিধাটি থাকে না। লেভেরিয়ারের সময় হইতে এ পর্য্যন্ত অনেক

পূর্ণগ্রাস সূর্য্যগ্রহণ হইয়া গিয়াছে এবং প্রত্যেক গ্রহণেই ভল্‌কান্ গ্রহের সন্ধান হইয়াছে, কিন্তু কোন জ্যোতিষীই ইহাকে আর দেখিতে পান নাই। ১৮৭৪ সালের সূর্য্যগ্রহণে অধ্যাপক ওয়াট্‌সন্ এবং সুইফ্‌ট্ সাহেব সূর্য্যের অতি নিকটে দুইটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক দেখিয়া, তাহাদেরি একটিকে ভল্‌কান্ বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু শেষে সেই দুইটিকে কর্কট রাশির দুইটি নক্ষত্র বলিয়া স্থির হইয়াছিল।

বৃহৎ আবিষ্কার মাত্রেই অতর্কিতভাবে আসিয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়। কোন্ দিন কোন উপলক্ষ্যে বিধাতার অনন্ত সৃষ্টির কোন্ কণাটুকুর পরিচয় পাওয়া যাইবে, তাহা পূর্ব্বে হিসাব করিয়া বলা যায় না। সুতরাং লেভেরিয়ারের ভল্‌কান্ গ্রহটি যে, কোন এক শুভ মুহূর্ত্তে হঠাৎ দেখা দিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিবে না, একথা কেহই সাহস করিয়া বলিতে পারেন না।

যুগল-নক্ষত্র

যাঁহারা দূরবীণ সাহায্যে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট যুগল জ্যোতিষ্ক কোনক্রমেই নূতন হইতে পারে না। যুগল নীহারিকা আকাশের নানা অংশে প্রায়ই দেখা যায়। বায়েলার যুগল ধূমকেতুর কথা পাঠক অবশ্যই শুনিয়াছেন, তাছাড়া যুগল গ্রহের কথা আজ কাল শুনা যাইতেছে। যে চন্দ্রকে আমরা এপর্য্যন্ত পৃথিবীর উপগ্রহ বলিয়াই জানিতাম, সেটি এখন গ্রহপদে উন্নীত হইবার উপক্রম করিয়াছে। কয়েকজন আধুনিক জ্যোতির্ব্বিদের মতে পৃথিবী ও চন্দ্র একটি যুগ্মগ্রহ ব্যতীত আর কিছুই নয়। যুগল নক্ষত্রের ত কথাই নাই,—দৃশ্যমান তারকাগুলির মধ্যে, এই শ্রেণীর নক্ষত্রের সংখ্যা আজকাল প্রায় সহস্রাধিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

আকাশে যতগুলি নক্ষত্র নগ্নচক্ষে বা যন্ত্র সাহায্যে আমরা দেখিতে পাই, তাহাদের মধ্যে সাধারণতঃ দুই প্রকারের যুগ্মতা দেখা যায়। জ্যোতির্ব্বিদ্-গণ ইহাদের মধ্যে কতকগুলিকে চাক্ষুষযুগল (optical doubles) এবং অপরগুলিকে দূরবীক্ষণিক বা প্রকৃত যুগল সংজ্ঞায় আখ্যাত করিয়াছেন। চাক্ষুষ যুগল নক্ষত্রগুলির পরস্পরের মধ্যে কোনই সম্বন্ধ নাই; আকাশের নানাস্থানে আমরা যে সকল একক তারকা দেখিতে পাই, তাহাদেরই মত ইহারা কোটি কোটি মাইল দূরে থাকিয়া নিজেদের নির্দ্দিষ্ট গতিতে স্বাধীন ভাবে বিচরণ করে, কোনপ্রকারে পৃথিবীর সহিত সমসূত্রে আসিয়া পড়িলেই আমরা উহাদিগকে যুগল দেখি।* দূরবীক্ষণিক যুগল তারকাগুলির অবস্থা

---

* সপ্তর্ষিমণ্ডলের Mizer নামক নক্ষত্রটির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, পাঠক ঐ উজ্জ্বল নক্ষত্রটির পাশেই একটি অনুজ্জ্বল ক্ষুদ্র নক্ষত্র দেখিতে পাইবেন। যুগল দেখাইলেও ইহারা প্রকৃত যুগল নয়, ইহাদের যুগ্মতা চাক্ষুষমাত্র। এই নক্ষত্রের মধ্যে উজ্জ্বলটি বশিষ্ঠ এবং অপরটি অরুন্ধতী নামে খ্যাত।

কিন্তু তাহা নয়, ইহারা প্রকৃতই পরস্পরের নিকটবর্ত্তী থাকিয়া একটি নির্দ্দিষ্ট বিন্দুর চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। ইহাদের পরস্পরের আকর্ষণের প্রাবল্য এত বেশি যে, তাহা ছিন্ন করিয়া দূরে যাইবার সামর্থ্য কাহারো থাকে না।

একটা উদাহরণ দিলে, এই দুই শ্রেণীর যুগল-তারকার পার্থক্যটা পাঠক সহজে বুঝিতে পারিবেন। মনে করা যাউক, একটি বৃহৎ মাঠের ভিতর দিয়া জনৈক পথিক চলিয়াছে, বহুদূরে কেবল দুইটিমাত্র গাছ দেখা যাইতেছে; গাছদু'টির ব্যবধান প্রায় অর্দ্ধমাইল। পথিক চলিতে চলিতে যখন সেই দূরবর্ত্তী বৃক্ষদ্বয়ের সহিত প্রায় সমসূত্রে আসিয়া দাঁড়াইবে, তখন গাছদুটির মধ্যে যে একটা সুদীর্ঘ ব্যবধান আছে, তাহা বুঝিতে পারিবে না, উহাদিগকে প্রায় গায়ে-গায়ে বা পাশাপাশি দেখাইবে। আমরা পূর্ব্বে যে চাক্ষুষ যুগল-তারকার কথা বলিয়াছি, তাহাদের অবস্থান কতকটা ঐরূপ। তাহারা উদাহৃত বৃক্ষের ন্যায় পরস্পর খুব দূরে থাকিয়াও, খুব কাছাকাছি আছে বলিয়া আমাদের চক্ষুকে প্রতারিত করে। দুইটি গাছ খুব কাছাকাছি জন্মাইলে, যে-কোনো স্থানে দাঁড়াইলে যেমন তাহাদিগকে সর্ব্বদাই পরস্পরের নিকটবর্ত্তী দেখা যায়, প্রকৃত যুগল-তারকার অবস্থান কতকটা সেইরূপ। তাহারা স্বভাবতই সর্ব্বদা কাছাকাছি থাকে, তাই যে-কোনো স্থান হইতে পর্য্যবেক্ষণ করিলে উহাদিগকে যুগল দেখায়। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই প্রকৃত যুগল-তারকারই বিষয় আলোচনা করিব।

জ্যোতিঃশাস্ত্রের প্রাচীন ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে, স্থানে স্থানে যুগল-তারকার উল্লেখ দেখা যায়। গ্রীকৃপণ্ডিত টলেমি তাঁহার কোন গ্রন্থে যুগল-তারকার উল্লেখ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, সেই অতি-প্রাচীনকালে দূরবীণের প্রচলন ছিল না, সুতরাং তাঁহাদের উল্লিখিত তারকাগুলি যে প্রকৃত যুগল নয়, তাহা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে।

সম্ভবতঃ তাঁহারা নগ্নচক্ষে চাক্ষুষ যুগল-তারকা দেখিয়াই সেই কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। যাহা হউক, পুরাবৃত্তের কথা ছাড়িয়া দিয়া, আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের ইতিহাস আলোচনা করিলে, যুগল-নক্ষত্রের আবিষ্কারের সম্মান অধ্যাপক মিচেলের (Michell) প্রাপ্য বলিয়া মনে হয়। ইনি ১৭৬৭ অব্দে রয়াল্ সোসাইটির কোন এক অধিবেশনে যে এক প্রবন্ধ পাঠ করেন, তাহাতে যুগল-তারকা যে মহাকর্ষণের নিয়মানুযায়ী এক কঠিন বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া ঘুরিতেছে, তাহার আভাস ছিল। যুগল-তারকার প্রকৃতির এই সামান্য আভাস দিয়াই মিচেল্ সাহেবকে নিরস্ত থাকিতে হইয়াছিল। কারণ, ইহার অধিক কিছু বলিলে, তাঁহার উক্তির পোষক প্রমাণের অভাবে সেই সকল কথায় কেহ কর্ণপাত করিতেন না। কাজেই, সেই সময়ে যুগল-তারকা-সম্বন্ধীয় রহস্যের কোন মীমাংসা হইয়া উঠে নাই।

যুগল তারকা-সম্বন্ধে আজকাল আমরা যাহা-কিছু জানিতে পারিয়াছি, তজ্জন্য অষ্টাদশ শতাব্দীর সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতিষী সার্ উইলিয়ম্ হার্শেলের নিকট আমাদিগকে সম্পূর্ণ ঋণী বলিয়া মনে হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে যুগল-তারকার গতির নিয়মাদি আবিষ্কার করিবার জন্য হার্শেল সাহেব এক সুদীর্ঘ পর্য্যবেক্ষণের আয়োজন করিয়াছিলেন। তিনি আশা করিয়াছিলেন, যদি কোন যুগল-নক্ষত্রের মধ্যে কোনটি তাহার সহচর অপেক্ষা পৃথিবীর নিকটবর্ত্তী থাকে, তবে বার্ষিকগতিতে পৃথিবী যেমন এক একবার সূর্য্যপ্রদক্ষিণ শেষ করিবে, তারকাযুগলের পরস্পর ব্যবধানের মধ্যেও সেই প্রকার একটু আধটু বিচলন দেখা দিবে। হার্শেল এই ফললাভের আশায় প্রায় পঁচিশ বৎসরকাল যুগল-তারকা লইয়া পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। কিন্তু গণনায় পূর্ব্বানুমিত ফল দেখা যায় নাই। তৎপরিবর্ত্তে তিনি প্রত্যেক পর্য্যবেক্ষণই, অধিকাংশ তারকা-যুগ্মের কোন-না-কোন

নক্ষত্রকে একই দিকে অগ্রসর হইতে দেখিয়াছিলেন। পৃথিবী যেমন বৃত্তাভাস পথে সূর্য্য-প্রদক্ষিণ করে, তারকাযুগ্মের প্রত্যেক নক্ষত্রটি তাহার সহচরকে ঠিক সেইপ্রকার পথে প্রদক্ষিণ না করিলে, পর্য্যবেক্ষণে কোন প্রকারে ঐপ্রকার গতি দেখা যাইতে পারে না। মনে কর, কোন সার্কাসের খেলোয়াড় অশ্বপৃষ্ঠে বৃত্তাভাসপথে ঘুরিতেছে। এখন যদি সে কোন একটি লোককে ঠিক তাহার অগ্রবর্ত্তী থাকিয়াই চলিতে দেখে, তবে এই দ্বিতীয় ব্যক্তিও যে অশ্বারোহীর ন্যায় কোন এক বৃত্তাভাসপথে ঘুরিতেছে, তাহা আমরা অনায়াসেই অনুমান করিতে পারি। হার্শেল সাহেব যুগল-তারকাস্থ প্রত্যেক নক্ষত্রটিকে একই দিকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া ইহাদের প্রত্যেকটি যে নিয়ত অপরটির চারিদিকে ঘুরিতেছে, তাহা কতকটা ঐপ্রকারে বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

হার্শেলের ঐ আবিষ্কার সমাচার প্রচারিত হইলে, জ্যোতির্বিমাত্রেই বিস্মিত হইয়াছিলেন। সে সময়ে জ্যোতিষ্করাজ্যে নবাবিষ্কার বড়ই দুর্লভ ছিল, কীটদষ্ট জীর্ণ পুঁথি হাতে করিয়া অতি প্রাচীন আবিষ্কারগুলির চর্ব্বিতচর্ব্বণ ব্যতীত পণ্ডিতগণের উপায়ান্তর ছিল না। হার্শেলের আবিষ্কারে তাঁহারা দুই একটা নূতন কথা বলিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। সুযোগ উপস্থিত হইল বটে, কিন্তু তৎপরে অনেকদিন অবধি কোন জ্যোতির্বীই আর নূতন যুগল-তারকা আবিষ্কার করিতে পারেন নাই এবং পরিজ্ঞাত যুগল-তারকাগুলির ভ্রমণপথ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া অনেকেই অকৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। কিন্তু এই অকৃতকার্য্যতার জন্য পণ্ডিতগণের উপর কেহই দোষারোপ করিতে পারেন নাই. কারণ সেই সময়ে কোন পর্য্যবেক্ষণ-মন্দিরেই ক্ষুদ্রজ্যোতিষ্ক পর্য্যবেক্ষণোপযোগী দূরবীক্ষণযন্ত্রাদি ছিল না, কাজেই, আবিষ্কারের শত উদ্যোগ ব্যর্থ হইয়া যাইতেছিল।

হার্শেলের আবিষ্কারের প্রায় কুড়ি বৎসর পরে, কয়েকটি বৃহৎ দূরবীণ

নির্ম্মিত হওয়ায় পর্য্যবেক্ষণের খুব সুবিধা হইয়া পড়িয়াছিল। এই সকল উন্নত যন্ত্রের সাহায্যে চল্লিশ বৎসরের মধ্যে এক হাজার নূতন যুগ্ম-তারকার সন্ধান পাওয়া গিয়াছিল এবং বৃদ্ধ হার্শেলের সুযোগ্য পুত্র জন্ হার্শেল ও অধ্যাপক স্ত্রাভারিপ্রমুখ পণ্ডিতগণ এই সুযোগে অনেকগুলি যুগল-তারকার ভ্রমণ-পথ পর্য্যন্তও স্থির করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

নানা জ্যোতিষ্কের পরিভ্রমণবেগ তুলনা করিলে, পরস্পরের বেগের মধ্যে কোন ঐক্য বা শৃঙ্খলার আভাস পাওয়া যায় না। বৃহস্পতি-শুক্র হইতে আরম্ভ করিয়া শতসূর্য্যোপম নক্ষত্র পর্য্যন্ত প্রত্যেক জ্যোতিষ্কই এক এক নির্দ্দিষ্টবেগে মহাকাশে বিচরণ করিতেছে। যুগল-তারকাগণের পরিভ্রমণেও অবিকল পূর্ব্বোক্তপ্রকার বেগবৈচিত্র্য ধরা পড়িয়াছে। গণনাদ্বারা দেখা গিয়াছে, কুম্ভরাশিস্থ একটি যুগল-তারকা পরস্পরকে প্রদক্ষিণ করিতে প্রায় ১৬৫০ বৎসর অতিবাহন করে, আবার ইকুইলি (Equuleus) রাশির একটি নক্ষত্র তাহার সহচরটির চারিদিকে ঘুরিতে এগারো বৎসরের অধিক কাল-ক্ষেপণ করে না। কিন্তু ইহাই যুগল-তারকার পরিভ্রমণকালের সীমা নয়, পঞ্চাশ-যাট বৎসরের পর্য্যবেক্ষণেও জ্যোতির্ব্বিদ্গণ অনেকগুলি যুগল-তারকার পরিভ্রমণকাল স্থির করিতে পারেন নাই। এই সুদীর্ঘকালে ইঁহারা এত অল্পদূর অগ্রসর হইয়াছেন যে, তৎসাহায্যে গণনা-কার্য্য চলিতেছে না, সুতরাং উক্ত নক্ষত্রগুলির পরি-ভ্রমণকাল পরিজ্ঞাত ঊর্দ্ধসীমা ১৬৫০ বৎসরের যে কত অধিক হইবে, তাহা পাঠক অনায়াসে অনুমান করিতে পারিবেন। এই সকল যুগল-তারকার পরিভ্রমণ-পথ আবিষ্কারের ভার সুদূর ভবিষ্যতের জ্যোতির্ব্বিদ্গণের উপর অর্পণ করিয়া আধুনিক জ্যোতির্ব্বিদ্গণকে পরিতৃপ্ত থাকিতে হইতেছে; শত শত বৎসরের পর্য্যবেক্ষণফল তুলনা করিয়া ঐ সকল জ্যোতিষ্কের ভ্রমণপথ-নিরূপণের সুযোগ ভবিষ্যদ্বংশীয়েরাই পাইবেন।

যুগল-তারকাগুলির পরিভ্রমণকাল নানা জ্যোতিষিক গণনায় আজকাল খুব প্রযুক্ত হইতেছে। কেবল খেয়ালেরই বশবর্ত্তী হইয়া যে, জ্যোতির্ব্বিদগণ রাত্রির পর রাত্রি দূরবীণে চোখ লাগাইয়া অনিদ্রায় কাটাইতেছেন, তাহা নয়। আমরা জ্যোতিষ্কগ্রন্থে কোন নক্ষত্রের বিবরণ বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিলে, নক্ষত্রটি কত বড় জানিবার জন্য প্রথমেই ব্যস্ত হইয়া পড়ি। জ্যোতিষিগণ আজকাল যুগল-তারকার পরিভ্রমণকালের সাহায্যে গণনা করিয়া, আমাদের এই অনুসন্ধিৎসা চরিতার্থ করিতেছেন। পৃথিবীর নিকটবর্ত্তী যুগল-নক্ষত্র-সকল ধরাকক্ষার ব্যাসার্দ্ধের সহিত যে কোণ উৎপন্ন করে, তাঁহা স্থির করা বড় কঠিন নয়; কাজেই, সেই কোণ পরিমাপ দ্বারা পৃথিবী হইতে জ্যোতিষ্কগুলির দূরত্বও হিসাব করিয়া বাহির করা কঠিন হয় না। জ্যোতিষিগণ যুগল-তারকার পরিভ্রমণপথ ও দূরত্ব অবলম্বনে (কেপ্‌লারের তৃতীয় নিয়ম অনুসারে) ইহাদের গুরুত্বাদি সম্বন্ধীয় অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য আবিষ্কার করিতেছেন। এই হিসাবে সপ্তর্ষিমণ্ডলস্থ একটি যুগল-তারকাকে সূর্য্য অপেক্ষা প্রায় ১৮০০ গুণ বৃহত্তর দেখা গিয়াছে এবং আমাদের সূর্য্যের স্থানে নক্ষত্রটি অবস্থান করিলে, সেটিকে ধরাবাসিগণ সূর্য্যাপেক্ষা দেড়শতগুণ উজ্জ্বলতর দেখিত বলিয়া স্থির হইয়াছে।

যুগল-নক্ষত্রের উৎপত্তিতত্ত্ব লইয়া কিছুকাল পূর্ব্বে জ্যোতির্ব্বিদ্‌মহলে খুব আলোচনা চলিয়াছিল। কিন্তু এই আলোচনার ফলে তাঁহারা যে, কোন নিঃসন্দেহ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা সাহস করিয়া বলা যায় না। একদল জ্যোতিষী বলেন,—দুইটি নক্ষত্র তাহাদের নির্দ্দিষ্টপথে স্বাধীনভাবে চলিতে চলিতে এক সময়ে পরস্পরের খুব নিকটবর্ত্তী হইয়া পড়িয়াছিল। তার পর বৃহত্তর নক্ষত্রটি ক্ষুদ্রটিকে আর কাছ-ছাড়া হইতে দেয় নাই, এবং প্রবলের আকর্ষণবন্ধন ছিন্ন করিয়া ক্ষুদ্রটি যে বৃহতের অধিকার ত্যাগ করিবে, সে সামর্থ্যও তাহার নাই। কাজেই, সেই

মিলনের দিন হইতে সেটিকে বৃহতের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইতেছে।

নক্ষত্রগণ গতিশীল সত্য, এবং তাহাদের পূর্ব্বোক্তপ্রকারের মিলনও অসম্ভব নয়, স্বীকার করা যাইতে পারে; কিন্তু অনন্ত আকাশের অনন্ত দিক্ ধরিয়া যে সকল নক্ষত্র আসৃষ্টি চলাফেরা করিতেছে, তাহাদের মধ্যে এপ্রকার সাক্ষাৎকার যে একটা সুলভ ঘটনা, এ কথা কিছুতেই স্বীকার করা যায় না। অনন্ত নক্ষত্রগুলির মধ্যে কতগুলি যে যুগ্মাবস্থায় পরিভ্রমণ করিতেছে, তাহা স্থির হয় নাই এবং স্থির করিবার উপায়ও আপাততঃ নাই, কিন্তু আমাদের দূরবীণের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যেই যখন সহস্রাধিক যুগল-তারকা দৃষ্ট হইতেছে, তখন সমগ্র নক্ষত্রের অনুপাতে এগুলির সংখ্যা যে নিতান্ত অল্প নয়, তাহা আমরা বেশ বুঝিতে পারি। যুগল-নক্ষত্রের এই সংখ্যাধিক্য দেখিয়া, পূর্ব্ব-বর্ণিত আকস্মিক মিলন হইতেই যে প্রত্যেকের উৎপত্তি হইয়াছে, এই সিদ্ধান্ত সকলে অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতেছেন না।

নাক্ষত্রিক জগতের উৎপত্তিপ্রসঙ্গে এপর্য্যন্ত যতগুলি মতবাদ প্রচারিত হইয়াছে, তন্মধ্যে লাপ্লাসের নীহারিকাবাদই বৈজ্ঞানিকসমাজে খুব প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। একদল পণ্ডিত এই নীহারিকাবাদের সাহায্যে যুগল-তারকার উৎপত্তিতত্ত্বের মীমাংসা করিয়াছেন। নীহারিকাবাদিগণ বলেন, নাক্ষত্রিক জগৎগুলি সৃষ্টির প্রথমে বর্ত্তমান আকারে ছিল না। তখন এক একটা বিশাল জ্বলন্ত নীহারিকাকে নক্ষত্রগুলির স্থানে ঘুরিতে দেখা যাইত; তার পর সেই নীহারিকাগুলি তাপক্ষয়দ্বারা কালক্রমে জমাট্ হইয়া গেলে, এই গ্রহ-উপগ্রহযুক্ত নাক্ষত্রিক জগতের উৎপত্তি হইয়াছে। যুগ্মতারকার উৎপত্তিপ্রসঙ্গেও ইহারা বলিতেছেন,—প্রথমে এই সকল নক্ষত্রের স্থানে যুগল-জ্যোতিষ্কের চিহ্নমাত্রও ছিল না, তখন সেখানে কেবল

এক একটি ঘূর্ণ্যমান জ্বলন্ত নীহারিকারাশি দেখা যাইত। পরে সেগুলি শীতল হইয়া সঙ্কুচিত হইতে আরম্ভ করিলে, সেই ঘূর্ণনবেগ এত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইত যে, তখন আর নীহারিকাটি একসঙ্গে থাকিতে না পারিয়া স্বতঃই বিভক্ত হইয়া পড়িত। নীহারিকাবাদিগণের মতে, সেই খণ্ডিত নীহারিকারই পরিণতি যুগল-তারকা।

যুগল-নক্ষত্রের উৎপত্তিতত্ত্বসম্বন্ধীয় পূর্ব্বোক্ত উক্তিটি পাঠক কেবল অনুমান মূলক মনে না করেন। ঘূর্ণ্যমান পদার্থ ক্রমে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলে যে, তাহার আবর্ত্তনবেগ বৃদ্ধি পায় এবং তদ্দ্বারা তাহার বিভক্ত হইয়ারই যে সম্ভাবনা, গণিতের সাহায্যে নীহারিকাবাদিগণ তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। তচ্ছাড়া, পর্য্যবেক্ষণদ্বারা আকাশে যে কতকগুলি যুগল-নীহারিকা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তদ্দ্বারাও ইঁহাদের উক্তির সার্থকতা জানা যাইতেছে। নীহারিকাবাদিগণ বলিতেছেন, এক একটি বৃহৎ নীহারিকা কোটি কোটি বৎসরের তাপক্ষয়জনিত সঙ্কোচে বেগশালী ও খণ্ডিত হইয়া প্রথমে যুগল-নীহারিকার আকার প্রাপ্ত হয় এবং পরে ইহারাই আবার ক্রমে আরো সঙ্কুচিত হইয়া যুগল-তারকার উৎপত্তি করে।

সূর্য্যের ন্যায় একক নক্ষত্রগুলির সহিত যুগল-নক্ষত্রের তুলনা করিলে উভয়ের মধ্যে একটা বিশেষ পার্থক্য দেখা যায়। বৃহস্পতি, শুক্র, পৃথিবী ইত্যাদি সৌরসহচরগুলির পরিভ্রমণপথ প্রায় বৃত্তাকার, কিন্তু কোন যুগল-তারকার সহচরের কক্ষা এপর্য্যন্ত সেপ্রকার দেখা যায় নাই। যুগল-নক্ষত্রের ভ্রমণপথ বৃত্তাভাস বটে, কিন্তু সেগুলি অনেকটা লম্বা-আকৃতি-যুক্ত অর্থাৎ ইহাদের বৃহৎ-ব্যাসগুলি (major axis) ক্ষুদ্র-ব্যাসের (minor axis) তুলনায় অত্যন্ত দীর্ঘ। নীহারিকাবাদিগণ এপর্য্যন্ত যুগল-নক্ষত্রের এই বিশেষত্বটির কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই। কাজেই, তাঁহারা নক্ষত্রের যুগ্মতা-উৎপত্তির যে ব্যাখ্যান দিয়াছিলেন, তাহাতে সাধারণের সন্দেহ উপস্থিত

হইয়াছিল। সম্প্রতি ডাক্তার সি-(See) নামক জনৈক জ্যোতিষী নীহারিকাবাদই অবলম্বন করিয়া যুগল-তারকার ভ্রমণপথের পূর্ব্বোক্ত বিশেষত্বটির কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। চন্দ্রের উৎপত্তি ও গতিসম্বন্ধে অধ্যাপক ডারুউইন যে মতবাদ প্রচার করিয়াছিলেন, বিজ্ঞানজ্ঞ পাঠক তাহা অবশ্যই অবগত আছেন। ডারুউইন্ বলিয়াছিলেন, সেই প্রাথমিক নীহারিকার কোন অংশ খণ্ডিত হইয়াই যে ক্রমে পৃথিবী ও চন্দ্রের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই, কিন্তু চন্দ্রের কুটিলগতি ও উহার আবর্ত্তনের বিশেষত্ব কেবল পৃথিবী ও চন্দ্রের পরস্পর আকর্ষণজাত জোয়ার-ভাঁটা দ্বারাই হইয়াছে। ডাক্তার সি ডারুউইনের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া, কেবল জোয়ার-ভাঁটার সাহায্যে যুগল-তারকার ভ্রমণ-পথের বিশেষত্বটির কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, অধ্যাপক ডারুউইন্ ও ডাক্তার সি উভয়েই যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, গণিতই তাহার মূল অবলম্বন, সুতরাং তাঁহাদের উক্তিতে অবিশ্বাস করা চলে না।

পরিবর্ত্তনশীল তারকার কথা পাঠক শুনিয়া থাকিবেন। এই নক্ষত্র-গুলির উজ্জ্বলতা সকল সময়ে একপ্রকার থাকে না। এক একটি নির্দ্দিষ্ট সময়ের অন্তে এগুলিকে কখন ম্লান ও কখন উজ্জ্বল দেখা যায়। অতি প্রাচীন জ্যোতির্বিদগণও কতকগুলি নক্ষত্রের এই বিশেষত্বটি লক্ষ্য করিয়াছিলেন। পার্সিয়ুস্ (Perseus) রাশিস্থ আলগল (Algol) নামক নক্ষত্রটির পরিবর্ত্তনশীলতার কথা প্রাচীন পারস্যগ্রন্থেও লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু বৈজ্ঞানিকগণ এপর্য্যন্ত এই জ্যোতিষিক ঘটনাটির কারণ নির্ণয় করিতে পারেন নাই, বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে নক্ষত্রগুলির এই অদ্ভুত পরিবর্ত্তন পর্য্যবেক্ষণ করা ব্যতীত তাঁহাদের উপায়ান্তর ছিল না। কিন্তু আধুনিক জ্যোতির্বিদগণ যুগল-তারকাকেই এই দীপ্তিবৈচিত্র্যের কারণস্বরূপ উল্লেখ করিতেছেন। ইঁহারা বলিতেছেন,—আমরা এপর্য্যন্ত যতগুলি পরিবর্ত্তনশীল

তারকা আবিষ্কার করিয়াছি, তাহাদের প্রত্যেকেই যুগল-নক্ষত্রশ্রেণীভুক্ত ; ইহাদের সহচরগুলি তাপবিকিরণ দ্বারা কালক্রমে অনুজ্জ্বল হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া দূরবীণে উহাদের যুগ্মতা ধরা পড়ে না। অনুজ্জ্বল হইয়া পড়ায় উহাদের গতির কোন অপচয় হয় নাই, তাহাদের প্রত্যেককেই ঠিক পূর্ব্ববৎ সহচরের চারিদিকে আজও ঘুরিয়া বেড়াইতে হইতেছে। জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ বলিতেছেন,—এই অনুজ্জ্বল বৃদ্ধনক্ষত্রগুলি প্রদক্ষিণ করিতে করিতে যখন তাহাদের উজ্জ্বল সহচর ও পৃথিবীর মাঝে আসিয়া ঠিক একসূত্রে অবস্থান করে, তখন অনুজ্জ্বল নক্ষত্রটির দেহে উজ্জ্বল নক্ষত্র আচ্ছাদিত হইয়া যায় ; কাজেই, আমরা তৎকালে আচ্ছন্ন নক্ষত্রটিকে ম্লানতর দেখি। কিন্তু ইহার এই মলিনতা অধিককাল স্থায়ী হইতে পারে না, কারণ যথাকালে বৃদ্ধনক্ষত্রটির দেহান্তরাল হইতে মুক্তিলাভ করিলেই সে আবার পূর্ব্বজ্যোতি ফিরিয়া পায়।

গ্রহের বাষ্পমণ্ডল

রাক্ষসপুরীর যে মহলে প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল, আমাদের শৈশব-উপন্যাসের বন্দী রাজপুত্রকে বার বার তাহারই সিংহদ্বারে আঘাত দিতে দেখিয়াছি। প্রকৃতিদেবী তাঁহার সৃষ্টির সকল মহলে বৈজ্ঞানিকদিগকে প্রবেশ করিতে দেন নাই। আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের নজর এখন তাহাদেরই উপর বিশেষভাবে পড়িয়াছে। ইঁহারা উপন্যাসের রাজপুত্রের ন্যায়ই ঐ সকল রহস্যপুরীর সিংহদ্বারে এখন বৃথা আঘাত দিতেছেন। যে তপস্যা, যে সাধনার ফলে প্রকৃতি স্বহস্তে দ্বার উন্মোচন করিয়া দেন, বোধ হয়, আজও তাহা পূর্ণ হয় নাই। এখনো অনেক মহলের দ্বারই রুদ্ধ। যাহা হউক, বহু দূরে থাকিয়া বৈজ্ঞানিকগণ সৃষ্টির যে এক অজ্ঞাতপুরীর বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহারই আলোচনা করিব।

পৃথিবী নানা পরিবর্ত্তনের মধ্যে থাকিয়া এখন যেমন বিচিত্র প্রাণী ও উদ্ভিদের আবাস-স্থান হইয়া পড়িয়াছে, সৌরজগতের অপর গ্রহ-উপগ্রহের মধ্যে কোনটি সেই প্রকার অবস্থায় উপনীত হইয়াছে কি না, এই প্রশ্নটি লইয়া বৈজ্ঞানিকগণ বহু দিন ধরিয়া আলোচনা করিতেছেন। উপন্যাস-কারের লেখনীও বিষয়টিকে অবলম্বন করিয়া অবিরাম চলিয়াছে। জ্যোতিষি-গণের ত কথাই নাই। ইঁহাদের উৎকট কল্পনা কতদূর পৌঁছিতে পারে, তাহা বৃদ্ধ সিয়াপেরেলি হইতে আরম্ভ করিয়া নবীন লয়েল্-প্রমুখ অনেকেই প্রত্যক্ষ দেখাইয়াছেন। ইঁহাদের আলোচনার কোন অংশ কল্পনাসৃষ্ট এবং কোন্‌টাই বা বিজ্ঞানানুগত, তাহা সত্যই বাছিয়া লওয়া কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মঙ্গলগ্রহকে জীববাসের উপযোগী বলিয়া প্রমাণ করিবার

জন্য লয়েল্ সাহেব যে সকল যুক্তি প্রয়োগ করিতেছেন, সেগুলিকে কখন কখন ফরাসী লেখক জুলস্ ভার্ণের বৈজ্ঞানিক উপন্যাসেরই উপযুক্ত বলিয়া মনে হয়।

সুইডেনের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আরেনিয়স্ সাহেব, অপর গ্রহের আকাশের অবস্থা জীববাসোপযোগী কি না, এই প্রশ্নটি লইয়া সম্প্রতি আলোচনা করিয়াছেন। আমরা বহু দিন ধরিয়া নানা তর্কবিতর্কের আবর্জ্জনা হইতে বিষয়টির যে সারটুকুর সন্ধানে বৃথা চেষ্টা করিয়া আসিতেছিলাম, আরেনিয়স্ সাহেবের কয়েকটি অল্প কথার মধ্যে তাহারই সন্ধান পাইয়াছি। বক্তব্যগুলি ইনি এক পুস্তিকার আকারে মাতৃভাষায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক সার্ হেন্‌রি রস্কো তাহারই এক ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন।

আমরা যে প্রকার জীবের সহিত পরিচিত, তাহাদের জীবনধারণের জন্য চারিদিকে এক বাষ্পমণ্ডল থাকা একান্ত আবশ্যক। পৃথিবীকে ঘেরিয়া অক্সিজেন্, নাইট্রোজেন্ এবং অঙ্গারক বাষ্পের যে গভীর আবরণ রহিয়াছে, তাহাই ইহাকে জীববাসের উপযোগী করিয়াছে। অপর গ্রহে বাষ্পমণ্ডলের অবস্থা কি প্রকার, অধ্যাপক আরেনিয়স্ কেবল তাহা লইয়াই আলোচনা করিয়াছেন। ইউরেনস্, নেপ্‌চুন, শনি এবং বৃহস্পতি এই চারিটি গ্রহ আকারে অত্যন্ত বৃহৎ। সূর্য্য হইতে দূরে থাকিয়াও তাহাদের বিশাল দেহ অদ্যাপি শীতল হয় নাই। হয়ত কোন কোনটি বাষ্পাবস্থাতেই আছে। সুতরাং এগুলি যে জীববাসের উপযোগী নয়, তাহা সহজেই বুঝা যায়। কাজেই, আলোচনা করিতে গেলে বুধ, শুক্র এবং মঙ্গল ব্যতীত অপর কোন গ্রহেরই সংবাদ লওয়া আবশ্যক হয় না।

মঙ্গল ও বৃহস্পতির কক্ষার ভিতরে একজাতীয় অসংখ্য ক্ষুদ্র গ্রহ

(Asteroids) বিচরণ করে। ইহারা সংখ্যায় যেমন অধিক, আকারে সেই প্রকার ছোট। এপর্য্যন্ত প্রায় হাজারটি ক্ষুদ্র গ্রহের আবিষ্কার হইয়াছে, কিন্তু কোনটিকেই আমাদের চন্দ্র অপেক্ষা বৃহত্তর দেখা যায় নাই। অধিকাংশেরই ব্যাসের পরিমাণ কুড়ি মাইলের অধিক নয়। কাজেই, তাপ বিকিরণ করিয়া এই সকল জ্যোতিষ্ক যে বহু দিন পৃথিবীর ন্যায় কঠিন ও শীতল হইয়া পড়িয়াছে, তাহা মানিয়া লওয়া যাইতে পারে! কিন্তু শীতল ও কঠিন হইলেই গ্রহে বাষ্পমণ্ডল থাকিবে, ইহা স্বীকার করা যায় না। লঘু বায়বীয় জিনিসের অণুগুলি সর্ব্বদাই বিচ্ছিন্ন হইয়া দূরে যাইবার চেষ্টা করে। কোন এক প্রবল আকর্ষণ যদি ইহাদের সকলকে টানিয়া না রাখে, তবে কোন বাষ্পকে সীমাবদ্ধ স্থানে রাখা যায় না। পৃথিবীর দেহের গুরুত্ব বড় অল্প নয়। তাই মাধ্যাকর্ষণ দ্বারা বাধা পাইয়া আমাদের আকাশের বাষ্পগুলি আজও পৃথিবী ত্যাগ করে নাই। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ক্ষুদ্র গ্রহগুলি আকারে ও গুরুত্বে পৃথিবীর তুলনায় খুবই তুচ্ছ। কাজেই, সেগুলি বাষ্পরাশিকে টানিয়া রাখিয়া যে জীবের বাসোপযোগী হইবে, তাহা কখনই বিশ্বাস করা যায় না।

সুতরাং বুধ, শুক্র এবং মঙ্গলগ্রহ ব্যতীত আমাদের পরিচিত কোন সৌরজ্যোতিষ্কে জীবের অস্তিত্ব কখনই সম্ভবপর নয়।

প্রথমে বুধগ্রহের কথা আলোচনা করা যাউক। পাঠক যদি গ্রহদিগকে চিনিয়া লইয়া একবার ভাল করিয়া তাহাদিগকে দেখেন, তবে সকলকে সমান উজ্জ্বল দেখিবেন না। শুক্র যখন শুকতারার বা সান্ধ্যতারার আকারে আকাশে দেখা দেয়, তখন সেটিকে যত উজ্জ্বল দেখায়, বুধ, বৃহস্পতি, মঙ্গল বা শনি কাহাকেও সে প্রকার দেখা যায় না। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে শুক্রের আলোক-প্রতিফলন-ক্ষমতা

চন্দ্রের প্রায় ছয় গুণ। বুধ, আলোক-প্রতিফলনে আমাদের চন্দ্রেরই অনুরূপ। জ্যোতিষিগণ আজকাল এই আলোক পরিমাপ করিয়া, গ্রহগণের প্রাকৃতিক অবস্থা কতকটা অনুমান করিয়া লইতেছেন। যে সকল গ্রহ বাষ্পমণ্ডলে আবৃত থাকে, সেগুলিকে বাষ্পহীন গ্রহ অপেক্ষা অনেক অধিক আলোক-প্রতিফলন করিতে দেখা যায়। বুধের স্বাভাবিক ম্লানতা লক্ষ্য করিয়া আরেনিয়স্ সাহেব ইহাকে বায়বীয়-পদার্থবর্জ্জিত বলিতে চাহিতেছেন।

বুধের বাষ্পহীনতার ইহাই একমাত্র প্রমাণ নয়। গুরুত্ব অবলম্বনে হিসাব করিতে বসিলেও ঐ সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে হয়। আমাদের চন্দ্রটি যে বাষ্পবর্জ্জিত, তাহাতে আর এখন অণুমাত্র সন্দেহ নাই। ইহার ক্ষুদ্র এবং লঘু দেহ কোন বাষ্পকে টানিয়া রাখিতে পারে নাই। বুধের গুরুত্ব চন্দ্রের দেড় গুণ মাত্র, সুতরাং এই গুরুত্ব লইয়া এটি যে কোন বাষ্পকে নিজের চারিদিকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিয়াছে, তাহা মনে হয় না।

আমাদের পৃথিবী প্রায় চব্বিশ ঘণ্টাকালে এক পূর্ণাবর্ত্তন (Rotation) শেষ করে। সুতরাং মোটামুটি হিসাব করিলে দেখা যায়, যে এক বৎসর কালে ইহা একবার সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া আসে, সেই সময়ে সে নিজে নিজে তিনশত পঁইষট্টি বার ঘুরপাক্ খায়। চন্দ্র পৃথিবীরই উপগ্রহ। পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ান ইহার কাজ। প্রায় আটাশ দিনে যখন সে একবার মাত্র ধরা প্রদক্ষিণ করে, তখন নিজে একবারের অধিক আবর্ত্তন করিতে পারে না। ইহারই ফলে, চন্দ্রের সেই শশলাঞ্ছিত একটা দিকই সর্ব্বদা পৃথিবীর দিকে উন্মুক্ত থাকে। আধুনিক জ্যোতিষিগণ বড় বড় দূরবীণের সাহায্যে বুধ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ইহার গতিবিধিকে ঠিক চাঁদেরই মত দেখিতে পাইয়াছেন। কাজেই, বলিতে হয়, এখন বুধের একটা দিকেই সূর্য্যের

তাপালোকের রশ্মি অজস্র আসিয়া পড়িতেছে। অপর দিক্‌টা ঘোর তমসাচ্ছন্ন এবং অসম্ভব শীতল।

পূর্ব্বোক্ত ব্যাপারগুলির আলোচনা করিয়া আরেনিয়স্ সাহেব বলিতেছেন, বুধ গ্রহটি তাহার ক্ষীণ আকর্ষণের সাহায্যে যদি কোন গুরুবাষ্পকে আট্‌কাইয়া রাখিয়া থাকে, তবে তাহা অন্ধকারাচ্ছন্ন দিকের শীতে কখনই বাষ্পাকারে নাই। হেলিয়ম্ ও হাইড্রোজেন্ ব্যতীত অপর কোন বাষ্পই বুধের শীতে জমাট না বাঁধিয়া থাকিতে পারে না। আমাদের পৃথিবী তাহার বিশাল দেহের সমস্ত বল প্রয়োগ করিয়াও ঐ দুই লঘু বাষ্পকে বায়ুমণ্ডলে রাখিতে পারে নাই। সুতরাং ক্ষুদ্রদেহ বুধে যে ঐ দুই বাষ্প নাই, তাহা সুনিশ্চিত।

শুক্রগ্রহটি আমাদের অতি নিকটে অবস্থিত। ইহার সূর্য্য প্রদক্ষিণ কাল স্থির আছে, কিন্তু আবর্ত্তনকালটি আজও ঠিক জানা যায় নাই। আজকাল অনেক জ্যোতিষী বলিতেছেন, বুধ ও চন্দ্র যেমন এক পূর্ণ-প্রদক্ষিণ-কালে নিজে একবারমাত্র আবর্ত্তিত হয়, শুক্রও ঠিক সেই প্রকারে নিজের চারিদিকে ঘুরিতেছে। এ কথা সত্য হইলে বলিতে হয়, বুধের ন্যায় ইহারও কেবল একটা দিকে সূর্য্যের তাপালোক পড়ে, এবং অপর দিক্‌টা তাপাভাবে ভয়ানক শীতল অবস্থায় থাকিয়া যায়। এ প্রকার ঘোর শীতে কোন তরল বা বায়বীয় পদার্থ জমাট না বাঁধিয়া থাকিতে পারে না। কাজেই, এই হিসাবে শুক্রের বাষ্পমণ্ডল নাই, ইহাই সিদ্ধান্ত হয়।

অধ্যাপক আরেনিয়স্ এই সিদ্ধান্তে সাধারণ জ্যোতিষীদিগের সহিত একমত হইতে পারেন নাই। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে সকল গ্রহের উপরে বাষ্পমণ্ডল থাকে, সূর্য্যের আলোক অধিক প্রতিফলন করিয়া সেগুলি খুব উজ্জ্বল হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু উজ্জ্বলতায় কোন

গ্রহই শুক্রের সমকক্ষ নয়। কাজেই, আরেনিয়স্ সাহেব উহাকে একেবারে বাষ্পবর্জ্জিত বলিয়া স্বীকার করিতে পারিতেছেন না। ইঁহার মতে শুক্র সম্ভবতঃ আমাদের পৃথিবীরই মত গভীর বাষ্পাবরণে মণ্ডিত আছে এবং চব্বিশ ঘণ্টায় পূর্ণাবর্ত্তন শেষ করিয়া সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে। আজকাল জ্যোতিষিগণ শুক্রের যে দীর্ঘ আবর্ত্তন-কালের কথা প্রচার করিতেছেন, তাহাতে ইনি সম্মতি দিতে পারেন নাই।

মঙ্গলের আকাশের অবস্থা সম্বন্ধে আরেনিয়স্ সাহেব বিশেষ আলোচনা করেন নাই। আজ পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া মঙ্গল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, ইহাতে যে সকল লক্ষণ দেখা গিয়াছে, তাহাতে ইহার বাষ্পাবরণের অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। শীত ঋতুতে মঙ্গলের দুই মেরুতে দুইটি শ্বেত-চিহ্ন প্রকাশ হইয়া পড়ে। তার পর যখন মঙ্গলে গ্রীষ্মকাল উপস্থিত হয়, সে দু'টিকে আর দেখা যায় না। জ্যোতিষিগণ ঐ শ্বেত-বিন্দুকে মেরুদেশে সঞ্চিত তুষার বলিতে চাহিতেছেন। এই অনুমান সত্য হইলে মঙ্গলে বাষ্পের অস্তিত্বও স্বীকার করিয়া লইতে হয়। জলীয় বাষ্প না থাকিলে কোন এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে নিয়মিত কালে বরফ জমিতে পারে না।

গ্রহে বাষ্প থাকিলেই হয় না। কোন্ বাষ্প কি পরিমাণে আছে, স্থির করিয়া, পরে সেগুলি প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবন রক্ষার অনুকূল কি না, বিচার করা কর্ত্তব্য। আমাদের আকাশে অক্সিজেন্, নাইট্রোজেন্ এবং অঙ্গারক বাষ্প যে পরিমাণে মিশ্রিত আছে, তাহা কখনই একটি নির্দ্দিষ্ট অনুপাতকে অতিক্রম করে না। অনুপাতে কোনটির পরিমাণ একটু কমিয়া বা বাড়িয়া গেলে, এই বায়ুই জীবনরক্ষার অনুপযোগী হইয়া পড়ে। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে আমরা যে সকল সামগ্রী খুঁজিয়া পাই, চিরদিনই যে তাহাতে এগুলি ছিল না, তাহার প্রচুর প্রমাণ আছে।

যুগে যুগে নানা পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া আমাদের আকাশ এখন এত নির্ম্মল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জীবতত্ত্ববিদ্‌গণকে জিজ্ঞাসা কর, তাঁহারাও বলিবেন, সৃষ্টির প্রথমে প্রাণী বা উদ্ভিদ্ কেহই বর্ত্তমান আকার লইয়া ভূতলে জন্মগ্রহণ করে নাই ; যেমন আকাশ ও মাটির পরিবর্ত্তন চলিয়াছে, জীবগণও সেই সকল পরিবর্ত্তনের সহিত সুর মিলাইয়া ক্রমোন্নতির দিকে ধাবমান হইয়াছে। উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর বর্ত্তমান আকার-প্রকার যুগ-যুগান্তের অনেক পরিবর্ত্তনের ফল। সুতরাং গ্রহে জীব আছে কি না, স্থির করিতে হইলে, তাহার বাষ্প-মণ্ডলের অবস্থার বিষয়টা সর্ব্বাগ্রে অনুসন্ধান করা আবশ্যক হইয়া পড়ে।

নীহারিকাবাদকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিলে বলিতে হয়, সৌর-জগতের সকল জ্যোতিষ্কেরই গঠনোপাদান এক। প্রত্যেক উপাদানের পরিমাণ সকল জ্যোতিষ্কে সমান না থাকিতে পারে, কিন্তু আমাদের পৃথিবী যে যে পদার্থ দিয়া প্রস্তুত, সেগুলিই যে অল্পাধিক পরিমাণে একত্র হইয়া সৌরজগতের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা নিশ্চিত। সুতরাং পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ক্রমিক পরিবর্ত্তনের একটা পর্য্যায় স্থির করিয়া, অপর গ্রহগুলি সেই সকল পর্য্যায়ের কোন্ কোন্‌টিতে পড়ে, তাহা স্থির করা ব্যতীত গ্রহের অবস্থা নির্ণয়ের আর অন্য উপায় দেখি না। বলা বাহুল্য, সৃষ্টির আদিতে এক জলন্ত নীহারিকারাশি হইতে আমাদের পৃথিবী যেদিন পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছিল, তখন তাহার বায়ুমণ্ডল ছিল না। কালক্রমে ধরা শীতল হইয়া পড়িলে চারিদিকে যখন একটা কঠিন আবরণ জমাট বাঁধিয়াছিল, বোধ হয় তখনি ভূগর্ভ হইতে হাইড্রোজেন্ ও অঙ্গারক বাষ্প উপরে উঠিয়া এক বাষ্পমণ্ডলের রচনা করিয়াছিল। ইহাই আমাদের প্রাথমিক আকাশ। বায়ুমণ্ডলের এই অবস্থা কত বৎসর ছিল, হিসাব করা যায় না। কিন্তু বহু লক্ষ বৎসর পরে ভূপৃষ্ঠে উদ্ভিদ্ জন্মগ্রহণ করিলে, তাহারই দেহের হরিদ্-

কণার (Chlorophyl) স্পর্শে নীচেকার অঙ্গারক বাষ্প বিশ্লিষ্ট হইয়া যে অঙ্গারক ও অক্সিজেনের উৎপত্তি করিয়াছিল, তাহা আমরা অনুমান করিতে পারি। আকাশের উচ্চ প্রদেশে যে আদিম অঙ্গারক বাষ্প ও হাইড্রোজেন্ সঞ্চিত ছিল, এ পর্য্যন্ত সেগুলিকে কেহই স্পর্শ করিতে পারে নাই। অঙ্গারঘটিত বাষ্প ও হাইড্রোজেন সহজেই অপর জিনিসের সহিত মিশিয়া যায়। নীচের অক্সিজেন উপরে উঠিয়া, উচ্চস্তরে সঞ্চিত ঐ দুই বাষ্পকে সম্ভবতঃ নানা প্রকারে রূপান্তরিত করিয়াছিল। কাজেই, আকাশে অক্সিজেন্ ও নাইট্রোজেন্ ছাড়া অপর কোন বাষ্প অবিকৃত থাকিতে পারে নাই। নাইট্রোজেন্ অপর জিনিসের সহিত সহজে মিশ্রিত হয় না, নচেৎ এই বায়ুকেও আমরা আকাশে দেখিতে পাইতাম না।

বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, আমাদের বায়ুমণ্ডলের পূর্ব্বোক্ত অবস্থাতেই ভূপৃষ্ঠে প্রাণীর জন্ম হইয়াছিল। এখন আকাশে যে অঙ্গারক বাষ্প ও জলীয় বাষ্প দেখা যায়, তাহা পৃথিবীর আদিম বায়ুমণ্ডলের সামগ্রী নয়। সময় সময় আভ্যন্তরীণ আগ্নেয় উপদ্রবে এই দুই বাষ্প ভূগর্ভ হইতে প্রচুর পরিমাণে উত্থিত হইত। তাহারই অবশেষ এখন বায়ুমণ্ডলে বর্ত্তমান। নদী, সমুদ্র সকলই সেই জলীয় বাষ্প দ্বারাই উৎপন্ন হইয়াছে।

অধ্যাপক আরেনিয়স্ বলিতেছেন, সম্ভবতঃ শুক্রগ্রহের বায়ুমণ্ডলের অবস্থা পৃথিবীরই অনুরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বর্ত্তমান অবস্থা কখনই চিরস্থায়ী নয়। এমন দিন নিশ্চয়ই আসিবে যখন ভূপৃষ্ঠের সমস্ত জল এবং অঙ্গারক বাষ্প একত্রে মিলিয়া নীরস মর্ম্মরশিলায় (Calcium Carbonate) পরিণত হইবে, এবং গভীর সমুদ্রগুলি মৃত্তিকাপূর্ণ হইয়া এক একটা মরুভূমির আকার ধারণ করিবে। আজও, যে দুই চারিটি আগ্নেয়গিরির উৎপাতে বায়ুমণ্ডলে নূতন জলীয় বাষ্প ও অঙ্গারক বাষ্প আসিয়া মিশিতেছে, তখন তাহারা

আর অগ্নি উদ্গিরণ করিবে না। কাজেই, বায়ুমণ্ডল ক্রমে শূন্য হইয়া যাইবে। অধ্যাপক আরেনিয়স্ বলিতেছেন, মঙ্গলগ্রহটির বায়ুমণ্ডল সম্ভবতঃ এই প্রকারে শূন্য হইয়া পড়িয়াছে। অঙ্গারক বাষ্পের অভাবে এখন উহাতে আর উদ্ভিদ্ জন্মিতেছে না। কাজেই, অক্সিজেনেরও অভাব হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্বে মঙ্গলের আকাশে যে অক্সিজেন ছিল, এখন তাহার চিহ্নমাত্র থাকার সম্ভাবনা নাই। উহা নাইট্রোজেন্ ও লৌহাদি ধাতুর সহিত মিশিয়া নানাপ্রকার নাইট্রাইট্ ও অক্সাইড্ প্রস্তুত করিয়া নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। আমাদের চন্দ্র এবং বৃহস্পতি ও শনির বড় বড় উপগ্রহগুলি, বহুকাল হইল, এই অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। মঙ্গল ইহাতে পদার্পণ করিয়াছে মাত্র।

চৌম্বক ঝটিকা

সেদিন সংবাদপত্রে পড়িতেছিলাম, রয়টার সংবাদ দিয়াছেন গত ২৫শে সেপ্টেম্বর (১৯১০) তারিখে সমগ্র য়ুরোপ এবং আমেরিকা জুড়িয়া একটা বৃহৎ চুম্বকের ঝড় বহিয়া গিয়াছে। তার পরদিনের কাগজে প্রকাশ হইল, আমাদের ভারতবর্ষও সেই ঝটিকার হাত হইতে উদ্ধার পায় নাই

সমগ্র ভারতবর্ষের মাথার উপর দিয়া এমন একটা প্রকাণ্ড ঝড় বহিয়া গেল, জানিতে পারিলাম না। পরদিন সংবাদপত্র পড়িয়া ঝড়ের বিবরণ সংগ্রহ করিতে হইল। বড়ই আশ্চর্য্যের কথা।

ঝড়ের বিশেষ বিবরণ সংগ্রহ করিতে গিয়া জানিতে পারিলাম, গত ২৫শে সেপ্টেম্বর বেলা সাড়ে পাঁচটার সময় কলিকাতা অঞ্চলে ঝড় আরম্ভ হয় এবং রাত্রি আটটা পর্য্যন্ত প্রবলবেগে বহিয়া ক্রমে কমিতে আরম্ভ করে। রাত্রি চারিটার পর ঝড়ের আর চিহ্ন দেখা যায় নাই। ঝড়টা নাকি ভয়ানক প্রবলবেগে বহিয়াছিল। বৈকাল হইতে রাত্রি এগারটা পর্য্যন্ত কলিকাতার বড় টেলিগ্রাফ্-অপিসের কাজকর্ম্ম একেবারে বন্ধ করিতে হইয়াছিল। বার বার চাবি টেপা সত্ত্বেও টেলিগ্রাফের বৈদ্যুতিক যন্ত্রে সাড়া পাওয়া নাই। বিদেশ হইতে মহাজনগণ এবং গবর্ণমেণ্ট যে সকল টেলিগ্রাম পাইবার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, এই বিভ্রাটে সেগুলি আসিয়া পৌঁছায় নাই। দৈনিক সংবাদপত্রগুলির সম্পাদক এবং ব্যবসায়ী-দল ঝটিকার উৎপাতে হাহাকার আরম্ভ করিয়াছিলেন। অথচ পর্ণ-কুটীরশায়ী ভিক্ষুক এবং নিরাশ্রয় পথিকের গাত্রে ঝটিকার হাওয়াটুকু পর্য্যন্ত লাগে নাই।

চৌম্বক ঝড়ের পূর্ব্বোক্ত বিবরণ হইতে পাঠক নিশ্চয়ই বুঝিয়াছিলেন,

এই ঝড় বায়ুর ঝড় নয়, কোন প্রকার বৈদ্যুতিক ব্যাপার ইহার সহিত জড়িত আছে। তাহা না হইলে তারের খবরের যাওয়া-আসা বন্ধ হয় কেন? ব্যাপারটা তাহাই বটে।

চৌম্বক ঝটিকার (Magnetic Storm) বিষয়টা বুঝিতে হইলে, প্রথমে পৃথিবীর চৌম্বক শক্তির এক পরিচয় গ্রহণ আবশ্যক।

চুম্বক-শলাকাযুক্ত কম্পাস্ পাঠক অবশ্যই দেখিয়াছেন। ইহার কাঁটাটিকে খুব এলোমেলো রকমে ঘুরাইয়া দিলেও তাহা শেষে উত্তরদক্ষিণ-মুখী হইয়া দাঁড়ায়। বৈজ্ঞানিকগণ চুম্বক-শলাকার এই অত্যাশ্চর্য্য ধর্ম্মটির উৎপত্তিতত্ত্ব বিচার করিতে গিয়া, আমাদের পৃথিবীটিকে একটি বৃহৎ চুম্বক বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। এই প্রকাণ্ড চুম্বকটির দুই প্রান্ত পৃথিবীর উত্তর এবং দক্ষিণ মেরুর নিকটবর্ত্তী দুইটি স্থলে অবস্থিত। একটা বড় চুম্বকের নিকট সাধারণ কম্পাসের কাঁটাকে লইয়া গেলে, তাহার উত্তরদিগ্‌গামী (North Pole) প্রান্তটি চুম্বকের দক্ষিণদিগ্‌গামী প্রান্তে (South Pole) আসিয়া দাঁড়ায়। সুতরাং পৃথিবীর ন্যায় একটা বড় চুম্বক যখন কম্পাসের কাঁটার উপর কাজ করিতে আরম্ভ করে, তখন কাঁটাটি যে, পৃথিবীর চৌম্বক শক্তির টানে উত্তর-দক্ষিণ-মুখী হইয়া দাঁড়াইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি?

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, আমাদের জলস্থল এবং শিলাকঙ্করময় ধরাখানিকে বৈজ্ঞানিকগণ যে, একটা বৃহৎ চুম্বক বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেন, তাহার মূলে কি কোন যুক্তি নাই? প্রাচীন ও আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ পৃথিবীর চুম্বকত্বের নানা প্রকার প্রমাণ দিয়া এই প্রশ্নটির উত্তর দিয়াছেন। আমরা এখানে কেবল আম্‌পিয়ার সাহেবের প্রসিদ্ধ সিদ্ধান্তের উল্লেখ করিব। এটি বুঝিতে হইলে বিদ্যুৎপ্রবাহ এবং চুম্বকের মধ্যে যে একটা অতি গূঢ় সম্বন্ধ আছে, তাহা মনে রাখা আবশ্যক হইবে।

বিজ্ঞানজ্ঞ পাঠক অবশ্যই দেখিয়াছেন, লৌহদণ্ডের চারিদিকে তার জড়াইয়া, সেই তারের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎপ্রবাহ চালাইতে থাকিলে, লৌহদণ্ড চুম্বকের গুণ প্রাপ্ত হয়। এই অবস্থায় তাহার নিকট লৌহময় ক্ষুদ্র বস্তু রাখিলে ঐ তার-জড়ানো লোহাটি সাধারণ চুম্বকের ন্যায় জিনিসটিকে সবলে আকর্ষণ করিতে থাকে। সাধারণ লৌহে এই চৌম্বক ধর্ম্ম স্থায়ী হয় না। বিদ্যুৎ-প্রবাহ রোধ করিবামাত্র, লৌহদণ্ডের চুম্বক-ধর্ম্ম নিমিষে লোপ পাইয়া যায়।

বিদ্যুৎ এবং চুম্বকত্বের পূর্ব্বোক্ত সম্বন্ধটিকে অবলম্বন করিয়া আম্‌পিয়ার সাহেব বলেন, পৃথিবীর উপর দিয়া পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম দিকে সর্ব্বদাই এক বিদ্যুৎ-প্রবাহ চলিতেছে। লোহার চারিদিকে জড়ানো তারের বিদ্যুৎ যেমন লোহাকে চুম্বক করিয়া তোলে, এখানে ভূপৃষ্ঠের সেই পশ্চিমবাহী প্রবাহ পৃথিবীকে একটা প্রকাণ্ড চুম্বক করিয়া তুলিতেছে। এই চুম্বকের দুই প্রান্ত উত্তর এবং দক্ষিণ মেরুর সন্নিহিত প্রদেশে রহিয়াছে; কাজেই, কোন চুম্বক-শলাকাকে ঝুলাইয়া রাখিলে সেই বৃহৎ চুম্বকের আকর্ষণে সেটিকে উত্তর-দক্ষিণমুখী হইয়া থাকিতে হয়।

আম্‌পিয়ার সাহেবের পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তটির সত্যতা সম্বন্ধে অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। তাপ যে বিদ্যুতেব উৎপত্তি করে, তাহার শত শত পরীক্ষাসিদ্ধ প্রমাণ বর্ত্তমান। সুতরাং সূর্য্য যখন ভূপৃষ্ঠকে উত্তপ্ত করিতে করিতে পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়, তখন সেই তাপদ্বারা যে ভূতলে পূর্ব্বপশ্চিম-দিগ্‌বাহী এক বিদ্যুৎ-প্রবাহের উৎপত্তি হইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি?

পৃথিবীর সর্ব্বাংশে চৌম্বক শক্তির পরিমাণ সকল সময়ে এক দেখা যায় না। কেবল কয়েক বৎসরের জন্য ভূতলস্থ এক একটি নির্দ্দিষ্ট বক্র রেখার উপরকার স্থানগুলিতে একই প্রকারের চুম্বক শক্তি থাকে। কিন্তু

কালক্রমে ইহার এতই পরিবর্ত্তন হয় যে, পূর্ব্বাপর পরিমাণের মধ্যে কোনই সাদৃশ্য দেখা যায় না। সূর্য্য প্রতিদিন একই অক্ষাংশস্থ (Latitude) স্থানে সমভাবে তাপ বর্ষণ করে, কিন্তু স্থানীয় অবস্থাভেদে সেই তাপই নানা স্থানে নানাপ্রকার হইয়া দাঁড়ায়। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ নদী, সমুদ্র এবং মরু-পর্ব্বতাদির অবস্থানকেই এই বৈচিত্র্যের কারণ বলিয়া স্থির করিয়াছেন এবং ইহারই উপর নির্ভর করিয়া বলিতেছেন, তাপের বৈষম্যে ভূতলে যে বিদ্যুৎ-প্রবাহের পরিবর্ত্তন হয়, তাহা পৃথিবীর চৌম্বক শক্তিরও পরিবর্ত্তন আনয়ন করে।

পূর্ব্বোক্ত সাময়িক পরিবর্ত্তন ছাড়া ভূতলে প্রত্যেক স্থানেই চৌম্বক শক্তির একটা দৈনিক পরিবর্ত্তনও দেখা গিয়া থাকে। পৃথিবীর আহ্নিক এবং বার্ষিক গতিতে, প্রত্যেক স্থানে সৌরতাপের যে পরিবর্ত্তন হয়, তাহাই উহার কারণ বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে।

পৃথিবীর চৌম্বক শক্তির পূর্ব্বোক্ত পরিবর্ত্তনগুলি কতকটা নিয়মানুগত। কোন এক নির্দ্দিষ্ট কালে স্থানবিশেষে তাহার পরিমাণ কি হইয়া দাঁড়াইবে, হিসাব করিয়া পূর্ব্বে তাহার আভাস দেওয়া চলে। কিন্তু ইহা ছাড়া চৌম্বক শক্তির যে এক আকস্মিক এবং অনিয়মিত পরিবর্ত্তন দেখা যায়, তাহার কাল ও পরিমাণ গণনা করিয়া রাখা যায় না। বিজ্ঞানের ভাষায় এই পরিবর্ত্তনগুলিকেই চৌম্বক ঝটিকা বা Magnetic Storms বলা হইয়া থাকে। ইহাদের আবির্ভাবে চৌম্বক-শলাকাগুলি এত বিচিত্র রকমে বিচলিত হইতে আরম্ভ করে যে, তাহাদিগকে চৌম্বক ঝটিকা ব্যতীত আর কিছুই বলা যায় না। অকারণে বৈদ্যুতিক ঘণ্টা বাজাইয়া, টেলিগ্রাফের চৌম্বক ও বৈদ্যুতিক যন্ত্রগুলিকে বিকৃত করিয়া এবং কম্পাসের কাঁটাকে বাঁকাইয়া এগুলি সত্যই ঝড়ের ন্যায় এক ভীষণ ব্যাপার বাধাইয়া তোলে। টেলিগ্রাফের তারে হঠাৎ এমন এক একটি বিদ্যুৎ-প্রবাহ আপনা

হইতে ছুটিতে আরম্ভ করে যে, সিগ্‌নলার প্রাণপণে চাবি টিপিয়াও সংবাদ আদান-প্রদান করিতে পারে না!

ঝড়বৃষ্টি, ভূমিকম্প প্রভৃতি যে সকল প্রাকৃতিক ব্যাপার অনিয়মিত বলিয়া প্রসিদ্ধ, আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে তাহাদের সংঘটনকালের মধ্যে কোন সুনির্দ্দিষ্ট নিয়ম আবিষ্কার করিতে পারা যায় নাই। কিন্তু এগুলির উৎপত্তির কারণ এখন আর কাহারো নিকট অজ্ঞাত নাই। আশ্চর্য্যের বিষয়, কোন বৈজ্ঞানিকই অদ্যাপি চৌম্বক ঝটিকার উৎপত্তির কোন সুসঙ্গত কারণ দেখাইতে পারেন নাই। ভূতলের উপর দিয়া সর্ব্বদাই যে পূর্ব্ব-পশ্চিমমুখী বৈদ্যুতিক প্রবাহ চলিতেছে, তাহাই যখন চৌম্বক শক্তির কারণ, তখন সেই প্রবাহেরই কোন এক পরিবর্ত্তন যে, চৌম্বক ঝটিকার উৎপত্তি করে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি। কিন্তু এই প্রবাহ-পরিবর্ত্তনের কারণটা যে কি, তাহা বহু চেষ্টাতেও অদ্যাপি জানা যায় নাই। মেরুসন্নিহিত প্রদেশে আরোরার (Aurora) উদয় হইলে এবং সূর্য্যমণ্ডলে সৌরকলঙ্ক (Sun Spots) দেখা দিলে চৌম্বক ঝটিকার উৎপত্তি হয়। কিন্তু সৌরকলঙ্ক ও আরোরার সহিত চৌম্বক ঝটিকা যে সূত্রে সম্বন্ধ, আজও তাহার সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

সুপ্রসিদ্ধ হ্যালির ধূমকেতুটি পঁচাত্তর বৎসরে সূর্য্যপ্রদক্ষিণ শেষ করিয়া ১৯১০ সালের শীতের শেষে পৃথিবীর আকাশে উদিত হইয়াছিল। জনৈক বৈজ্ঞানিক বলিতেছেন, গত ২৫শে সেপ্টেম্বরের চৌম্বক ঝটিকা সেই বৃহৎ ধূমকেতুরই আগমন সূচনা করিয়াছিল। কিন্তু ধূমকেতুর সহিত ঝটিকার সম্বন্ধ কোথায়, তাহা তিনি নির্দ্দেশ করেন নাই। ঐ বৎসরের ২৮শে সেপ্টেম্বর মঙ্গলগ্রহ আমাদের পৃথিবীর অতি নিকটবর্ত্তী হইয়াছিল। অনেকে এই জ্যোতিষিক ঘটনাটিকে চৌম্বক ঝটিকার সহিত জড়াইতে চাহিতেছেন। বলা বাহুল্য, এইসকল আনুমানিক ব্যাপারের উপর

কোন সিদ্ধান্ত দাঁড় করানো চলে না। কাজেই বলিতে হয়, চৌম্বক ঝটিকার ন্যায় একটা সুস্পষ্ট এবং সুপরিচিত প্রাকৃতিক ব্যাপার আজও অব্যাখ্যাত থাকিয়া আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগের কলঙ্কস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে।

প্রকৃতি-পরিচয়

ঈথর

বাজিকর দূরে দাঁড়াইয়া যখন দুর্ব্বোধ্য মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে তাহার পুতুলগুলিকে নাচাইতে থাকে, তখন দর্শকমাত্রেরই মনে বিস্ময়ের সঞ্চার হয়। বলা বাহুল্য, মন্ত্রের আশ্চর্য্য শক্তির উপর বিশ্বাস করিয়া বিস্ময়ের উদয় হয় না; সহস্র চক্ষুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিকে এড়াইয়া বাজিকর যে কৌশলে লুক্কায়িত তারগুলিকে টানিয়া ভেল্কি দেখাইতেছে, দর্শক তাহারি কথা মনে করিয়া বিস্মিত হন।

এইপ্রকার ভেল্কি ব্যতীত অনেক ভেল্কি প্রতিদিনই আমাদের নজরে পড়িতেছে। আমরা কোন অতিপ্রাকৃত কারণ নির্দ্দেশ করিয়া তাহা ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করি না। প্রকৃতির শক্তি যখন নানা জটিলতার ভিতর দিয়া বিচিত্র আকারে আমাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায়, তখন কেবল মূর্ত্তি দেখিয়া তাহাকে প্রকৃতির দূত বলিয়া চেনা, সত্যই কঠিন হইয়া পড়ে। কিন্তু এপ্রকারে ছদ্মবেশ অধিক দিন ভুলাইয়া রাখিতে পারে না। যে অতিসূক্ষ্ম তার টানিয়া প্রকৃতি দেবী ভেল্কি দেখাইয়া থাকেন, তাহা শেষে ধরা পড়িয়া যায়।

ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল ঐ প্রকার কতকগুলি প্রাকৃতিক ভেল্কির কারণ নির্দ্দেশ করিবার জন্য গবেষণা আরম্ভ করিয়াছিলেন। বহু দূরে অবস্থিত দুই পদার্থ কিপ্রকারে পরস্পরকে আকর্ষণ করে, এবং কোটি কোটি যোজন দূরবর্ত্তী জ্যোতিষ্কের তাপালোক কাহাকে অবলম্বন করিয়া ছুটাছুটি করে, ইহা স্থির করাই গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল। তিনি এই সকল বিষয় অবলম্বনে যে একটি জ্ঞানগর্ভ ও নবতত্ত্বপূর্ণ নিবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহা আজও অতুলনীয় হইয়া রহিয়াছে।

দূরে দাঁড়াইয়া কোন বস্তুকে সচল করিতে হইলে, একটা সংযোজক পদার্থের একান্ত প্রয়োজন। ইহাকে অবলম্বন করিয়াই চালক বস্তুকে সচল করে। শিলাখণ্ডকে নড়াইতে হইলে আমরা তাহাতে রজ্জু বাঁধিয়া টানি; কিংবা বংশদণ্ড দিয়া তাহাকে ঠেলিতে আরম্ভ করি। শরীরের বল ঐ সংযোজক রজ্জু বা বংশখণ্ডকে অবলম্বন করিয়া শিলায় পৌঁছিলে, সেটি স্থানভ্রষ্ট হয়। মহাশূন্যের জ্যোতিষ্কগুলি যে, পরস্পরকে আকর্ষণ করে, তাহাতে আর মতদ্বৈধ নাই। ইহা কেবল বৃহৎ জড়পিণ্ডেরই ধর্ম্ম নয়, শত সূর্য্যোপম বৃহৎ নক্ষত্র হইতে আরম্ভ করিয়া সূক্ষ্ম ধূলিকণা-পর্য্যন্ত সকলেই আকর্ষণধর্ম্মী। জড় কিপ্রকারে পরস্পরের মধ্যে আকর্ষণ পরিচালনা করে, তাহা স্থির করিবার জন্য এপর্য্যন্ত প্রাচীন ও আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ অনেক গবেষণা করিয়া আসিতেছেন। কোন বিষয় লইয়া একাধিক ব্যক্তি গবেষণা করিতে থাকিলে, প্রায়ই মতের অনৈক্য দেখা দেয়; কিন্তু এই ব্যাপারে সকলে একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। যখন বহুদূরবর্ত্তী হইয়াও পদার্থ সকল পরস্পরকে টানাটানি করে, তখন কোন এক অতীন্দ্রিয় পদার্থে সমস্ত ব্যবধান পূর্ণ আছে বলিয়া অনেকেরই বিশ্বাস হইয়াছিল এবং দূরবর্ত্তী পদার্থগুলিকে এই অতীন্দ্রিয় বস্তুই সংযুক্ত রাখে বলিয়া তাঁহারা অনুমান করিয়াছিলেন।

কোন জিনিসের এক অংশ ধরিয়া টানিলে সমগ্র জিনিসটাতে টান পড়ে; ইহাও একটা অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার। পদার্থের গঠনের খবর জানিতে চাহিলে, বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, বস্তুমাত্রই অণুময় এবং অণুগুলি এপ্রকার ভাবে সুসজ্জিত যে, কেহ কাহাকেও স্পর্শ করিয়া থাকে না; অর্থাৎ অণুগুলির মধ্যে বেশ একটু বিচ্ছেদ থাকিয়া যায়। এইপ্রকার সুস্পষ্ট বিচ্ছেদ থাকা সত্ত্বেও, কতক অণুকে টানিতে থাকিলে তাহাদের সহিত অপর অণুগুলির সঞ্চলন হয় কেন, তাহা বাস্তবিকই চিন্তার বিষয়। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ এই ব্যাপারটিরও মীমাংসার জন্য অনেক গবেষণা করিয়াছিলেন, এবং শেষে সিদ্ধান্ত হইয়াছিল, মালার পুষ্পগুলি যেমন বিচ্ছিন্ন থাকিয়া সূক্ষ্ম সূত্রের বন্ধনে আবদ্ধ থাকে, পদার্থের বিচ্ছিন্ন অণুগুলিও সেই প্রকারে কোন এক সংযোজক পদার্থ দ্বারা পরস্পরের সহিত যুক্ত আছে। আমরা যখন বলপ্রয়োগ করিয়া লৌহশলাকাকে বাঁকাইতে আরম্ভ করি, তখন ঐ সংযোজক পদার্থই টান পাইয়া বাঁকিতে আরম্ভ করে এবং তাহারি সঙ্গে আবদ্ধ অণুগুলি স্থানভ্রষ্ট হইয়া পড়ে।

যে অতীন্দ্রিয় পদার্থটি এই প্রকারে অণুর অবকাশে থাকিয়া পরস্পরের সম্বন্ধ রক্ষা করে এবং বায়ুমণ্ডল ও মহাশূন্যের সর্ব্বাংশে পরিব্যাপ্ত থাকিয়া আকর্ষণ ধর্ম্মের বিকাশ করে, আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ তাহাকেই ঈথর নামে আখ্যাত করিয়াছেন।

ঈথরের অস্তিত্ব মানিয়া লইবার আর কোন প্রয়োজন আছে কি না, আমরা এখন তাহা আলোচনা করিব। জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত নিউটন্ সাহেব তাঁহার মহাকর্ষণের নিয়মাদির আলোচনাকালে ঈথরের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী পদার্থের অস্তিত্বের সম্ভাবনা জানিতে পারিয়াছিলেন। তিনি এক নিবন্ধে (Optical queries) স্পষ্টই বলিয়াছিলেন, জড়কে যদি কোন এক অতীন্দ্রিয় পদার্থের মধ্যে নিমগ্ন বলিয়া মনে করা যায়, এবং ইহা

জড়ের নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র স্বল্পচাপবিশিষ্ট হইয়া পড়ে বলিয়া স্বীকার করা যায়, তবে মহাকর্ষণের নিয়মাদির একটা ব্যাখ্যান পাওয়া যাইতে পারে। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ নিউটনের পূর্ব্বোক্ত কথাগুলির সারবত্তা বুঝিয়া ঈথরনামক একটি জিনিসের অস্তিত্বে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতেছেন। ইঁহারা দেখিয়াছেন, জড়ের মূল উপাদান অর্থাৎ ইলেক্ট্রন্ উৎপন্ন হইবামাত্র, সন্নিহিত পার্শ্বস্থ ঈথরের চাপ-কমার লক্ষণ প্রকাশ পায়। অতি-পরমাণু অর্থাৎ ইলেক্ট্রন্ অল্পদিনমাত্র আমাদের সহিত পরিচিত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিকগণ অনুমান করিতেছেন, ঈথরই কোন প্রকারে বিকৃত হইয়া পড়িলে, অতি-পরমাণুর উৎপত্তি হয়। এই অনুমান সত্য হইলে, নিউটনের উক্তির সত্যতা প্রতিপন্ন হইবে বলিয়া অনেকে আশা করিতেছেন। সুতরাং, অতি-পরমাণুর আবিষ্কারের পর হইতে যে, ঈথরের অস্তিত্বের প্রমাণ আরো স্পষ্টতর হইয়া দাঁড়াইতেছে, তাহা এখন আর অস্বীকার করা যায় না।

মহাকর্ষণের নিয়মাদির সহিত আমাদের বিশেষ পরিচয় আছে সত্য, কিন্তু এই আকর্ষণ ঠিক কি প্রকারে পদার্থে উৎপন্ন হয়, তাহা আমরা জানি না। কাজেই, ঈথরকে আকর্ষণের উৎপাদকরূপে জানিয়াও এসম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান বিশেষ বৃদ্ধি পায় নাই। এজন্য কেবল মহাকর্ষণের অস্তিত্ব দেখিয়া এখন ঈথরের অস্তিত্ব স্বীকার করা যাইতেছে না। তাপালোক এবং চুম্বক ও বিদ্যুতের শক্তি দ্বারাই ঈথরের অস্তিত্ব বিশেষভাবে প্রতিপন্ন হইয়াছে।

তাপ, আলোক ও বিদ্যুৎ যে, পদার্থবিশেষের স্পন্দনকর্ত্তৃক উৎপাদিত হয়, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু যে জিনিসের স্পন্দনে ঐ সকল শক্তির বিকাশ হয়, ব্রহ্মাণ্ড খুঁজিয়া তাহার দর্শন পাওয়া ভার। আমাদের পরিচিত কোন পদার্থের কম্পনকে আলোকস্পন্দনের অনুরূপ দ্রুত করা যায় নাই; অথচ আলোকবহ কোন একটা পদার্থের যে অস্তিত্ব

আছে, তাহা সুনিশ্চিত। এই সুনিশ্চয়ের জন্য বৈজ্ঞানিকগণ একটা আলোকবহ পদার্থ জানিয়া লইয়া, তাহাতে আলোক-উৎপাদনের উপযোগী অনেকগুলি ধর্ম্মের আরোপ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। গত শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে ক্লার্ক্ ম্যাক্স্ওয়েল্ এক সময়ে বিদ্যা ও জ্ঞানে সকলের অগ্রণী হইয়াছিলেন। ইনি ঈথরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিয়া স্পষ্টই বলিয়াছিলেন, যে মহাশূন্যে গ্রহনক্ষত্রাদি অবস্থিত, তাহা কখনই শূন্য নয়। এই জ্যোতিষ্ক-খচিত অনন্ত স্থান নিশ্চয়ই কোন এক পদার্থে পূর্ণ আছে; ইহাই নক্ষত্রের সহিত নক্ষত্রকে, সূর্য্যের সহিত সূর্য্যকে, এক মহা যোগসূত্রে আবদ্ধ রাখিয়াছে। কোটিযোজন দূরবর্ত্তী জ্যোতিষ্কে হাইড্রোজেনের এক অতি-সূক্ষ্ম কণার স্পন্দন আরম্ভ হইলে, ঐ সর্ব্বব্যাপী পদার্থই স্পন্দনগুলিকে আনিয়া রশ্মিনির্ব্বাচন-যন্ত্রে (Spectroscope) বর্ণচ্ছত্রের (Spectrum) উৎপত্তি করে।

আলোকপরিবাহণই ঈথরের একমাত্র ধর্ম্ম নয়; চৌম্বক ও বৈদ্যুতিক ব্যাপারেও ঈথরের কার্য্য ধরা পড়িয়াছে। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ফ্যারাডে ঈথরের সহিত বিদ্যুতের সম্বন্ধ আবিষ্কার করিতে গিয়া, তাঁহার সমগ্র জীবন অতিবাহন করিয়াছিলেন। ঈথরই যে, চৌম্বক ও বৈদ্যুতিক ধর্ম্মের একমাত্র উৎপাদক, এই মহাত্মাই তাহা প্রথমে অনুমান করিয়াছিলেন। তাহার পর অপর বৈজ্ঞানিকদিগের গবেষণায় সেই অনুমানই ভবিষ্যদ্বাণীর ন্যায় সফল হইয়া পড়িয়াছে। ইঁহারা বিদ্যুৎ ও চৌম্বক শক্তির সহিত ঈথরের প্রত্যক্ষ যোগ দেখিতেছেন। অধ্যাপক টম্‌সন্ (J. J. Thomson) পরীক্ষানৈপুণ্যে এবং অসাধারণ শাস্ত্রজ্ঞানে বৈজ্ঞানিক সমাজে অতি উচ্চ আসন প্রাপ্ত হইয়াছেন। অল্পদিন হইল, ইনিই বলিয়াছেন, আমরা ব্রহ্মাণ্ডে যত জড় দেখিতে পাই, তাহা এক ঈথরেরই রূপান্তরমাত্র। তদ্ভিন্ন, পদার্থের অন্তর্নিহিত শক্তি এবং

Momentum প্রভৃতিও সেই ঈথর হইতে উৎপন্ন। কাজেই, ঈথর এখন কেবল আলোকবহ নয়, ব্রহ্মাণ্ডের নানা প্রাকৃতিক ব্যাপারের মূলেও ইহা বর্ত্তমান।

ঈথর জিনিসটা কি প্রকার, এখন আলোচনা করা যাউক। জড়ের যে সকল ধর্ম্ম এবং অবস্থার সহিত আমাদের পরিচয় আছে, তাহা লইয়া বিচার করিতে গেলে ঈথরকে জড়ের কোটায় ফেলা যায় না। জড়ের সাধারণ ধর্ম্মের সহিত ইহার অনেক অনৈক্য দেখা যায়। কাজেই, জড় বলিলে আমরা যাহা বুঝি, ঈথর তাহা নয়। ঈথরই জড়ের মূল উপাদান। লজ্ সাহেব (Sir Oliver Lodge) যে একটি উদাহরণ দ্বারা জড় ও ঈথরের পার্থক্য প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা এখানে সেটির উল্লেখ করার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। ইনি বলেন, এক খণ্ড রজ্জুতে গ্রন্থি রচনা করিলে যেমন রজ্জুকে গ্রন্থি দ্বারা রচিত না বলিয়া আমরা গ্রন্থিকেই রজ্জু দ্বারা গঠিত বলি, সেইপ্রকার ঈথরকে জড়ময় না বলিয়া জড়কেই ঈথরময় বলা উচিত। সকল বস্তুকেই আমরা উপযুক্ত বলপ্রয়োগে স্থানান্তরিত করিতে পারি, কিন্তু কোন শক্তি দ্বারা ঈথরকে স্থানান্তরে লওয়া যায় না। জড় ও ঈথরের এই পার্থক্যটাই বিশেষ সুস্পষ্ট। ঈথর আবর্ত্তিত ও স্পন্দিত হইতে পারে এবং পার্শ্বে চাপ (Stress) দিয়া নিজে প্রসারিত (Strained) হইবারও চেষ্টা করিতে পারে, কিন্তু স্থানান্তরিত হইতে পারে না।

ঈথর জিনিসটা যে, সাধারণ কঠিন পদার্থের ন্যায় নয়, তাহা বৈজ্ঞানিক মাত্রেই স্বীকার করিয়া থাকেন। যাহা সমগ্র বিশ্বকে জুড়িয়া আছে, তাহার অবস্থা দ্রব (Fluid) হওয়ারই কথা। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, যে জিনিস নিজেই দ্রব, তাহা কি নানা কঠিন বস্তু উৎপাদিত করিতে পারে? জলের ন্যায় দ্রব সামগ্রী দ্বারা গৃহনির্ম্মাণ যেপ্রকার অসম্ভব,

ঈথর দিয়া লৌহ, প্লাটিনম্ প্রভৃতি ধাতুর উৎপত্তিও প্রথম দৃষ্টিতে সেই প্রকারই অসম্ভব বলিয়া মনে হয়; কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তাহা নয়। অনেক স্থলে দ্রব পদার্থকে ঠিক কঠিন বস্তুর ন্যায়ও কার্য্য করিতে দেখা যায়। লর্ড কেল্‌ভিন্ এবং অধ্যাপক লজ্ এই সম্বন্ধে অনেক পরীক্ষা করিয়াছিলেন। আমরা এখানে ইঁহাদেরি দুই একটি পরীক্ষার বিবরণ দিয়া, দ্রব বস্তুর কঠিনবৎ কার্য্যের কথা বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

সাধারণ রেশমের সূত্রকে কখনই লৌহ-শলাকার ন্যায় কঠিন বলা যায় না। কিন্তু কপিকলে ঐ সূত্রকেই মালাকারে বাঁধিয়া দ্রুত ঘুরাইতে থাকিলে, উহাকে সত্যই কঠিন হইতে দেখা যায়। এই অবস্থায় সূত্রটিকে ধরিয়া কাঁপাইতে থাকিলে, কম্পনগুলি সূত্রের উপর দিয়া তরঙ্গাকারে চলিতে আরম্ভ করে। শিকলকে ঘুরাইতে থাকিলে, তাহাও লৌহদণ্ডের ন্যায় খাড়া হইয়া পড়ে। জলের ভিতরে হাত ডুবাইতে গেলে, হাত অবাধে জলে প্রবেশ করে। এই জলই পিচ্‌কারির মুখদিয়া জোরে বাহির হইতে থাকিলে, তাহা কঠিন ইষ্টকের ন্যায় কার্য্য করে। সাধারণ কাগজকে বৃত্তাকারে কাটিয়া ঘুরাইতে থাকিলে তাহা লৌহচক্রের ন্যায় কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। ইস্পাতের স্থূল ফলকগুলিকে কাটিতে হইলে, চক্রাকার করাতকে ঐ কারণেই দ্রুত ঘুরাইতে হয়। সাধারণ লৌহের করাত ঘুরিবার সময়ে এত কঠিন হইয়া দাঁড়ায় যে, তাহার স্পর্শে ইস্পাতের ন্যায় কঠিন জিনিসও অনায়াসে দ্বিখণ্ডিত হইয়া পড়ে।

এই সকল উদাহরণ হইতে বেশ বুঝা যায়, ঈথর নিজে দ্রব পদার্থ হইলেও অতি দ্রুত বেগে ঘূর্ণিত হইবার সময়ে তাহাতে কঠিন পদার্থের অনেকগুলি ধর্ম্ম আপনা হইতেই প্রকাশিত হইয়া পড়ে। সুতরাং, ঈথর হইতে জড়ের উৎপত্তি একেবারে অসম্ভব বলা যায় না।

যন্ত্রসাহায্যে ঈথরকে ঘুরাইয়া তাহার কার্য্য দেখিবার জন্য বৈজ্ঞানিকগণ

এ পর্য্যন্ত অনেক পরীক্ষা করিয়াছেন ; কিন্তু আশানুরূপ ফললাভ করিতে পারেন নাই। সার্ অলিভার লজ লৌহচক্রকে প্রতি মিনিটে চারি হাজার বার ঘুরাইয়া এবং তাহার উপর আলোক পাত করিয়া ঈথরকে চঞ্চল করিতে পারেন নাই। এই সকল দেখিয়া মনে হয়, উহাকে ঘূর্ণিত করিবার কৌশল আজও আমাদের করায়ত্ত হয় নাই। কিন্তু বৈদ্যুতিক উপায়ে ঈথরকে চঞ্চল করা গিয়াছে। বিদ্যুদ্‌যুক্ত পদার্থকে ঘন ঘন আন্দোলিত করিতে থাকিলে, নিকটবর্ত্তী ঈথরে আপনা হইতেই তরঙ্গ উঠিতে আরম্ভ করে। তাছাড়া কোন বিদ্যুদ্‌যুক্ত পদার্থকে সহসা বিদ্যুন্মুক্ত করিলেও ঈথর চঞ্চল হয়। এই সকল উপায়ে ঈথর-তরঙ্গের উৎপাদন এখন অতি সহজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। রন্‌জেনের রশ্মি (X-Rays) আজকাল এই প্রক্রিয়াতেই উৎপাদিত করা হইয়া থাকে।

যাহা হউক, ঈথরকে গতিশীল করিবার সহস্র চেষ্টায় ব্যর্থ হইয়াও বৈজ্ঞানিকগণ ইহার অস্তিত্বে কণামাত্র সন্দেহ প্রকাশ করেন নাই। তাপালোক, বিদ্যুৎ ও চুম্বকের প্রত্যেক কার্য্যে ঈথরের অস্তিত্বের যে সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহাই ইঁহাদের বিশ্বাসকে অক্ষুন্ন রাখিয়াছে।

বিদ্যুতের উৎপত্তি

শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে যেদিন ভল্‌টা তড়িৎপ্রবাহের আবিষ্কার করিয়া জগৎকে বিস্মিত করিয়াছিলেন, সেই শুভ মুহূর্ত্ত হইতে তড়িদ্‌বিজ্ঞান ক্রমেই উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে। বিদ্যুতের নানা অদ্ভুত শক্তিতে আজকাল যে কত অভাবনীয় ও কল্পনাতীত কার্য্য সুসাধ্য হইয়া পড়িতেছে, তাহার বিশেষ বিবরণ প্রদান নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু বিদ্যুৎ জিনিসটা কি, এবং ইহার উৎপত্তি-স্থান কোথায়, জিজ্ঞাসা করিলে, আজকালকার প্রধান বিজ্ঞানরথীর নিকটেও সদুত্তর পাওয়া যায় না। বিদ্যুৎ ঠিক আলোক নয়, তাপও নয় এবং পরিজ্ঞাত কোন বায়ব বা তরল পদার্থের সহিত ইহার কোনও সম্বন্ধ নাই, একথা সকল বৈজ্ঞানিকই বুঝেন এবং বুঝাইতেও পারেন। কিন্তু এই সকল ছাড়া অপর সহস্র সহস্র জ্ঞাত ও অজ্ঞাত ব্যাপারের মধ্যে কোনটি বিদ্যুতের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া জগৎকে ভেল্কি দেখাইতেছে, তাহা কোন বিজ্ঞানবিৎ আজও নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারেন না।

যে জিনিসটা যত রহস্যময়, তাহার ভিতরকার সংবাদ জানিবার জন্য মানুষের ততই প্রবল আকাঙ্ক্ষা দেখা যায়। এই জন্য এক বিদ্যুৎকে অবলম্বন করিয়া এপর্য্যন্ত অনেকগুলি মতবাদের প্রচার হইয়া গিয়াছে। একটি মতবাদের অযৌক্তিকতা প্রতিপন্ন হইলে, অচিরাৎ আর একটি সিদ্ধান্ত তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে। তাহার পর সেটাও পরবর্ত্তী বৈজ্ঞানিকদিগের কঠোর পরীক্ষায় হৃতগৌরব হইয়া পড়িলে, তৃতীয় মতবাদের আবির্ভাব দেখা গিয়াছে।

অতি প্রাচীন পণ্ডিতগণ বিদ্যুৎসম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানিতেন না। তৈলস্ফটিক (Amber) লঘু পদার্থকে আকর্ষণ করে, কেবল এই অতি ক্ষুদ্র বৈদ্যুতিক ব্যাপারের সহিত তাঁহাদের পরিচয় ছিল। কিন্তু তড়িদ্‌বিজ্ঞানের এই অবস্থাতেও তৎসম্বন্ধীয় মতবাদের অভাব হয় নাই। থেলিজ্ (Thales) নামক জনৈক পণ্ডিত সেই সময়ে প্রচার করিয়াছিলেন, চুম্বকে যেমন একটা আকর্ষণী শক্তি আছে, তৈলস্ফটিকেরও সেই প্রকার একটি শক্তি আছে। থেলিজের কথাটা খুব সহজ সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহা দ্বারা শিশু তড়িদ্‌বিজ্ঞানের যে কোন উন্নতি হইয়াছিল, তাহা কিছুতেই বলা যায় না।

এই ত গেল প্রাচীনকালের কথা। ষোড়শ শতাব্দীর পণ্ডিত গিলবার্ট সাহেব পদার্থবিশেষের পরস্পর সংঘর্ষণে তড়িতের উৎপত্তি দেখিয়া যে মতবাদ প্রচার করিয়াছিলেন, এখন তাহার আলোচনা করা যাউক। ইনি বলিলেন, ঘর্ষণ করিলে পদার্থে যে তাপ উৎপন্ন হয়, তাহাই ঘর্ষণ-তড়িতের (Frictional Electricity) মূল কারণ। এই তাপহেতু তড়িদুৎপাদক বস্তু হইতে এক প্রকার অতি সূক্ষ্ম পদার্থ স্বতঃই বহির্গত হয়। তাহার পরে বাহিরের বাতাসের সংস্পর্শে আসিলেই তাহা শীতল ও সঙ্কুচিত হইয়া সেই উৎপাদক বস্তুটির সহিত পুনর্মিলিত হইবার চেষ্টা করে এবং সঙ্গে সঙ্গে নিকটের লঘু পদার্থগুলিকে টানিয়া লইতে চায়। বৈদ্যুতিক বিকর্ষণের (Repulsion) সহিত বোধ হয় তাৎকালিক পণ্ডিতগণের পরিচয় ছিল না ; নচেৎ তৎসম্বন্ধেও এইরূপ একটা মতবাদের কথা শুনা যাইত।

গিলবার্টের পরে বয়েল (Boyle)-নামক জনৈক বিখ্যাত পণ্ডিত বিদ্যুৎসম্বন্ধীয় পূর্ব্বোক্ত মতবাদটির কিঞ্চিৎ সংস্কার করিয়া, ইহাকে একটা নূতন আকার দিয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে নানা অভিনব বৈদ্যুতিক

ধর্ম্ম আবিষ্কৃত হইলে, সংস্কৃত মতবাদটির দ্বারাও তাহাদের কোনও ব্যাখ্যা পাওয়া যায় নাই। কাজেই, উভয় মতবাদকেই অমূলক বলিয়া বর্জ্জন করিতে হইয়াছিল।

ইহার পরেই হক্‌সবি ও আবি নোলের (Abbe Noller) গবেষণা-কাল। অধ্যাপক হক্‌সবি বহু পরীক্ষাদি দ্বারা স্থির করিয়াছিলেন, যেমন জলন্ত পদার্থ হইতে আলোকরেখা বহির্গত হয়, বিদ্যুদ্‌যুক্ত পদার্থ হইতেও সেইপ্রকার কোন বস্তু রশ্মির আকারে নির্গত হয়। ইহা বায়ুর ভিতর দিয়া অগ্রসর হইবার সময়ে প্রবল ধাক্কা দিয়া পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের কতক বায়ুকে স্থানচ্যুত করিতে থাকে। কিন্তু বায়ু স্থানচ্যুত হইয়া থাকিবার জিনিস নয়; ধাক্কার মাত্রা কমিয়া আসিলেই পার্শ্বস্থ বায়ু শূন্যস্থান অধিকার করিবার জন্য ধাবিত হয়। কাজেই, সেই বৈদ্যুতিক রশ্মিকে ঘেরিয়া একটা বায়ুপ্রবাহ উৎপন্ন হইয়া পড়ে এবং তাহা বিদ্যুদ্‌যুক্ত পদার্থের অভিমুখেই ধাবিত হইতে চায়। হকসবির মতে, বৈদ্যুতিক আকর্ষণ এবং পূর্ব্বোক্ত বায়ুপ্রবাহ হেতু লঘু পদার্থের সঞ্চরণ, একই ব্যাপার।

নোলের মতবাদটি কিছু নূতন ধরণের। তিনি বলিতেন, তড়িদুৎ-পাদক বস্তুমাত্রেই একপ্রকার পদার্থ আবদ্ধ থাকে। সকল বস্তুতেই অণু-গুলির মধ্যে যে এক বন্ধন থাকে, তাহা ভেদ করিয়া ঐ বিদ্যুৎপদার্থ সাধারণতঃ বাহির হইতে পারে না, কিন্তু ঘর্ষণাদি দ্বারা চাপ দিতে থাকিলে, আবদ্ধ বৈদ্যুতিক পদার্থটা চোঁয়াইয়া বাহির হইয়া আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর হইয়া পড়ে।

পূর্ব্বোক্ত দুইটি সিদ্ধান্ত প্রচারের অল্পকাল পরেই অমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হওয়ায় পরিত্যক্ত হইয়াছিল। কিন্তু ইহাদের স্থান অধিক কাল শূন্য থাকিতে পারে নাই। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ফ্রাঙ্কলিনের একপ্রবহ-বাদ এবং অধ্যাপক সিমারের দ্বিপ্রবহ-বাদ শূন্য স্থান যুগপৎ অধিকার করিয়াছিল।

ফ্রাঙ্ক্লিন্ বলিতেন, স্বভাবতঃই এক প্রকার প্রবহপদার্থ (fluid) বস্তুমাত্রেই অবস্থান করিতেছে; ইহাই বিদ্যুৎ। স্বাভাবিক অবস্থায় জড়ে এই পদার্থটা সমভাবে অবস্থান করে। কাজেই, তাহাতে বিদ্যুতের কোন চিহ্নই দেখা যায় না। কিন্তু কোন উপায়ে সেই পদার্থের পরিমাণ বাড়াইয়া বা কমাইয়া দিলে, তৎক্ষণাৎ তড়িতের লক্ষণ প্রকাশ পায়। কাচে ফ্লানেল্ বা রেশমী কাপড় ঘষিলে আমরা কাচস্থিত সেই সমঘন প্রবহপদার্থকে অল্প করিয়া দেই, কিন্তু ফ্লানেলে তাহার পরিমাণ বাড়িয়া যায়। এই জন্য কাচ ধনাত্মক (Positive) এবং ফ্লানেল্ ঋণাত্মক (Negative) তড়িতে পূর্ণ হইয়া পড়ে।

সিমারের মতবাদটি আবার আর এক রকমের। ইনিও ফ্রাঙ্ক্লিনের ন্যায় তড়িজ্জনক পদার্থের কল্পনা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন; কিন্তু ইঁহার মতে সেই প্রবহপদার্থের সংখ্যা একটি নয়,—স্পষ্টই দুইটি এবং পরস্পর বিপরীতধর্ম্মী। ইহাদের বিশেষ ধর্ম্ম এই যে, কোন দুইটি বস্তু যদি উহাদের মধ্যে একটি দ্বারাই তড়িদ্যুক্ত হয়, তবে উভয়ের মধ্যে বিকর্ষণী শক্তি দেখা যায়। কিন্তু আবার সেই দুইটিকেই যদি বিভিন্ন বৈদ্যুতিক পদার্থ দ্বারা তড়িদ্যুক্ত করা যায়, তবে আকর্ষণী শক্তির উৎপত্তি হইয়া পড়ে। জড়পদার্থমাত্রই স্বাভাবিক অবস্থায় ঐ দুই প্রবহপদার্থকে সমপরিমাণে গ্রহণ করে; এজন্য এই অবস্থায় বিদ্যুতের পরিচয় পাওয়া যায় না। কিন্তু ঘর্ষণাদি দ্বারা এই সাম্যভাবটিকে বিচলিত করিলেই বিদ্যুতের প্রকাশ হইয়া পড়ে।

ফ্রাঙ্ক্লিন এবং সিমারের পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত দুইটির সাহায্যে প্রায় সকল পরিজ্ঞাত বৈদ্যুতিক ধর্ম্মের কারণ নির্দ্দেশ করা চলে। এই জন্য সিদ্ধান্ত দুইটির মধ্যে কোন্‌টি সত্য, তাহা স্থির করিবার নিমিত্ত গত শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে অনেক তর্কবিতর্ক হইয়াছিল; কিন্তু

ইহার একটা চরম মীমাংসা হইয়া উঠে নাই। এই কলহের ফলস্বরূপ তাৎকালিক বৈজ্ঞানিকসম্প্রদায় দ্বিধা-বিভক্ত হইয়া কতক ফ্রাঙ্ক্লিনের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং কতক সিমারের মতবাদ সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন মাত্র। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই দুইটি মতবাদ পণ্ডিতসমাজে এত প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল যে, কোনও নূতন সিদ্ধান্ত দ্বারা ইহাদের ভিত্তি সহসা কম্পিত হইবে বলিয়া কেহই তখন কল্পনা করিতে পারিতেন না। কিন্তু ফ্যারাডে ও হাম্ফ্রে ডেভির শিষ্য জুল্ (Joule) ও মেয়ার (Mayer)-প্রমুখ আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ শক্তির অবিনশ্বরতা সম্বন্ধীয় পুরাতন সত্যটাকে মূর্ত্তিমান্ করিয়া তুলিলে ফ্রাঙ্ক্লিন্ ও সিমারের সিদ্ধান্তের মূলে কুঠারাঘাত হইয়াছিল।

নব্য বৈজ্ঞানিকগণ বলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, সিদ্ধান্ত দুইটি দ্বারা বিদ্যুতের নানা জটিল ধর্ম্মকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা সহজ হয় বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা বিদ্যুতের উৎপত্তি রহস্যের কোন কিনারা হয় না। শিক্ষার্থীর পক্ষে উভয় মতবাদই বিশেষ উপকারী। ইহাদের সাহায্যে জটিল বৈদ্যুতিক ধর্ম্মগুলিকে বেশ গুছাইয়া আয়ত্ত করা যাইতে পারে, কিন্তু তত্ত্বানুসন্ধিৎসুর নিকট থেলিজের মতবাদ এবং সিমার ও ফ্রাঙ্ক্লিনের সিদ্ধান্তের মূল্য একই।

আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ বিদ্যুতের উৎপত্তিসম্বন্ধে কি বলেন, এখন দেখা যাউক। ইহাদের কথাগুলি বুঝিতে হইলে, এখন বিজ্ঞান কোন্ পথে ধাবিত হইতেছে, তাহার একটু পরিচয় প্রদান আবশ্যক। আজ-কালকার পণ্ডিতগণ বলিতেছেন, জগতের প্রত্যেক প্রাকৃতিক ব্যাপারকে বিরাট্ প্রকৃতি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ক্ষুদ্র পরীক্ষাগারের প্রাচীরের মধ্যগত করিলে, তাহাকে ঠিকভাবে দেখা হয় না। দেখিতে হইলে, তাহাকে সেই বিরাট্ প্রকৃতিরই অংশস্বরূপ করিয়া দেখিতে হইবে। প্রাচীন পণ্ডিতগণ প্রকৃতিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখিয়া একটা মহা ভুল

করিয়াছিলেন, এবং ইহারই ফলে তাঁহারা প্রত্যেক প্রাকৃতিক ঘটনাকে এক একটা সম্পূর্ণ নূতন সৃষ্টি বলিয়া অনুমান করিয়া ফেলিতেন। কাজেই, তাহাদের প্রত্যেকটির কারণ নির্দ্দেশ করিবার জন্য এক একটা অদ্ভুত মতবাদের প্রয়োজন হইত। বোধ হয় এই জন্যই প্রাচীন বিজ্ঞানশাস্ত্রে তাপ, আলোক, চুম্বক এবং বিদ্যুৎ প্রত্যেকেরই জন্য এক একটা পৃথক্ মতবাদ স্থান পাইয়াছিল। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ বিদ্যুৎকে বিরাট্ প্রাকৃতিক শক্তিরই রূপান্তর বলিয়া স্বীকার করিয়া যে ফল পাইয়াছেন, তাহা অদ্ভুত। এই পথে না চলিলে, ইঁহারাও হয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী পণ্ডিত-দিগের ন্যায় আরো দুই চারিটি সিদ্ধান্তের প্রচার করিয়া বিদ্যুতের ইতিহাসকে অযথা ভারগ্রস্ত করিয়া তুলিতেন।

একটু বিবেচনা করিলেই দেখিতে পাই, প্রতিদিনই আমাদের চক্ষুর সম্মুখে যে সকল শক্তির বিকাশ হইতেছে, তাহার প্রত্যেক ক্ষুদ্র অংশ প্রকৃতির বিরাট্ শক্তিসম্পদের এক এক ক্ষুদ্র কণামাত্র। তাপ, আলোক, বিদ্যুৎ, চৌম্বকাকর্ষণ, রাসায়নিক যোগবিয়োগ সকলই প্রকৃতির বিপুল শক্তির অঙ্গীভূত। প্রকৃতির শক্তিভাণ্ডারের ক্ষয় নাই, বৃদ্ধিও নাই, কিন্তু পরিবর্ত্তন আছে, এবং এই পরিবর্ত্তন আছে বলিয়াই প্রকৃতি এত বৈচিত্র্যময়ী। যে শক্তি সৌরকিরণাকারে ভূতলে পতিত হইয়া জলকে বাষ্পীভূত করিতেছে, তাহাতে উহার ক্ষয় হয় না। সৌরতাপ গূঢ়াবস্থায় সেই বাষ্পেই অবস্থান করে। তাহার পরে যথাকালে বাষ্প জমিয়া জল হইতে আরম্ভ করিলে, সেই তাপেরই পুনর্বিকাশ হয়। মানুষ সৌরতাপ-পুষ্ট শক্তিময় খাদ্য দেহস্থ করিয়া যে বলের সঞ্চয় করে, চলা-ফেরা, উঠা-বসা প্রভৃতি কার্য্যে তাহারি বিকাশ দেখা যায়। আবার আমাদের প্রত্যেক পাদক্ষেপে ব্যয়িত শক্তি, হয় তাপ বা অপর কোনও মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া কার্য্যান্তরে নিযুক্ত হইতেছে। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ বৈদ্যুতিক -ব্যাপার

গুলিকেও এই প্রকার প্রাকৃতিক শক্তির বিকাশ বলিতে চাহিতেছেন। বৃক্ষশাখা নত করিতে গেলে, বা বন্দুক হইতে গুলি ছুড়িতে গেলে, যেমন কিঞ্চিৎ শক্তিব্যয়ের আবশ্যক হয়, সেই প্রকার টেলিগ্রাফের তারের সাহায্যে বিদ্যুৎপ্রবাহ চালাইতে হইলে, বা কোনও ধাতুফলককে বিদ্যাদ্‌-যুক্ত করিবার চেষ্টা করিলে, শক্তিব্যয়ের আবশ্যকতা দেখা যায়। গাড়ীর কলে প্রযুক্ত শক্তি যেমন তাহার গতিতে, বা চাকা ও রেলের ঘর্ষণজ তাপে বিকাশ পায়, বিদ্যুতের উৎপত্তির জন্য প্রযুক্ত শক্তিও ঠিক সেই প্রকারে নানা কার্য্য দেখাইয়া রূপান্তর গ্রহণ করিতে থাকে।

সাধারণ শক্তি কি প্রকারে বিদ্যুতে পরিণত হয়, এখন দেখা যাউক। আধুনিক বিজ্ঞানের মতে জড়জগতে কেবলমাত্র দুইটি নিত্য বস্তুর অস্তিত্ব আছে। একটি উল্লিখিত বিশাল শক্তিস্তূপ, এবং অপরটি সামগ্রী (Matter)। উভয়ই অক্ষয় এবং পরিমাণে চিরস্থির। কেবল এই দুইটি অবলম্বন করিয়া প্রত্যেক প্রাকৃতিক ঘটনার কারণ নির্দ্দেশ অসম্ভব দেখিয়া, বহু অনুসন্ধানের পরে বৈজ্ঞানিকগণ তাপালোকের বাহক ঈথর বা আকাশ নামক একটি বিশেষ পদার্থের অস্তিত্ব বুঝিতে পারিয়াছেন। আধুনিক পণ্ডিতগণের মতে এই পদার্থ টাই অবস্থাভেদে স্থিরতড়িৎ, তড়িৎপ্রবাহ এবং চৌম্বক শক্তিরূপে আমাদের চোখে পড়ে। বিদ্যুতের উৎপত্তি, বিদ্যুদ্‌বাহক তার বা তড়িতের আধার ধাতুফলকের ভিতরে হয় না, ইহাদেরই বাহিরে যে ঈথর অবস্থিত, তাহাতেই তড়িতের উৎপত্তি। টেলিগ্রাফের তার বিদ্যুৎকে পথ দেখাইয়া লইয়া যায় মাত্র এবং ধাতু-ফলক ঈথরের অবস্থাবিশেষকে একটা নির্দ্দিষ্ট স্থানে আবদ্ধ রাখে।

এখন দেখা যাউক, ঈথরের কোন্ অবস্থায় বিদ্যুৎ-শক্তির বিকাশ হয়। বৈজ্ঞানিকগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, আকাশ বা ঈথরের একপ্রকার কম্পনই বৈদ্যুতিক শক্তি বিকাশের একমাত্র কারণ। পদার্থমাত্রই দুই

প্রকারে কম্পিত হইতে পারে। তন্মধ্যে একটিকে ঊর্দ্ধাধঃ এবং অপরটিকে পাশাপাশি কম্পন বলা যাইতে পারে। কোন পদার্থ যখন জলে ভাসিতে ভাসিতে নাচিতে থাকে, তখন আমরা সেই কম্পনকে ঊর্দ্ধাধঃকম্পন বলিতেছি এবং সেই পদার্থেরই প্রান্তদ্বয় যখন তরঙ্গাঘাতে ডুবিতে উঠিতে থাকে, তখন সেই সঞ্চলনকে আমরা পাশাপাশি কম্পন আখ্যা দিতেছি। এই শেষোক্ত কম্পনটা কতকটা নিক্তির দণ্ডের আন্দোলনের অনুরূপ। ঈথর অবস্থাবিশেষে ধাক্কা পাইয়া দুই প্রকারেই কম্পিত হইতে পারে। বৈজ্ঞানিকগণ ইহার ঊর্দ্ধাধঃকম্পন এবং পাশাপাশি আন্দোলনকে Electrostatic Oscillation এবং Magneto-electric Oscillation সংজ্ঞা দিয়া থাকেন। ভাসমান পদার্থে যেমন এই উভয় কম্পনই যুগপৎ সম্ভবপর, ঈথরকণাতেও ঠিক সেই ঊর্দ্ধাধঃ ও পাশাপাশি কম্পন এক সঙ্গে দেখা যায়। আধুনিক পণ্ডিতগণ বলেন, এই দুই কম্পন-বলের (Stress) সমবেত কার্য্যদ্বারা ঈথরের অংশবিশেষের যে আকারগত পরিবর্ত্তন (Strain) ঘটে, তাহাই বিদ্যুতের উৎপাদক ঈথরতরঙ্গ। অধ্যাপক ম্যাক্স্‌ওয়েল্ ঈথরের এই বিশেষ কম্পনকে Electro-Magnetic Oscillation নামে আখ্যাত করিয়াছেন।

এই বৈদ্যুতিক সিদ্ধান্ত-অনুসারে আলোকোৎপাদক ঈথরতরঙ্গ এবং বিদ্যুদুৎপাদক তরঙ্গের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। পার্থক্যটা কেবল কম্পনমাত্রায় সীমাবদ্ধ। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি পরীক্ষা করিলে, তাহাদের কার্য্যে নানাপ্রকার অপূর্ণতা দেখা যায়। আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয় আছে, কিন্তু সকল শব্দ শুনিতে পাই না। শব্দোৎপাদক বায়ুতরঙ্গের কম্পন দ্রুততর হইয়া একটা নির্দ্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করিলে, সে শব্দটা এত চড়া হইয়া পড়ে যে, তাহা শ্রবণেন্দ্রিয়কে আর উত্তেজিত করিতে পারে না। অতি চড়া শব্দ এবং নিস্তব্ধতা আমাদের কর্ণে সমান ফল উৎপাদন করে।

অতি ধীর কম্পনজাত শব্দশ্রবণেও আমাদের কর্ণ বধির। শব্দোৎপাদক বায়ুকম্পনের সংখ্যার হ্রাস হইতে হইতে একটা নির্দ্দিষ্ট সীমার নীচে পৌঁছিলে, শব্দের সুর এত খাদে নামিয়া আসে যে, তাহা আর শ্রবণেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য হয় না। শ্রবণশক্তির ন্যায় আমাদের দৃষ্টিশক্তিরও সীমা আছে। মানবচক্ষু রক্তপীতাদি কয়েকটি মাত্র বর্ণ দেখিতে পায়। গণনা করিয়া দেখা গিয়াছে, ঈথরকণা প্রতি সেকেণ্ডে চারিশত লক্ষকোটি-বার (Four Hundred Billions) স্পন্দিত হইয়া যে আলোক উৎপাদন করে, তাহাই আমাদের নিকট প্রাথমিক বর্ণ অর্থাৎ রক্তালোকরূপে প্রতিভাত হয়। তার পর স্পন্দনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে যথাক্রমে পীত, হরিৎ, ভায়লেট্ ইত্যাদি বর্ণের অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারি। কিন্তু কম্পনসংখ্যা লোহিতালোক উৎপাদক স্পন্দনের দ্বিগুণ হইয়া পড়িলে, তাহা আমাদের চক্ষুকে আর উত্তেজিত করিতে পারে না। স্থূল কথায় বলিতে গেলে, রক্তরশ্মির উৎপাদক কম্পন অপেক্ষা ধীর এবং ভায়লেট্ আলোকজনক তরঙ্গ অপেক্ষা দ্রুত ঈথরকম্পন দ্বারা যে আলোক উৎপন্ন হয়, তাহা দেখিতে মানবচক্ষু চিরবঞ্চিত। বৈদ্যুতিক সিদ্ধান্তের মতে, আলোকতরঙ্গ ও বিদ্যুৎ-উৎপাদক ঈথরকম্পন একই ব্যাপার হইলেও, বিদ্যুতের তরঙ্গ ধীর। এজন্য ইহা আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়কে উত্তেজিত করিতে পারে না। ইহার বিকাশ আমরা কেবল তড়িতেই দেখিয়া থাকি।

ঈথর বা তড়িতের দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক্ অবস্থা আছে। বৈজ্ঞানিকগণ ইহাদিগকে 'ধনাত্মক' (Positive) এবং 'ঋণাত্মক' (Negative), এই দুই সংজ্ঞায় আখ্যাত করেন। সর্ব্বব্যাপী ঈথরের ক্ষুদ্রতম স্থানেও এই দুইয়ের একত্র সমাবেশ থাকে, তাই আমরা ঈথর অর্থাৎ বিদ্যুৎসাগরে ডুবিয়া থাকিয়াও সকল সময়ে বিদ্যুতের সন্ধান পাই না। কিন্তু কোন রেশমী কাপড় দ্বারা কাচদণ্ড ঘর্ষণ করিয়া বা প্রকারান্তরে অপর শক্তি প্রয়োগ

করিয়া, আমরা ধন-ঋণের সেই সাম্যভাবের বিচলন করিতে পারি। এ অবস্থায় ধন-ঋণ (Positive and Negative) আর একাধারে থাকিতে না পারিয়া কোন একটির বিকাশ দেখাইতে আরম্ভ করে। ইহাই ঘর্ষণজ বা অচল তড়িৎ।

বিদ্যুৎপ্রবাহের (Electric Current) উৎপত্তি অনুসন্ধান করিতে গেলেও সেই অচল তড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইতে হয়। বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, ঘর্ষণজ তড়িতের সহিত বিদ্যুৎপ্রবাহের কোনই অনৈক্য নাই। দুই স্থানের মধ্যে উভয়বিধ তড়িতের গমনাগমনই তড়িৎপ্রবাহ। বিদ্যুৎ-কোষের (Cell) তার যখন বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকে, তখন তাহার একপ্রান্ত 'ধন' এবং অপর প্রান্ত 'ঋণ' তড়িতে পূর্ণ থাকে। বাতাসের বাধা অতিক্রম করিয়া উভয় তড়িৎ মিলিত হইতে পারে না বলিয়াই তারে তড়িৎপ্রবাহ দেখা যায় না। তারের প্রান্তদ্বয় সংযুক্ত করিয়া দাও, ধনাত্মক ও ঋণাত্মক তড়িৎ অবিচ্ছিন্নভাবে পরস্পর মিলিত হইতে হইতে প্রবাহের উৎপত্তি করিবে। সুতরাং ঘর্ষণজ তড়িৎ ও বিদ্যুৎপ্রবাহ, এই দুয়ের কার্যে দৃশ্যতঃ অনৈক্য থাকিলেও মূলে তাহারা এক। কাজে কাজেই তাহাদের উৎপত্তি-তত্ত্বও এক।

বিদ্যুৎপ্রবাহের সহিত চুম্বকের একটা অতি নিকট আত্মীয়তা আছে। প্রাচীন পণ্ডিতগণও ইহার কথা জানিতেন। লৌহদণ্ডে তার জড়াইয়া, পরে সেই তারের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ চালাইতে থাকিলে, লৌহদণ্ড ক্ষণিক চৌম্বকধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়। প্রবাহ রোধ কর, লৌহদণ্ডের আর চুম্বকত্ব থাকিবে না। তবে কি স্বাভাবিক চুম্বককে ঘেরিয়া আমাদের অলক্ষিতে বিদ্যুৎ-প্রবাহ চলিতেছে? বিখ্যাত তড়িদ্‌বিদ্ আম্‌পিয়ার সাহেব ইহাই বিশ্বাস করিতেন এবং তদনুসারে একটা মতবাদও প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু আধুনিক পণ্ডিতদিগের গবেষণায় সে মতবাদ নিরর্থক হইয়া পড়িতেছে।

আজকাল সকলে বলিতেছেন, চৌম্বক ধর্ম্মও সেই বিদ্যুৎ বা ঈথরের কম্পনবিশেষের প্রত্যক্ষ ফল। অধ্যাপক লজ্ গণিতকৌশলে দেখাইয়াছেন, ঈথর আবর্ত্তাকারে কম্পিত হইতে থাকিলে আবর্ত্তগুলি চুম্বকের ন্যায় পরস্পরকে আকর্ষণ বিকর্ষণ করিতে পারে। আজকাল এই সূত্র অবলম্বন করিয়া বলা হইতেছে, চুম্বকপদার্থ-মাত্রেরই অণুসকল অসংখ্য সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম আবর্ত্ত রচনা করিয়া ঘুরিতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে সন্নিহিত ঈথরকেও সেই প্রকারে আবর্ত্তিত করিতেছে। চৌম্বক ধর্ম্মটা এই সকল ঈথর-আবর্ত্তের বিকাশ ব্যতীত আর কিছুই নয়।

আলোকোৎপাদক স্পন্দন এবং বৈদ্যুতিক তরঙ্গ যে মূলে এক, তাহা অধ্যাপক ম্যাক্সওয়েল্ গণিতসাহায্যে আবিষ্কার করিয়া সর্ব্বপ্রথমে প্রচার করেন। কিন্তু প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাবে নূতন কথাটা সকলে অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন নাই ম্যাক্স্‌ওয়েলের পর তাঁহার প্রিয় শিষ্য হেল্‌ম্‌হোজ বিষয়টি লইয়া গবেষণা আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং সেই অতীন্দ্রিয় ধীর ঈথরকম্পনই যে, বিদ্যুতের উৎপাদক, তাহা তিনি নানা পরীক্ষাদ্বারা বেশ বুঝিয়াছিলেন। ইহার পর বহুকাল বিদ্যুৎ-সম্বন্ধীয় আর কোন নূতন সিদ্ধান্তের কথা শুনা যায় নাই। মার্কনির তারহীন বার্ত্তাবহন-প্রথা প্রভৃতি নূতন আবিষ্কারগুলি ম্যাক্স্‌ওয়েলের ঈথরীয় সিদ্ধান্তকে সুপ্রতিষ্ঠিতই করিতেছিল ; বৈজ্ঞানিকগণ কিছুদিন বেশ নিশ্চিন্ত হইয়াই ছিলেন। কিন্তু কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানাচার্য্য টম্‌সন্ সাহেব (J. J Thomson) সম্প্রতি বৈদ্যুতিক তত্ত্বে যে নূতন অণু-বাদের প্রতিষ্ঠার আয়োজন করিতেছেন, তাহা দেখিয়া বৈজ্ঞানিকগণ চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছেন। ইহাতে বিদ্যুতের ইতিহাসে আর এক নূতন অধ্যায় সংযোজিত হইতে চলিয়াছে।

আমরা পদার্থমাত্রকেই সাধারণতঃ কঠিন, তরল ও বায়বীয় এই তিন

অবস্থায় দেখিতে পাই। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সার্ উইলিয়ম্ ক্রুক্স্ (Sir William Crookes) পদার্থের এক চতুর্থ অবস্থার কথা প্রচার করিয়াছিলেন। প্রায় বায়ুশূন্য কাচনলের দুই প্রান্তে ব্যাটারির তার লাগাইয়া বিদ্যুৎ চালাইলে, নলের মধ্যে যে বেগুনে রঙের আলোক দেখা যায়, ক্রুক্স্ সাহেব পরীক্ষা করিয়া তাহাতে দ্রুতগামী সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম উজ্জ্বল অণুর প্রবাহ দেখিতে পাইয়াছিলেন। চতুর্থ অবস্থায় পদার্থমাত্রই যে অণুর আকার প্রাপ্ত হয়, ইহা বলাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল।

ক্রুক্সের এই আবিষ্কার সমাচার টম্সনের কর্ণগোচর হইলে, তিনি ব্যাপারটি লইয়া স্বয়ং গবেষণা আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইহার ফলে ক্রুক্সের প্রত্যেক কথার সত্যতা প্রমাণিত হইয়াছিল এবং সেই অতি সূক্ষ্ম অণুগুলির গুরুত্ব ও আয়তনও জানা গিয়াছিল। এখন সেইগুলিই বৈজ্ঞানিকদিগের নিকট অতি-পরমাণু বা ইলেক্ট্রন্ (Electron) নামে পরিচিত। এগুলি এত ক্ষুদ্র এবং লঘু যে, আট শতটি একত্র না হইলে ওজনে একটি হাইড্রোজেনের পরমাণুর সমান হইতে পারে না এবং একটি হাইড্রোজেনের পরমাণুর অধিকৃত স্থানে ইহাদের লক্ষ লক্ষটি অনায়াসেই একত্র অবস্থান করিতে পারে।

এই ইলেক্ট্রন্ জিনিসটাই আধুনিক বিজ্ঞানে এক বিপ্লব উপস্থিত করিতে বসিয়াছে। সার্ অলিভার্ লজ্, রদার্ফোর্ড, সডি এবং অধ্যাপক র্যাম্জে-প্রমুখ প্রধান বৈজ্ঞানিকমাত্রই বলিতেছেন, ইলেক্ট্রনই বিদ্যুৎ, আলোক ও চৌম্বকশক্তির মূল কারণ। কেহ কেহ জড়োৎপত্তির মূলেও ঐ অদ্ভুত জিনিসটাকে দেখিতে পাইতেছেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ইলেক্ট্রনগুলি বিদ্যুৎপূর্ণ অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জড়কণা ব্যতীত আর কিছুই নয়। বিদ্যুৎহীন ইলেক্ট্রন্ এপর্য্যন্ত দেখা যায় নাই এবং এই প্রকার জিনিসের যে অস্তিত্ব নাই, ইহারো প্রমাণ

পাওয়া গিয়াছে। কাজেই, বিদ্যুৎ এখন বৈজ্ঞানিকের চক্ষে অতিসূক্ষ্ম জড়ের আকারে প্রকাশ পাইতে আরম্ভ করিয়াছে। মাক্স্‌ওয়েলের ঈথরীয় সিদ্ধান্ত যে আমাদের বর্ত্তমান জ্ঞান-অনুসারে সম্পূর্ণ সত্য, তাহার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে এবং নবাবিষ্কৃত অণু-বাদেও আমরা ভুল দেখিতে পাইতেছি না। সুতরাং বিদ্যুতের উৎপত্তি সম্বন্ধে কোন্ মতবাদটি সত্য, কি উভয়ই সত্য, তাহা স্থির করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। নানাদেশীয় বৈজ্ঞানিক সভাসমিতিতে বিখ্যাত পণ্ডিতগণ আজকাল ইলেক্ট্রন্ লইয়া অনেক আলোচনা করিতেছেন। এই আলোচনার ফলে বিষয়টির সুমীমাংসা হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

পদার্থের মূল উপাদান

নিউটনকর্ত্তৃক মহাকর্ষণের (Gravitation) নিয়মাবিষ্কার এবং ডারুইনের অভিব্যক্তিবাদ প্রচার, এই দুইটিই বর্ত্তমান যুগে প্রধান আবিষ্কার বলিয়া স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। এগুলির পর অনেক বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব জানা গিয়াছে এবং জড়বিজ্ঞানের নানা শাখা-প্রশাখা নানাপ্রকারে উন্নত হইয়াছে, কিন্তু প্রসারে কোন আবিষ্কারই নিউটন্ ও ডারুইনের তত্ত্বের সমকক্ষ হইতে পারে নাই। বর্ত্তমান যুগের খণ্ড খণ্ড নানা আবিষ্কার মানুষের শত শত প্রয়োজনে লাগিয়া বিজ্ঞানের ঘরাও দিক্‌টাকে সুস্পষ্ট করিতেছে সত্য; কিন্তু জগদীশ্বরের প্রকৃত মহিমা নিউটন ও ডারুইনই আমাদিগকে দেখাইয়াছেন। অনন্ত আকাশের সহস্র সূর্য্যোপম প্রকাণ্ড জ্যোতিষ্ক হইতে আরম্ভ করিয়া পদতল-লুণ্ঠিত অতি সূক্ষ্ম ধূলিকণা-পর্য্যন্ত ক্ষুদ্রবৃহৎ বস্তুমাত্রই বিধাতার যে মহানিয়মের শাসনে নিয়ন্ত্রিত হইয়া সর্ব্বদা চলাফেরা করিতেছে, তাহার পরিচয় আমরা নিউটনের আবিষ্কারে জানিতে পারি। বিধাতা যে নিয়মে তাঁহার বৃহৎ জীবরাজ্যটিকে শাসনে রাখিয়াছেন, পুরুষপরম্পরায় সেই রাজ্যেরই অধিবাসী হইয়া আমরা তাহা ভাল করিয়া বুঝিতাম না। বৈজ্ঞানিকবর ডারুইন অভিব্যক্তিবাদ প্রচার করিয়া জীবজগতের শাসনতন্ত্রের আভাস দিয়াছেন।

নিউটন ও ডারুইনের সিদ্ধান্তের ন্যায় আর একটি বৃহৎ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব কয়েক বৎসর ধরিয়া জগতের প্রধান প্রধান বৈজ্ঞানিকদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া রাখিয়াছে। কোন মহাবিষ্কারই একদিনে সুসম্পন্ন হয় নাই। সুতরাং কতদিনে উহা পরীক্ষাগার হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া স্থির

সিদ্ধান্তের আকারে পুঁথির পাতায় আশ্রয় গ্রহণ করিবে, তাহা এখন ঠিক বলা যায় না। তবে ইহা দ্বারা যে, জড়তত্ত্বের অনেক প্রহেলিকার সমাধান পাওয়া যাইবে, তাহা অনায়াসে অনুমান করা যাইতে পারে।

নূতন তত্ত্ব আলোচনা করিবার পূর্ব্বে বৈজ্ঞানিকগণ এখন জড়তত্ত্ব সম্বন্ধে কি মত পোষণ করেন, তাহা মনে রাখা আবশ্যক। ইঁহারা সকলেই একবাক্যে বলেন, এই জগতে মোট সত্তরটি মূল পদার্থ আছে এবং ইহাদেরি বিচিত্র মিলনে নানা বস্তুর উৎপত্তি হইয়াছে। জলবায়ু, পুষ্প-পত্র-তৃণ, শিলামৃত্তিকা প্রভৃতি বস্তুকে পরীক্ষা করিলে, সেগুলিতে ঐ মূলপদার্থ ব্যতীত অপর কোন জিনিসের সন্ধান পাওয়া যায় না। প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডাল্টন (Dalton) এই সিদ্ধান্তটির প্রবর্ত্তক। ইনি পূর্ব্বোক্ত সত্তরটি মূল পদার্থের সূক্ষ্মতম কণাকে পরমাণু (Atom) সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলেন এবং সত্তরজাতীয় মূল পদার্থের সত্তর প্রকার পরমাণুই যে, সৃষ্টির মূল-উপাদান তাহাই ইঁহার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল।

বৈজ্ঞানিকগণ সহস্র চেষ্টায় ঐ পরমাণুগুলির বিশ্লেষ দেখাইতে পারেন নাই, এবং প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন পর্য্যবেক্ষণ করিয়াও উহাদের রূপান্তর দেখিতে পান নাই। কাজেই ডাল্টন সাহেবের সিদ্ধান্তে বিশ্বাস করিয়া সকলেই বলিয়া আসিতেছিলেন, জড়ের মূল-উপাদান অর্থাৎ পরমাণুর বিয়োগ নাই এবং কোনও স্বাভাবিক বা কৃত্রিম প্রক্রিয়ায় তাহাদের একটিরও কোন পরিবর্ত্তন হয় না। সৃষ্টির সময়ে ইহাদের সংখ্যা যত ছিল, আজও ঠিক তাহাই রহিয়াছে। পরমাণুর নূতন সৃষ্টি বা ধ্বংস একেবারে অসম্ভব।

প্রাকৃতিক ব্যাপারের ঠিক গোড়ার খবর দেওয়া বড় কঠিন। স্থূল কথায় বলিতে গেলে, কোন বৈজ্ঞানিকই কোন প্রাকৃতিক ব্যাপারের মূল রহস্যের মীমাংসা করিতে পারেন নাই। রহস্যোদ্ভেদের জন্য কিয়দ্দূর

অগ্রসর হইয়া সকলকেই ফিরিতে হইয়াছে। প্রকৃতির কর্ম্মশালার রহস্য-যবনিকা যে কোন কালে উত্তোলিত হইবে, তাহারও আশা নাই। সুতরাং জগৎ-রচনার প্রারম্ভে কি প্রকারে মৌলিক পরমাণুগুলির সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা ডাল্টন সাহেব বলিতে পারেন নাই।

সুকৌশলে চুরুটের ধোঁয়া ছাড়িলে, ধোঁয়া ঘুরিয়া এক প্রকার অঙ্গুরীয়ের আকার প্রাপ্ত হয়, এবং কাছাকাছি আসিলে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে আকর্ষণ-বিকর্ষণের ভাব দেখা যায়। গত শতাব্দীর শেষে এই ব্যাপারটা আচার্য্য হেল্ম্‌হোজ ও লর্ড কেল্‌ভিনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। তখন ইঁহারা জড়োৎপত্তির ও মহাকর্ষণের (Gravitation) মূল কারণ আবিষ্কারে ব্যস্ত ছিলেন। কেল্‌ভিনের মনে হইয়াছিল, ধোঁয়ার ন্যায় লঘু পদার্থের ঘূর্ণনে যে অঙ্গুরীয়ের উৎপত্তি হয়, তাহাতে যখন আকর্ষণ বিকর্ষণের কাজ দেখা যাইতেছে, সর্ব্বব্যাপী ঈথরের ঘূর্ণনজাত অঙ্গুরীয়ে আকর্ষণ বিকর্ষণের কাজ আরো সুস্পষ্ট দেখারই সম্ভাবনা। কেল্‌ভিন্ অনুমান করিলেন, ঈথরের অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অংশের ঘূর্ণনজাত ক্ষুদ্র অঙ্গুরীয়গুলিই মূল জড় পদার্থ। হেল্ম্‌হোজ সাহেব গণিতের সাহায্যে এই সিদ্ধান্তেরই পোষণ করিয়াছিলেন। কিন্তু শেষে স্বয়ং কেল্‌ভিনই ইহাতে অবিশ্বাসী হইয়া পড়িয়াছিলেন। কাজেই, পদার্থের মূল-উপাদানের রহস্যটা তিমিরাবৃতই রহিয়া গিয়াছিল।

লর্ড কেল্‌ভিনের পূর্ব্বোক্ত গবেষণার পরে এ পর্য্যন্ত জড়ের মূল উপাদান-নির্ণয়ের জন্য আর নূতন চেষ্টা হয় নাই। ডাল্টনের সেই পরমাণুর সিদ্ধান্তে বিশ্বাস রাখিয়া সকলেই বলিয়া আসিতেছিলেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, তাম্রলৌহাদি কতকগুলি জিনিসই মূল জড়পদার্থ এবং তাহাদেরি বিচিত্র সম্মিলনে জগতের নানা পদার্থের সৃষ্টি চলিতেছে। কিন্তু আজকাল ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও আমেরিকার বড় বড় বৈজ্ঞানিকগণ যে

ইলেক্ট্রন (Electron or corpuscles)-নামক এক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পদার্থের সন্ধান পাইয়াছেন, তাহাকেই অনেকে জড়ের মূল-উপাদান বলিতে চাহিতেছেন। এই নবাবিষ্কৃত ইলেক্ট্রন বা অতি-পরমাণুর উপরেই জড়তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে।

অতি-পরমাণু জিনিষটা কি, প্রথমে আলোচনা করা যাউক। কাচ বা গালা প্রভৃতি কতকগুলি জিনিসকে ফ্লানেল বা অপর পশমী কাপড় দিয়া ঘষিলে, তাহাতে বিদ্যুৎ জন্মে এবং সঙ্গে সঙ্গে কাপড়েও এক প্রকার বিদ্যুৎ জমা হয়। এই দুই জাতীয় বিদ্যুতের কার্য্য কতকটা বিপরীত। ফ্লানেলের বিদ্যুৎ গালার বিদ্যুৎকে আকর্ষণ করে, কিন্তু সেই ফ্লানেলের বিদ্যুৎকে আর এক খণ্ড ফ্লানেলের বিদ্যুতের নিকটে ধরিলে, তখন আর আকর্ষণের ভাব দেখা যায় না। এস্থলে উভয় বিদ্যুৎ পরস্পর দূরে থাকিবার চেষ্টা করে। তবেই দেখা যাইতেছে, একজাতীয়ই বিদ্যুতের মধ্যে বিকর্ষণ এবং ভিন্ন জাতীয়ের মধ্যে আকর্ষণ একটা সাধারণ ধর্ম্ম। বৈজ্ঞানিকগণ এই দুই বিদ্যুতের মধ্যে একটিকে ধনাত্মক (Positive) এবং অপরটিকে ঋণাত্মক (Negative) আখ্যা দিয়াছেন।

আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ বলিতেছেন, পূর্ব্বোক্ত ধনাত্মক বিদ্যুৎ ঈথরের অতি সূক্ষ্ম অংশ ব্যতীত আর কিছুই নয়। রসায়নবিদ্‌গণ পরমাণুর যে প্রকার আয়তন নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, এক একটি ধনাত্মক বিদ্যুৎকণা তাহা অপেক্ষা বৃহত্তর নয়। এগুলির ভার নাই এবং অতি উৎকৃষ্ট অণুবীক্ষণ যন্ত্রেও তাহাদের অস্তিত্ব ধরা পড়ে না। ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী ঈথরের এক একটি অতি সূক্ষ্ম অংশ পৃথক্ হইয়া যে, কি প্রকারে ধনাত্মক তড়িদ্রূপে বিকাশ পায়, তাহা আজও জানা যায় নাই।

ঋণাত্মক বিদ্যুৎ সম্বন্ধে অনেক ব্যাপার জানা গিয়াছে। স্থূল কথায় বলিতে গেলে, ইহাকে অতিসূক্ষ্ম জড়কণাই বলিতে হয়। হিসাব করিয়া

দেখা গিয়াছে, প্রায় আটশত ঋণাত্মক বিদ্যুতের কণা জমাট না বাঁধিলে, একটি হাইড্রোজেনের পরমাণুর অনুরূপ ভার পাওয়া যায় না। আয়তনে ইহারা ততোধিক ক্ষুদ্র। হাইড্রোজেনের একটি মাত্র পরমাণুর অধিকৃত স্থানে কোটি কোটি ঋণাত্মক বিদ্যুতের কণা অবাধে বিচরণ করিতে পারে।

পূর্ব্বোক্ত ঋণত্মাক বিদ্যুতের কণাকেই বৈজ্ঞানিকগণ ইলেক্ট্রন্ সংজ্ঞা দিয়াছেন। আমরা ইহাকেই অতি-পরমাণু বলিতেছি। বায়ুহীন কাচ-নলের দুই প্রান্তে ব্যাটারির তার সংযুক্ত রাখিয়া বিদ্যুৎ চালাইতে থাকিলে, নলের ভিতরে ঐ অতি-পরমাণুর অর্থাৎ ঋণাত্মক বিদ্যুতের কণার প্রবাহ চলিতে থাকে। বন্দুকের গুলি যেমন হঠাৎ বাধা পাইলে, অবরোধক জিনিসটাকে কাঁপাইয়া তুলে, বায়ুহীন নলের ভিতরকার এই অতি-পরমাণুর প্রবাহও প্লাটিনম্ প্রভৃতি গুরু ধাতুকর্ত্তৃক অবরুদ্ধগতি হইলে, সেই প্রকারে ধাতু-ফলককে কাঁপাইতে থাকে, এবং ইহার ফলে পার্শ্বস্থ ঈথরও স্পন্দিত হইয়া এক প্রকার আলোক-তরঙ্গ উৎপাদিত করিতে থাকে। এই আলোকই বিখ্যাত রন্‌জেন্ (Rontgen) রশ্মি।

একটি সহজ পরীক্ষায় অতি-পরমাণুর সূক্ষ্মতার পরিচয় পাওয়া যায়। পূর্ব্ববর্ণিত নলের ভিতরে প্লাটিনম্‌ফলক রাখিয়া প্রবাহের গতি রোধ কর। অতি-পরমাণুগুলি প্লাটিনমের ন্যায় গুরু ধাতুর বাধা ভেদ করিয়া বাহির হইতে পারিবে না। কিন্তু আলুমিনিয়ম্ প্রভৃতি লঘু ধাতুর পাত দিয়া উহাদের গতিরোধ করিলে, প্রবাহের কোন পরিবর্ত্তনই দেখা যাইবে না। এস্থলে অতি-পরমাণুগুলি লঘু ধাতুর বাধা ভেদ করিয়া অনায়াসে বাহির হইতে থাকিবে। প্লাটিনমের অণুসকল খুব ঘনসন্নিবিষ্ট; কাজেই, ইহার দুইটি পাশাপাশি অণুর ভিতর যে ব্যবধান থাকে, তাহার মধ্য দিয়া অতি-পরমাণু বাহির হইতে পারে না। প্লাটিনমের তুলনায় আলুমিনিয়ম্ অনেক লঘু,

এজন্য ইহার আণবিক ব্যবধানও বৃহত্তর। কাজেই, ইহার অণুর ব্যবধানের ভিতর দিয়া অতি-পরমাণুর নির্গমন কঠিন হয় না। প্লাটিনমের তুলনায় আলুমিনিয়মের আণবিক অন্তর বৃহত্তর বটে, কিন্তু এই বৃহৎ ব্যবধান আমাদের চক্ষে এত ছোট দেখায় যে, অণুবীক্ষণযন্ত্র দিয়াও তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না। সুতরাং এক একটি অতি-পরমাণু কত ক্ষুদ্র হইলে, তাহা সেই অতি সূক্ষ্ম আণবিক ব্যবধানের ভিতর দিয়া অনায়াসে যাওয়া-আসা করিতে পারে, তাহা আমরা অনায়াসে অনুমান করিতে পারি।

এখন মনে করা যাউক, এক এক পরমাণুপ্রমাণ ধনাত্মক বিদ্যুৎকণার ভিতর যেন লক্ষ লক্ষ অতি-পরমাণু অর্থাৎ ঋণাত্মক বিদ্যুতের কণা আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ধনাত্মক ও ঋণাত্মক তড়িৎ পরস্পরকে আকর্ষণ করে, এবং কেবল ধনাত্মক বা কেবল ঋণাত্মক তড়িৎ পরস্পর দূরে যাইবার চেষ্টা করে। সুতরাং এখানে ধনাত্মক তড়িতের কোষে আবদ্ধ ইলেক্ট্রনগুলি যে, পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইবার জন্য ছুটাছুটি আরম্ভ করিবে, তাহা আমরা অনায়াসে বুঝিতে পারি। কিন্তু এই ছুটাছুটিতে উহারা সেই আবদ্ধ স্থান হইতে বাহির হইতে পারে না, কারণ, বাহিরে যে ধনাত্মক বিদ্যুতের কোষ আছে, তাহাই উহাদিগকে সেই পরমাণুপ্রমাণ সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর ভিতর রাখিয়া দেয়।

অধ্যাপক লজ্, র‍্যাম্‌জে, রদারফোর্ড্ এবং সডি (Soddy)-প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণ বলিতেছেন, ধনাত্মক তড়িতের পরমাণুপরিমিত কোষের ভিতরে আবদ্ধ অতি-পরমাণুর ছুটাছুটি জগতে নিয়তই চলিতেছে এবং ঐ ধনাত্মক তড়িতের ভিতরকার লক্ষ লক্ষ অতি-পরমাণু লইয়াই আমাদের পরিচিত এক এক একটি পরমাণুর (Atom) গঠন হইয়াছে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সকল বস্তুর পরমাণু সমান নয়। লৌহের পরমাণু তাম্রের পরমাণু হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। গুরুত্বে বা সাধারণ গুণে

উহাদের কোনই ঐক্য নাই। ইহারি ব্যাখ্যানে নূতন সিদ্ধান্তিগণ বলিতেছেন, পরমাণুমাত্রেরই কোষে ধনাত্মক বিদ্যুতের পরিমাণ একই থাকে বটে, কিন্তু কোষাস্থিত অতি-পরমাণুর সংখ্যা পরমাণুমাত্রেই এক নয়। যতগুলি অতি-পরমাণু আবদ্ধ থাকিয়া হাইড্রোজেনের পরমাণু রচনা করে, পারদের পরমাণুতে তাহারি তেইশগুণ অতি-পরমাণু জড় হয়। এইজন্যই পারদের পারমাণবিক গুরুত্ব (Atomic weight) হাইড্রোজেনের তেইশ গুণ।

প্রহরীর সংখ্যা না বাড়াইয়া কয়েদীর সংখ্যা ক্রমাগত বাড়াইতে থাকিলে, জেলখানা হইতে দু'চার জন কয়েদীর পলায়নের সম্ভাবনা দেখা যায়। পরমাণুমাত্রেই ধনাত্মক বিদ্যুতের পরিমাণ সমান, কিন্তু ইহা যে-সকল অতি-পরমাণুকে প্রহরীর ন্যায় আবদ্ধ রাখে, তাহাদের সংখ্যা পদার্থ-ভেদে কখন অধিক এবং কখন অল্প দেখা গিয়া থাকে। কাজেই, যে সকল পরমাণুতে অতি-পরমাণুর সংখ্যা অত্যন্ত অধিক, তাহা হইতে মাঝে মাঝে দুই-দশটা অতি-পরমাণু ধনাত্মক বিদ্যুতের বাধা অতিক্রম করিয়া যে বাহির হইয়া পড়িবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি! প্রত্যেক পরীক্ষায় অতি-পরমাণুর এইপ্রকার প্রয়াণ সত্যই আবিষ্কৃত হইয়াছে। স্থির হইয়াছে, যে সকল পরমাণুতে অতি-পরমাণুর সংখ্যা হাইড্রোজেনের পরমাণুস্থিত অতি-পরমাণুর দুইশত গুণ, কোষের ধনাত্মক তাড়িৎ কোন গতিকে সেই অতি-পরমাণুগুলিকে আট্‌কাইতে পারে। কিন্তু সংখ্যা এই সীমা অতিক্রম করিলেই অতি-পরমাণু পরমাণুকোষের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী ত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া পড়ে।

ইউরেনিয়ম্, রেডিয়ম্, হেলিয়ম্ প্রভৃতি কতকগুলি দুর্লভ ধাতুর পরমাণুতে অত্যন্ত অধিক পরিমাণে অতি-পরমাণু আছে। এইজন্য এগুলি হইতে সর্ব্বদাই অতি-পরমাণু বাহির হইয়া থাকে। রেডিয়ম্‌জাতীয়

কয়েকটি গুরুধাতুর তেজোবিকিরণ লইয়া আজকাল বৈজ্ঞানিক-জগতে যে আন্দোলন চলিতেছে, পাঠক তাহার কথা অবশ্যই শুনিয়াছেন। নূতন সিদ্ধান্তিগণের মতে, ঐ সকল ধাতুর তেজ সেই বন্ধনমুক্ত অতি-পরমাণুর প্রবাহ ব্যতীত আর কিছুই নয়।

তেজ নির্গত করা কেবল রেডিয়ম্‌জাতীয় ধাতুর গুণ নয়। সম্প্রতি দেখা গিয়াছে, যে সকল ধাতুর পরমাণুর গুরুত্ব অতি অল্প, সেগুলি হইতেও কখন অতি-পরমাণুর প্রবাহ তেজের আকারে নির্গত হয়। ইহার ব্যাখ্যানে নূতন সিদ্ধান্তিগণ বলিতেছেন, পরস্পর বহুদূরে থাকিয়া ছুটাছুটি করিতে করিতে অনন্ত আকাশস্থ জ্যোতিষ্কগণকেও যখন ধাক্কা খাইতে দেখা যায়, তখন এক পরমাণুর অধিকৃত স্থানে লক্ষ লক্ষ গতিশীল অতি-পরমাণুর মধ্যে যে, সেই প্রকার সংঘর্ষণ হইতে পারে না, তাহা কোনক্রমে বলা যায় না। সংঘর্ষণ হইলে, সংঘর্ষণপ্রাপ্ত বস্তুর মধ্যে দুই একটি অবস্থাবিশেষে বল সঞ্চয় করে। কাজেই, লঘু পরমাণুস্থিত অতি-পরমাণুগুলির মধ্যে ঐপ্রকার সংঘর্ষণ উপস্থিত হইলে, কতকগুলি বেগবান হইয়া ও বাহিরের ধনাত্মক বিদ্যুতের বাধা অতিক্রম করিয়া যে বাহির হইয়া পড়িবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি!

সুতরাং দেখা যাইতেছে, নূতন তত্ত্বটিকে মানিয়া লইলে, পরমাণুর বিয়োগও মানিতে হয়। অধ্যাপক রদার্‌ফোর্ড্ কয়েক বৎসর ধরিয়া যে সকল গবেষণা করিয়াছেন, তাহাতে পরমাণুর বিয়োগ ধরা পড়িয়াছে। ইনি রেডিয়মের তেজ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। তাহাতে পূর্ব্ববর্ণিত অতি-পরমাণুর প্রবাহ ছাড়া আরো দুইপ্রকার তেজ মিশ্রিত থাকে। এই দুটির মধ্যে একটি সাধারণ আলোকের রশ্মি। অতি-পরমাণুর পরস্পর সংঘর্ষণজাত ঈথর-তরঙ্গ হইতেই ইহার উৎপত্তি। অপরটি হেলিয়ম্‌নামক আর একটি ধাতুর বাষ্প। বৈজ্ঞানিকগণ ঠিক করিয়াছেন, অতিগুরু

পরমাণু হইতে নির্গত অতি-পরমাণুগুলির সকলই তেজের আকারে থাকিতে পারে না। তাহাদের কতকগুলি জমাট বাঁধিয়া কোন লঘুতর পদার্থের পরমাণু রচনা করে। এইজন্যই রেডিয়মের অতি-পরমাণুর প্রবাহ একত্র হইয়া হেলিয়মে পরিণত হয়। কাজেই, পরমাণু যে বিয়োগধর্ম্মী এবং কোন এক পরমাণুর বিয়োগে যে, অবস্থাবিশেষে স্বতন্ত্র বস্তুর পরমাণুর সৃষ্টি সম্ভবপর, তাহা রেডিয়মের তেজঃপরীক্ষায় প্রতিপন্ন হইতেছে।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, যখন সকল বস্তুরই পরমাণু হইতে আসৃষ্টি অল্পাধিক পরিমাণে অতি-পরমাণুর প্রবাহ বাহির হইতেছে, তখন পদার্থ-মাত্রেরই বিয়োগ অবশ্যম্ভাবী বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে কি? ইহার উত্তরে বৈজ্ঞানিকগণ বলিতেছেন,কোন কোন বস্তু হইতে প্রচুর অতি-পরমাণু নির্গত হয় সত্য, কিন্তু পরমাণুর মধ্যস্থিত সমবেত অতি-পরমাণুর সংখ্যার তুলনায় ইহাদের পরিমাণ এত তুচ্ছ যে, লক্ষ লক্ষ বৎসর অতীত না হইলে এই ক্ষয় পরমাণুকে বিকৃত করিতে পারিবে না। যতগুলি পদার্থের সহিত আমাদের পরিচয় আছে, তাহার মধ্যে রেডিয়মের পরমাণুর গুরুত্বই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। কাজেই, ইহা হইতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে অতি-পরমাণু নির্গত হয়। কিন্তু রেডিয়মের পরমাণুস্থ সমবেত অতি-পরমাণুর সংখ্যা, বহির্গত অতি-পরমাণুর তুলনায় এত অধিক যে, এই ক্ষয় হিসাবে না ধরিলে কোন ক্ষতি হয় না। গণনা করিয়া দেখা গিয়াছে, রেডিয়মের পরমাণুস্থিত অতি-পরমাণুগুলি হইতে একবৎসর কালে প্রতি দশহাজারে কেবল একটিমাত্র বাহির হইয়া পড়ে। কাজেই, অতি-পরমাণুর বৃহৎ ভাণ্ডার হইতে এইপ্রকার ব্যয় করিতে করিতে রেডিয়মের পরমাণু যে, বহুকাল নিজের অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিবে, তাহা আমরা সহজেই বুঝিতে পারি। কালের অন্ত নাই। অনন্ত কাল আমাদের সম্মুখে প্রসারিত রহিয়াছে। সৃষ্টপদার্থ হইতে যে অতি-পরমাণুর ধীর ক্ষয় হইতেছে, তাহা দূর ভবিষ্যতে

একদিন পরমাণুকে বিকৃত করিবেই। কাজেই, এই নব তত্ত্বে বিশ্বাস করিলে বলিতে হয়, সেই সময়ে সৃষ্টির বর্ত্তমান রূপ কখনই থাকিবে না। যে মূল উপাদান অর্থাৎ অতি-পরমাণু লইয়া সমগ্র জড়ের পরমাণুর রচনা হইয়াছে, সম্ভবতঃ সেই সময়ে নানা ভাঙা-গড়ার ভিতর দিয়া সকল বস্তুই আবার মুক্ত অতি-পরমাণুপুঞ্জে পরিণত হইবে। ইহাই কি মহাপ্রলয়ের আর এক মূর্ত্তি ?

প্রাচীন রসায়নশাস্ত্র

অধিক দিনের কথা নয়, প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে রসায়নশাস্ত্রের অবস্থা খুব ভাল ছিল না। অতি প্রাচীন রসায়নবিদ্‌গণের ন্যায় সেকালের পণ্ডিতগণ লৌহকে স্বর্ণে পরিণত করিবার জন্য বৃথা চেষ্টা করিতেন না বটে; কিন্তু শাস্ত্রজ্ঞানে তাঁহারা প্রাচীনদিগের ন্যায়ই দীন ছিলেন। আমাদের দেশের প্রাচীন পণ্ডিতগণ যেমন ক্ষিতি, অপ্, তেজ, বায়ু ও আকাশকে মূলপদার্থ বলিয়া স্বীকার করিতেন, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ তেমনি আকাশ ব্যতীত অপর চারিটিকে ভূতপদার্থ বলিয়া মানিতেন। যৌগিক পদার্থসম্বন্ধেও ইঁহাদের জ্ঞান অধিক ছিল না। দুই একটি দ্রাবক (Acid) এবং কয়েকটি ক্ষার (Alkalies) নাড়া চাড়া করিয়া ইঁহাদিগকে তুষ্ট থাকিতে হইত।

জল, স্থল, অগ্নি ও বায়ু ছাড়া পাশ্চাত্য রসায়নবিদ্‌গণ দীপকনামক (Phlogiston) আর একটি মূল পদার্থকে মানিতেন। কতক জিনিস অল্প তাপসংযোগে প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, আবার কতকগুলি বহু তাপেও জ্বলে না। রসায়নবিদ্‌গণ এই দহনব্যাপারের কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া পূর্ব্বোক্ত দীপক পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইঁহারা বলিতেন, দীপককে আমরা জলস্থলের ন্যায় চক্ষে দেখিতে পাই না বটে, কিন্তু কার্য্যদ্বারা উহার অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। পদার্থমাত্রেরই অস্থিমজ্জায় জিনিসটা অল্পাধিক পরিমাণে জড়িত থাকে। কোন উপায়ে উহাকে ঐসকল পদার্থ হইতে বিচ্যুত করিতে পারিলেই তাপালোকের উৎপত্তি হয়। ১৭৭৬ অব্দে ক্যাবেণ্ডিস্ সাহেব হাইড্রোজেন্ আবিষ্কার

করেন। এই নবাবিষ্কৃত বায়ব পদার্থকে তাপসংযোগে পুড়িতে দেখিয়া, ইহাকেও পণ্ডিতগণ দীপকের কার্য্য বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। ব্যাখ্যানে শুনা যাইত, অপর পদার্থে দীপক যেমন নিবিড়ভাবে মিশ্রিত থাকে, হাইড্রোজেনে দীপক সেপ্রকার দৃঢ়সংশ্লিষ্ট না থাকিয়া কতকটা মুক্তাবস্থায় অবস্থান করে। এই কারণেই সেই মুক্ত দীপক তাপসংস্পর্শে জ্বলিয়া হাইড্রোজেন্‌কে পোড়াইতে থাকে।

দীপশিখা কিছুক্ষণ আবদ্ধ পাত্রে রাখিলে নির্ব্বাপিত হইয়া যায়। প্রাচীন পণ্ডিতগণ ইহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ইঁহারা বলিতেন, আবদ্ধ স্থানের বায়ুতে দীপক খুব নিবিড়ভাবে বায়ুর সহিত মিশ্রিত থাকে। কাজেই, মুক্ত দীপকের অভাবে দীপ নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হয়। এইপ্রকারে ছোট-বড় সকল রাসায়নিক ব্যাপারকেই কেবল দীপকের গণ্ডীর ভিতর ফেলিবার জন্য প্রাচীনদিগের চেষ্টা ছিল। অবৈজ্ঞানিক সাধারণ লোক প্রবীণ বৈজ্ঞানিকদিগের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারিত না। কাজেই, রসায়নশাস্ত্রে দীপকের রাজত্ব দীর্ঘকাল অব্যাহতপ্রভাবে চলিয়াছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যেমন এক রাষ্ট্রবিপ্লবের প্রবল বন্যা ফরাসী দেশ হইতে উৎপন্ন হইয়া য়ুরোপের রাজশ্রীকে বিধ্বস্ত করিয়াছিল, জড়-বিজ্ঞানের নানা শাখাপ্রশাখার ভিত্তিগুলিও সেই প্রকার একটি বিরাট্ বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের তরঙ্গাঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। জলস্থল, অগ্নি-বায়ু ও দীপককে মূলপদার্থ কল্পনা করিয়া দীর্ঘ গবেষণার ফলে যে রসায়নী বিদ্যার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, নবীন বৈজ্ঞানিকদিগের আবিষ্কারে প্রাচীন শাস্ত্রের সেই পাঞ্চভৌতিক ভিত্তি চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছিল। মৃত্তিকা, জল, বায়ু যে মূলপদার্থ নয়, এবং সেগুলিকে যে সহজে বিশ্লিষ্ট করা চলে, নব্য পণ্ডিতগণ পরীক্ষাগারে তাহা প্রত্যক্ষ দেখাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

কাজেই, প্রাচীনদিগের সেই অতিপ্রিয় সামগ্রী দীপকের অস্তিত্বের উপরে লোকের অবিশ্বাস হইয়াছিল। এই সময়ে বহুশাস্ত্রবিৎ প্রিষ্ট্‌লি সাহেব কর্ত্তৃক অক্সিজেন্ আবিষ্কৃত হওয়ায় অবিশ্বাস চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল।

যখন নবাবিষ্কৃত অক্সিজেনের দাহিকা শক্তি লইয়া বৈজ্ঞানিক মহলে তুমুল আন্দোলন চলিতেছিল, তখন ফরাসী পণ্ডিত ল্যাভোসিয়ার তাঁহার নির্জ্জন পরীক্ষাকক্ষে বসিয়া অক্সিজেন্ সম্বন্ধীয় নানা গবেষণায় নিযুক্ত ছিলেন। তিনি সাধারণ বৈজ্ঞানিকদিগের ন্যায় চিরাগত প্রথায় সেই দীপককে একমাত্র দাহনক্ষম বস্তু বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন নাই। প্রাচীন বৈজ্ঞানিকদিগের বহুবর্ষব্যাপী তর্কদ্বন্দ্ব ও বাদবিসংবাদের উচ্চ কোলাহল রাসায়নিক রহস্যের কঠিন আবরণ ভেদ করিয়া যে, তখনও শাস্ত্রের মূলে পৌছায় নাই, ল্যাভোসিয়ার তাহা বেশ বুঝিয়াছিলেন।

ইনি এই সময়ে এক পরীক্ষায় দেখিয়াছিলেন, অক্সিজেন্-পূর্ণ পাত্রে কোন পদার্থ পোড়াইলে তাহাতে অক্সিজেনের আর কোন চিহ্নই পাওয়া যায় না। পাত্রস্থিত অক্সিজেনের এই আকস্মিক তিরোভাব ল্যাভোসিয়ারের নিকট বড়ই অদ্ভুত ঠেকিয়াছিল, এবং তিনি এই ব্যাপারটি লইয়া কিছু-কাল গবেষণা করিয়া অগ্নিস্পর্শে অক্সিজেন্ দগ্ধীভূত বা রূপান্তরিত হইতে পারে বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। দীপক-পদার্থের সাহায্যে যে-সকল রাসায়নিক কার্য্যের সাধন পূর্ব্বে কল্পনা করা হইত, এক অক্সিজেন্ দ্বারা যে, সে-সকল কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারে, তাহা ল্যাভোসিয়ার প্রত্যক্ষ দেখিতে লাগিলেন। কাজেই, দীপকের ন্যায় এক সৃষ্টিছাড়া পদার্থ মানিয়া লইবার কোন হেতুই দেখা গেল না, এবং উহার অস্তিত্বের সন্তোষজনক প্রমাণ প্রাচীন সম্প্রদায়ের মধ্যে কেহই দেখাইতে পারিলেন না। দীপকপদার্থ যে নিছক কল্পনাপ্রসূত একটা নিরর্থক শব্দ ব্যতীত আর কিছুই নয়, নিরপেক্ষ ব্যক্তিগণ তাহা বেশ বুঝিতে লাগিলেন। নব্য বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়ের

অগ্রণী ল্যাভোসিয়ার সাহেব কেবল অক্সিজেন্-সাহায্যে তাঁহার ক্ষুদ্র পরীক্ষাগারে এই প্রকারে নব্য রসায়নীবিদ্যার ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন।

পুরাতনের উপর অন্ধ অনুরাগ দ্বারা রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক ও ধর্ম্মজগতে যত রক্তপাত হইয়াছে, প্রাচীন বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের প্রতি অযথা বিশ্বাসে তত অধিক হয় নাই সত্য, কিন্তু পুরাতনের বর্জ্জন এবং নূতন সত্যের প্রতিষ্ঠাকালে উভয় পক্ষেই অশান্তির মাত্রা সমান হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। যখন সর্ব্বগ্রাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের প্রবল বহ্নি ফরাসী রাজ্যে উৎপন্ন হইয়া সমগ্র য়ুরোপকে ভস্মীভূত করিবার উপক্রম করিতেছিল, তখন অরাজনৈতিক শান্তস্বভাব বৈজ্ঞানিকগণও তাঁহাদের প্রকৃতিগত সংযম ও ধৈর্য্য লোপ করিয়া উন্মত্তের ন্যায় পরস্পরের প্রতি গালিবর্ষণ আরম্ভ করিয়াছিলেন। নবীন ল্যাভোসিয়ার, কয়েকটি ক্ষুদ্র আবিষ্কার দ্বারা যে অতি পুরাতন রসায়নশাস্ত্রকে চূর্ণ করিবেন, তাহা প্রাচীন বৈজ্ঞানিক-দিগের নিকট অসহ্য হইয়া উঠিল। জর্ম্মানীর অতি বৃদ্ধ পণ্ডিতগণও তাঁহাদের পরীক্ষাপ্রকোষ্ঠ ত্যাগ করিয়া পরমশত্রু ল্যাভোসিয়ারের দারুময় মূর্ত্তিতে অগ্নিসংযোগ করিতে লাগিলেন। রক্ষণশীল বৈদেশিক পণ্ডিতগণের প্রতিবাদ-কোলাহলে ও জয়োল্লাসের উন্মত্ত চীৎকারে ল্যাভোসিয়ার ও তাঁহার অল্পসংখ্যক শিষ্যগণের ক্ষীণকণ্ঠ শুনা গেল না।

এই সময়ে একটি অভাবনীয় দৈবঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল। প্রবীণ বৈজ্ঞানিকগণ যখন প্রতিবাদের কোলাহলে ল্যাভোসিয়ারের কণ্ঠরোধের চেষ্টা করিতেছিলেন, তখন অপমৃত্যু আসিয়া নবীন আবিষ্কারককে চিরদিনের জন্য নীরব করিয়াছিল। স্বদেশপ্রেমিক ল্যাভোসিয়ারকে তাঁহার নির্জ্জন পরীক্ষা-গার হইতে বাহির করিয়া বিপ্লবকারিগণ কুক্কুরের ন্যায় তাঁহাকে রাজপথে হত্যা করিয়াছিল। প্রতিপক্ষগণ শত্রুনাশে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছিলেন।

যাহা অভ্রান্ত ও সত্য, প্রতিকূল অবস্থায় পড়িয়া তাহা তৃণাচ্ছাদিত

অগ্নির ন্যায় কিছুকাল নির্বীর্য্য হইয়া থাকিতে পারে বটে, কিন্তু পর মুহূর্ত্তে সে আপনার সুযোগ আপনিই অনুসন্ধান করিয়া আত্মগৌরব প্রকাশ করিতে ছাড়ে না। যুবক ল্যাভোসিয়ার অল্পদিনের গবেষণায় যে রাসায়নিক সারসত্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাঁহার উপযুক্ত শিষ্যগণের যত্নে তাহাই সমগ্র ফরাসী দেশে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। দলে দলে ভক্ত আসিয়া ল্যাভোসিয়ারের দল পুষ্ট করিতে লাগিল। জগদ্বিখ্যাত তাপতত্ত্ববিৎ ব্ল্যাক্ সাহেব, জলের বিশ্লেষক আচার্য্য ক্যাভেণ্ডিস্ এবং নাইট্রোজেনের আবিষ্কারক অধ্যাপক রদারফোর্ড-প্রমুখ বিখ্যাত পণ্ডিত-মাত্রই প্রথমে নবসিদ্ধান্তের ঘোর বিরোধী ছিলেন, কালক্রমে একে একে সকলেই ল্যাভোসিয়ারের উক্তির সত্যতা বুঝিতে লাগিলেন। কেবল প্রতিভাবান্ প্রিষ্ট্‌লি সাহেবকে সেই প্রাচীন দীপকসিদ্ধান্ত হইতে কেহই বিচ্যুত করিতে পারিল না। অক্সিজেন্-আবিষ্কার দ্বারা ইনি নূতন রসায়ন-শাস্ত্রের জনক হইয়াও পুরাতনকে আঁকড়াইয়া রহিলেন। যখন তাঁহার শেষ প্রিয় শিষ্যটি বিশ্বাসান্ধ গুরুকে ত্যাগ করিয়া গেল, তখনও তিনি পুরাতনকে ছাড়িতে পারেন নাই। রসায়নশাস্ত্রের জীর্ণ ভিত্তির উপর প্রাচীন সিদ্ধান্তের পতাকা প্রোথিত করিয়া তিনি বীরের ন্যায় বিদ্রোহী সহচরদিগকে ক্ষমা করিবার জন্য জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু বৃদ্ধের ক্ষীণ ও আকুল আহ্বান কাহারো কর্ণগোচর হইল না। বিজ্ঞানরথী প্রিষ্ট্‌লির জীবনের সহিত রসায়নশাস্ত্রের সেই প্রাচীন পাঞ্চভৌতিক ও দীপক-সিদ্ধান্ত চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হইয়া গেল।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে রসায়নী বিদ্যার শেষ জীর্ণ স্তম্ভটি ভূপতিত হইলে, নূতন যুগের আরম্ভ হইয়াছিল সত্য, কিন্তু নূতনকে কি আকারে গড়িতে হইবে, তাহা হঠাৎ স্থির হয় নাই। ল্যাভোসিয়ার অক্সিজেনের আবিষ্কার দ্বারা কেবল পুরাতনকে স্থানচ্যুত করিয়াছিলেন মাত্র। নূতনকে মূর্ত্তিমান্

করিবার ভার উনবিংশ শতাব্দীর নবীন বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়ের উপরই পড়িয়াছিল। বৃহৎ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলির ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে, অনেক সময়েই এক একটি অবান্তর ব্যাপারে তাহাদের মূল নিহিত দেখা যায়। আবিষ্কার করিবার সঙ্কল্প করিয়া কোন বৈজ্ঞানিকই কোন মহাতত্ত্বের সন্ধান পান নাই। প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডাল্টন্ সাহেব প্রসঙ্গান্তরের গবেষণায় রসায়নশাস্ত্রকে গড়িবার কৌশল আবিষ্কার করিয়াছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে কেহই ডাল্টনের নাম জানিতেন না। ইংলণ্ডের এক ক্ষুদ্র পল্লীতে থাকিয়া বৃষ্টিবাত্যাদির পরিমাপ করা ইঁহার কাজ ছিল। স্বহস্তনির্ম্মিত ক্ষুদ্র বৃষ্টিমাপক যন্ত্র দ্বারা বৎসরের বারিপাত পরিমাপ করিয়া তিনি যখন গণনার ফল স্থানীয় কৃষকদিগের নিকট প্রকাশ করিতেন, সকলে অবাক্ হইয়া তাঁহার কথা শুনিত। কিন্তু তাহাদের এই পল্লী বৈজ্ঞানিক যে, একদিন কোন আবিষ্কার দ্বারা জগৎকে অবাক্ করিবে, তখন তাহারা সেটা মনেই করিতে পারে নাই।

মেঘ-বৃষ্টি ও জলীয় বাষ্পাদির পর্য্যবেক্ষণকালে হঠাৎ ডাল্টনের মনে হইয়াছিল, জলই তো বাষ্পাকারে আকাশে থাকে এবং সেই বাষ্প হইতেই মেঘের উৎপত্তি। কিন্তু একই স্থানে যখন যুগপৎ দুই বস্তুর অবস্থান অসম্ভব, তখন জলীয় বাষ্প কখনই নিবিড় পদার্থ হইতে পারে না। জিনিসটা নিশ্চয়ই কতকগুলি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জলবিন্দুর সমষ্টি। আমাদের দৃষ্টিশক্তি অপ্রখর, তাই আকাশব্যাপী জলীয় বাষ্পের সেই কণাগুলির ব্যবধান আমাদের নজরে পড়ে না। ক্যাভেণ্ডিস্ সাহেব ইতিপূর্ব্বে জলের প্রত্যেক অণুতে যে হাইড্রোজেন্ ও অক্সিজেন্ বাষ্পের অস্তিত্ব দেখিয়াছিলেন, এ-কথাটাও ডাল্টনের মনে পড়িয়া গেল। কাজেই, জলীয় বাষ্পস্থ প্রত্যেক অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্ম কণাতে যে, সূক্ষ্মতর দুই কণা হাইড্রোজেন্ ও এক কণা অক্সিজেন্ মিশানো আছে, তাহাতে আর ইঁহার সন্দেহ রহিল না।

পূর্ব্বোক্ত বিশ্বাসে চালিত হইয়া প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে ডাল্টন্ সাহেব প্রচার করিয়াছিলেন,—সূক্ষ্ম জলকণাকে বিশ্লেষ কর, তাহাতে হাইড্রোজেন্ ও অক্সিজেনের কতকগুলি অতিসূক্ষ্ম কণার সাক্ষাৎ পাইবে। ইহার পরেই তিনি আবার প্রচার করিয়াছিলেন,—জল, স্থল, বায়ু ও অগ্নি মূলপদার্থ নয়।

এই সকল আবিষ্কার করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই। ইহাদের আনুষঙ্গিক নানা গবেষণায় তাঁহাকে কিছুকাল নিযুক্ত থাকিতে হইয়াছিল। যখন তিনি পরীক্ষাকালে দেখিলেন, সূক্ষ্ম হাইড্রোজেন্-কণা, সেইপ্রকার আর এক কণা অক্সিজেনের সহিত মিশিয়া অণুপ্রমাণ জলের উৎপত্তি করিল, তখন এই দুই মূলপদার্থের গুরুত্ব নির্ণয় করা অসম্ভব হইবে না বলিয়া তাঁহার মনে হইয়াছিল। গণনায় তিনি অক্সিজেনের পরমাণুর ওজন হাইড্রোজেন্-পরমাণুর সাড়ে পাঁচ গুণ অধিক বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। ইহার পরই অল্পকাল মধ্যে ডাল্টন্ সাহেব প্রায় ২৫টি পদার্থের পরমাণবিক গুরুত্ব আবিষ্কার করিয়া, তাহার বিশেষ বিবরণ এক বৈজ্ঞানিক সভায় পাঠ করিয়াছিলেন। সমবেত পণ্ডিতগণ নবীন বৈজ্ঞানিকের অসাধারণ প্রতিভা ও পরীক্ষাকুশলতায় মুগ্ধ হইয়া গেলেন। কিন্তু সেই শুভ দিনে পারমাণবিক সিদ্ধান্তের দ্বারা যে, নূতন রসায়নশাস্ত্রের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হইয়া গেল, তাহা তখনও কেহ বুঝিলেন না। আধুনিক উন্নত রসায়নী বিদ্যাকে অদ্যাপি সেই গ্রাম্য বৈজ্ঞানিকের আণবিক সিদ্ধান্তই খাড়া রাখিয়াছে।

এই আবিষ্কারের পর ডাক্তার ওলাষ্টন্, গে লুসাক্, হম্বোল্ট্ ও বুনসেন্ প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণ রসায়নশাস্ত্রের শাখাপ্রশাখার নানা উন্নতি বিধান করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা আধুনিক যুগেরই কথা।

জড় কি অক্ষয় ?

"জগতে রয়েছে কত শশী ভানু,
হারায় না কভু অণু-পরমাণু।"

কবির এই উক্তিটির মধ্যে গভীর বৈজ্ঞানিক সত্য নিহিত আছে। অতিসূক্ষ্ম আণুবীক্ষণিক বালুকণা হইতে আরম্ভ করিয়া গ্রহচন্দ্রতারা ক্ষুদ্র-বৃহৎ কোন বস্তুরই ক্ষয় নাই, এই মহাসিদ্ধান্তটিই আধুনিক জড়-বিজ্ঞানের প্রধান অবলম্বন। প্রকৃতিতে প্রতিমুহূর্ত্তে জড়ের যে রূপান্তর চলিতেছে, তাহাতে কোন বৈজ্ঞানিকই জড় বা শক্তির ক্ষয় দেখিতে পান নাই। আমাদের ক্ষুদ্র কর্ম্মশালাগুলিই কেবল অপচয়, লাভ-ক্ষতি এবং দুঃখদৈন্যে পূর্ণ। যে বিরাট্ কর্ম্মশালায় সহস্র সূর্য্যোপম জ্যোতিষ্ক হইতে আরম্ভ করিয়া অতিসূক্ষ্ম জীবাণু পর্য্যন্ত ছোট-বড় সকল বস্তুরই সৃষ্টি চলিতেছে, তাহাতে একটুও অপচয় নাই। কাজেই, লাভক্ষতির হিসাব কাহাকেও রাখিতে হয় না। জড় ও শক্তি রূপান্তর পরিগ্রহ করিয়াই প্রকৃতির এই নিত্য নূতন আনন্দমূর্ত্তি দেখাইতেছে, নিজেকে ক্ষয় করিয়া নয়। প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনের এই গভীর তত্ত্বটি গত শতাব্দীর পণ্ডিতগণ বিজ্ঞানানুগত প্রথায় আবিষ্কার করিয়াছিলেন। জড়বিজ্ঞানের বর্ত্তমান সমৃদ্ধি ইহারি উপরে প্রতিষ্ঠিত।

পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশটি কি, তাহা জানিবার জন্য রসায়নশাস্ত্র অনুসন্ধান করিলে, পরমাণুর (Atoms) সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। হাইড্রোজেন, গন্ধক প্রভৃতি মূলপদার্থের সূক্ষ্মতম অংশকেই রসায়নবিদ্‌গণ পরমাণু বলিয়া আসিতেছেন। পরমাণুগুলিকে আর ক্ষুদ্রতর অংশে ভাগ করা যায় না। তার পর ইঁহারা বলেন, প্রায় সত্তরটি মূলপদার্থের সত্তর জাতীয়

পরমাণু যখন দুই-দুইটি, তিন-তিনটি বা ইহারো অধিক পরিমাণে একত্র হইয়া জোট বাঁধে, তখন এক একটি অণুর (Molecule) গঠন হয়। আধুনিক রসায়নশাস্ত্রের মতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল জিনিসই এই প্রকার বহুসংখ্যক অণুর যোগে উৎপন্ন। জল একটা যৌগিক পদার্থ। রসায়ন-শাস্ত্রে বিশ্বাস করিলে বলিতে হয়, জিনিসটা কোটিকোটি অণুর একটা প্রকাণ্ড সমষ্টি। ইহার প্রত্যেক অণুটি আবার দুইটি হাইড্রোজেনের এবং একটি অক্সিজেনের পরমাণুর যোগে উৎপন্ন। লোহ একটি মূল পদার্থ। ইহাও কতকগুলি অণুর সমাবেশমাত্র। পার্থক্যের মধ্যে এই যে, ইহার অণুগুলিতে অপর কোন মূলপদার্থের পরমাণু যুক্ত নাই। লোহের এক একটি অণুতে ইহারি পরমাণু যুক্তাবস্থায় বর্ত্তমান।

পরমাণুগুলি গায়ে গায়ে লাগিয়া অণুর উৎপত্তি করে না, এবং অণু-গুলিও একেবারে নিরেটভাবে থাকিয়া পদার্থের গঠন করে না। অণু বা পরমাণু একত্র হইলে তাহাদের মধ্যে বেশ একটা ব্যবধান থাকে। বৈজ্ঞানিকগণ এই ব্যবধানগুলিকে সেই সর্ব্বব্যাপী ঈথরে পূর্ণ বলিয়া মনে করেন।

পদার্থের সূক্ষ্মতম অংশ ঐ পরমাণুরই নানাপ্রকার সংযোগ বিয়োগ দেখাইয়া আজকাল জড়ের অবিনশ্বরতা প্রতিপন্ন করা হইতেছে।

উদাহরণ লওয়া যাউক। মনে করা যাউক, যেন একটি মোমবাতি পুড়িতেছে। কিছুক্ষণ আলোক দিয়া সেটি নিঃশেষে পুড়িয়া অন্তর্হিত হইয়া যায়। এই ব্যাপারটি আমাদের স্থূল-দৃষ্টিতে ক্ষয় বলিয়া বোধ হইলেও, সত্যই তাহা ক্ষয় নয়! বাতির উপাদান এমন কতকগুলি রূপান্তর গ্রহণ করিয়া চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে যে, অবৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি তাহার খোঁজ পায় না। কিন্তু বৈজ্ঞানিক সেই সকল রূপান্তরিত পদার্থ কৌশলে সংগ্রহ করিয়া বাতির যে একটি অণুও ক্ষয় পায় নাই, তাহা

প্রত্যক্ষ দেখাইয়া দেন। কেবল বাতি নয়, পদার্থমাত্রই যখন আমাদের চক্ষুর সম্মুখে থাকিয়া ক্ষয় পায়, দক্ষ-রসায়নবিৎ সঙ্গে সঙ্গে ক্ষয়প্রাপ্ত অংশের রূপান্তর দেখাইতে পারেন। আধুনিক রসায়নী বিদ্যা জড়ের এই অবিনশ্বরতার উপরই প্রতিষ্ঠিত।

জড়ের ন্যায় শক্তিরও যে ক্ষয় নাই, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তাহাও জানা গিয়াছে। জুল (Jolue), হেল্‌ম্‌হোজ (Helmholtz), রম্‌ফোর্ড (Rumford) এবং ডেভি প্রমুখ মহাপণ্ডিতগণ গত শতাব্দীতে এসম্বন্ধে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। এঞ্জিনের চুলোতে কয়লা পুড়িলে, কয়লার শক্তি একটুও ক্ষয় পায় না। উহাই রূপান্তর গ্রহণ করিয়া কলকে গতিশীল করে। বিদ্যুতের শক্তি বিদ্যুতের উৎপাদক কলে প্রযুক্ত কয়লার শক্তিরই রূপান্তর। দস্তা ও তাম্রফলক দ্রাবকপদার্থে ডুবাইয়া যখন আমরা ঘরে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করি, তখন রাসায়নিক শক্তি বিদ্যুতের রূপ গ্রহণ করিয়া দেখা দেয়। প্রকৃতির ভাণ্ডার যে পরিমাণ জড় এবং শক্তিতে পূর্ণ রহিয়াছে, তাহার এক কণারও ক্ষয় নাই। নানাপ্রকার মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া বহিঃপ্রকৃতিতে বিচিত্র কার্য্য দেখানো উহাদের একমাত্র কাজ।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, এই বিশাল বহির্জগতের অস্তিত্ব এবং তাহার বিচিত্র লীলা কেবল জড় ও শক্তিকে অবলম্বন করিয়াই চলিতেছে। এই দুইটিই বিজ্ঞানের পরম সত্য। ইহাদের পরস্পরের সম্বন্ধটা এমন নিগূঢ় যে, একের অভাবে অপরটি থাকিতে পারে না। শক্তিহীন জড় জগতে নাই; এবং জড় নাই অথচ শক্তির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, এপ্রকার ঘটনাও দেখা যায় না। জীব-জগতে দেহ ও প্রাণের সম্বন্ধ যেমন অবিচ্ছেদ্য, বহির্জগতে জড় ও শক্তির সম্বন্ধও কতকটা সেইপ্রকার। জড় চিরদিনই নিশ্চেষ্ট, শক্তি সর্ব্বদাই প্রাণময়। এই দুইয়ের যোগ হইলে,

আমরা শক্তিকে শক্তি বলিয়া চিনিতে পারি, এবং জড়কে জড় বলিয়া জানিতে পারি।

বিশ্বের ভাণ্ডারে যে পরিমাণ জড় আছে, তাহা বাড়াইবার বা কমাইবার শক্তি মানুষের নাই। প্রকৃতির কার্য্যের সহিত আমাদের যেটুকু পরিচয় আছে, তাহাতেও জড়ের সৃষ্টি দেখা যায় না। কিপ্রকারে হঠাৎ একদিন জড় ও শক্তি উৎপন্ন হইয়া এই ব্রহ্মাণ্ডকে মূর্ত্তিমান্ করিয়াছিল, তাহা আধুনিক বিজ্ঞানের একটা প্রকাণ্ড সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক লর্ড কেল্‌ভিন্ সর্ব্বব্যাপী ঈথরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আবর্ত্তগুলিকে জড়কণিকা বলিয়া অনুমান করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, ঈথরের ন্যায় জিনিসে কোন প্রকারে আবর্ত্ত তুলিতে পারিলে সেগুলিকে পার্শ্বস্থ অচঞ্চল ঈথর হইতে পৃথক্ করিয়া লওয়া যায়। সম্ভবতঃ অপার ঈথর-সমুদ্রের এইপ্রকার ছোট ছোট আবর্ত্তগুলিই পৃথক্ গুণবিশিষ্ট হইয়া আমাদের নিকটে জড় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ঈথরে আবর্ত্ত উঠিলে তাহার লয়ের কোন সম্ভাবনা নাই। সুতরাং জড়ের অবিনশ্বরত্তারও একটা ব্যাখ্যান ইহা হইতে পাওয়া যায়। লর্ড কেল্‌ভিনের এই অনুমানটি লইয়া গত শতাব্দীর শেষে খুব আলোচনা চলিয়াছিল। জার্ম্মান পণ্ডিত হেল্‌ম্‌হোজ্‌ও এই আলোচনায় যোগ দিয়াছিলেন, কিন্তু নানা কারণে অনুমানটি বৈজ্ঞানিক সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই। স্বয়ং কেলভিন্‌ও শেষে ইহাতে কতকটা অবিশ্বাসী হইয়াছিলেন।

জড়ের যে উৎপত্তি নাই তাহা সুনিশ্চিত, কিন্তু ইহা যে একেবারে অক্ষয়, সে সম্বন্ধে সম্প্রতি একটু সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। রন্‌জনের রশ্মি (Rantgen's rays) ক্যাথোড়্-রশ্মি প্রভৃতির আবিষ্কার এবং রেডিয়ম্ প্রভৃতি ধাতুর অদ্ভুত কার্য্য এই সন্দেহকে ক্রমেই বদ্ধমূল করিতেছে।

প্রায় বায়ুশূন্য নলের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ-প্রবাহ চালাইলে এক-

প্রকার অতি সূক্ষ্ম জড়কণা ঋণাত্মক-বিদ্যুতে পূর্ণ হইয়া নলের ঋণাত্মক প্রান্ত হইতে অপর দিকে ছুটিতে আরম্ভ করে। পদ্মরাগমণি (Ruby) বা এলুমিনিয়ম্ ঘটিত কোন পদার্থ দ্বারা উহাদের গতি রোধ করিলে এগুলি একপ্রকার অনুজ্জ্বল আলোকে আলোকিত হইয়া পড়ে। এগুলি যে অণু বা পরমাণু নয়, তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। আলোকের বেগে ধাবিত হইবার শক্তি কোন অণু বা পরমাণুতে অদ্যাপি দেখা যায় নাই, কিন্তু এগুলি সত্যই আলোকের সমান বেগে ছুটিয়া চলে। অধ্যাপক টম্‌সনের (Sir J. J. Thomson) পরিচয় প্রদান নিষ্প্রয়োজন। সূক্ষ্ম গণনা এবং পরীক্ষায় ইনি একপ্রকার সিদ্ধহস্ত। সম্প্রতি এই অধ্যাপকটি গণনা করিয়া দেখিয়াছেন যে, পূর্ব্বোক্ত বিদ্যুৎপূর্ণ সূক্ষ্ম কণিকাগুলি এত ক্ষুদ্র যে, উহাদের অন্ততঃ ১৭০০টি একত্র না হইলে সমবেত গুরুত্ব হাইড্রোজেনের একটি পরমাণুর সমান হয় না। টম্‌সন্ সাহেব কণিকাগুলিকে অতি-পরমাণু (Corpuscles) নামে আখ্যাত করিয়াছেন। পাত্রস্থিত বায়ুর অক্সিজেনের ও নাইট্রোজেনের পরমাণু বিভক্ত হইয়া যে ঐ সকল অতি-পরমাণুর সৃষ্টি করে, তাহা নহে। নলে যে কোন বায়বীয় পদার্থ রাখিয়া বিদ্যুৎপ্রবাহ চালাইলে ঠিক একই জাতীয় অতি-পরমাণুর উৎপত্তি হয়।

ইহা দেখিয়া আজকাল বৈজ্ঞানিকগণ বলিতেছেন, অক্সিজেন্, হাইড্রোজেন্, স্বর্ণ, লৌহ প্রভৃতির পরমাণুগুলিকেই যে আমরা মূল পদার্থ বলিয়া আসিতেছিলাম, তাহা ঠিক নয়। পরমাণুকেও ভাগ করা চলে, এবং এই বিভাগ হইতে যে অতি-পরমাণুর উৎপত্তি হয়, তাহাই অবিভাজ্য ও মূল জড়পদার্থ। ইহাদের জাতিভেদ নাই, এবং আকার ও গুরুত্বে সকলেই সমান। বিচিত্র ভাবে এবং বিচিত্র সংখ্যায় মিলিত হইলে ইহারাই আমাদের পরিচিত এক একটি পরমাণুর উৎপত্তি করে।

অক্সিজেনের এক একটি পরমাণুর গুরুত্ব হাইড্রোজেনের পরমাণুর ১৬ গুণ। যদি ১৭০০ অতি-পরমাণুর মিলনে একটি হাইড্রোজেনের পরমাণু জন্মায়, তবে উহারই ১৬ গুণ অতি-পরমাণু একত্র না হইলে, একটি অক্সিজেনের পরমাণুর উৎপত্তি হইবে না।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, অতি-পরমাণুগুলিতে যে ঋণাত্মক বিদ্যুৎ থাকে, তাহার কি হয়? ইহারও সদুত্তর পাওয়া গিয়াছে। বৈজ্ঞানিকগণ অনুমান করিতেছেন, সম্ভবতঃ ঋণাত্মক অতি-পরমাণু (Negative Corpuscles) ন্যায় ধনাত্মক জড়কণাও আছে। ইহারই চারিদিকে যখন ঋণাত্মক অতি-পরমাণু যথেষ্ট পরিমাণে আসিয়া মিলিত হয়, তখন দ্বিবিধ তড়িতের মিলনে পরমাণুতে বিদ্যুতের চিহ্ন থাকে না, কিন্তু ঋণাত্মক অতি-পরমাণুর সংখ্যা যদি যথেষ্ট না হয় বা অধিক হয়, তখন পরমাণুতে ধনাত্মক বা ঋণাত্মক বিদ্যুতের প্রকাশ হইয়া পড়ে।

ঋণাত্মক অতি-পরমাণুগুলিকে যেমন সাক্ষাৎ দেখা গিয়াছে, পদার্থের ধনাত্মক কণিকাগুলিকে আজও সে প্রকার দেখা যায় নাই। কিন্তু ইহার অস্তিত্বের প্রমাণ এখন এত অধিক পাওয়া যাইতেছে যে, তাহাতে অবিশ্বাস করিবার কারণ নাই। জড় পদার্থমাত্রই যে, ধনাত্মক ও ঋণাত্মক বিদ্যুদ্‌যুক্ত অতি-পরমাণুর মিলনে উৎপন্ন, তাহা এখন অনেকেই স্বীকার করিতেছেন।

জড় পদার্থের সংগঠন সম্বন্ধে এই বৈদ্যুতিক সিদ্ধান্তটি আধুনিক বিজ্ঞানে এক নূতন আলোক প্রদান করিয়াছে। ইহারই সাহায্যে অপর যে দুই চারিটি তথ্য সংগ্রহ করা গিয়াছে সেগুলি আরও অদ্ভুত।

১৮৯৬ সালে ফরাসী বৈজ্ঞানিক বেকেরেল সাহেব (M. Bacquerel ইউরেনিয়াম্ নামক ধাতু পরীক্ষা করিতে গিয়া তাহা হইতে সর্ব্বদাই এক প্রকার তেজ নির্গত হইতে দেখিয়াছিলেন। ফ্রান্সের ম্যাডাম্ ক্যুরি পিচ-ব্লেণ্ডি নামক শিলা পরীক্ষা করিতে গিয়াও উহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন এবং

এই শিলানির্গত তেজের প্রাখর্য্য পরীক্ষা করিয়া তাহা কেবল ইউরেনিয়ামের নয় বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। অনুসন্ধানে পিচব্লেণ্ডি-শিলাতে ইউরেনিয়াম্ ছাড়া রেডিয়ম্, পলোনিয়াম্ এবং আকৃটিনিয়াম্ নামক আরো তিনটি তেজ-নির্গমনক্ষম ধাতুর অস্তিত্ব প্রকাশ পাইয়াছিল। এগুলির মধ্যে রেডিয়মের তেজ যে, পরিমাণে ও প্রাখর্য্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, তাহা সকলেই দেখিয়াছিলেন। পরীক্ষায় আবার ইহাতে সুস্পষ্ট তিন প্রকার তেজের মিশ্রণ আবিষ্কার হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে প্রথম তেজ যে, সেই ঋণাত্মক-বিদ্যুতে পূর্ণ অতি-পরমাণু তাহা স্বয়ং ম্যাডাম্ কুরি প্রত্যক্ষ দেখিয়াছিলেন, এবং অপর আর একটিকে ধনাত্মক-বিদ্যুতের অতি-পরমাণু বলিয়া অনুমান করা হইয়াছিল। তার পর তৃতীয় তেজটিকে লইয়া পরীক্ষা করায় তাহাতে অতি দ্রুত ঈথর-কম্পনের সমস্ত লক্ষণ একে একে প্রকাশ পাইয়াছিল। যে আলোকরশ্মি আজকাল X'rays বলিয়া পরিচিত, বৈজ্ঞানিকদিগের মতে রেডিয়মের তৃতীয় তেজ সেই শ্রেণীভুক্ত। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, অবিরাম এই তিন জাতীয় তেজ বিকিরণ করার পর, কোন পরীক্ষকই রেডিয়মের একটুও ক্ষয় দেখিতে পান নাই।

এই আবিষ্কারের পর কয়েকজন বৈজ্ঞানিক মনে করিয়াছিলেন, তেজনির্গমন-ক্ষমতা কেবল রেডিয়মের নিজস্ব নয়। এই শক্তিটি জড়ের সাধারণ ধর্ম্ম। লি বন (Lee Bon) সাহেব এই বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়ের অগ্রণী ছিলেন। ইনি নানা প্রকার ধাতু লইয়া দীর্ঘকাল পরীক্ষা করিয়া অনুমানটির সত্যতা সুস্পষ্ট দেখাইয়াছেন। অনেক ধাতু এবং অধাতু যে রেডিয়মের ন্যায়ই তেজ বিকিরণক্ষম, তাহা এখন সকলেই স্বীকার করিতেছেন।

রেডিয়ম্ হইতে নির্গত অতি-পরমাণুর কণা লইয়া আজকাল নানা প্রকার পরীক্ষা চলিতেছে। অল্পদিনের গবেষণায় এসম্বন্ধে যেসকল তথ্য

সংগ্রহ করা গিয়াছে, তাহা আরও বিস্ময়কর। ইংরাজ বৈজ্ঞানিক রাদারফোর্ড্ সাহেব (Rutherford) পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, তেজ বিকিরণ করার পর পদার্থের ক্ষয় ধরা না পড়িলেও তাহাতে জিনিসটার রাসায়নিক প্রকৃতি অনেকটা বদ্‌লাইয়া যায়। তাছাড়া যে অতি-পরমাণু-গুলি নির্গত হয়, তাহারও রাসায়নিক কার্য্য মূলপদার্থের অনুরূপ দেখা যায় না। রেডিয়মের আণবিক গুরুত্ব ২২৫। অর্থাৎ একটি হাইড্রোজেনের পরমাণু অপেক্ষা ইহার এক একটি পরমাণুর গুরুত্ব ২২৫ গুণ অধিক। কিন্তু দীর্ঘকাল অতি-পরমাণু ত্যাগ করার পর রেডিয়ম্‌কে সীসকের (Lead) ন্যায় লঘুতর পদার্থে রূপান্তরিত হইতে দেখা গিয়াছিল। সীসকের আণবিক গুরুত্ব ২০৬ এবং রাসায়নিক প্রকৃতিও রেডিয়ম্ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এই প্রকারে একটি মূলপদার্থকে আপনা হইতেই আর একটি লঘুতর ধাতুতে পরিবর্ত্তিত হইতে দেখিয়া আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ বিস্মিত হইয়াছেন। প্রাচীন রসায়নবিদ্‌গণ লৌহকে সুবর্ণে পরিবর্ত্তিত করিবার জন্য যে "পরশ পাথরের" অনুসন্ধান করিয়া সমস্ত জীবন ব্যয় করিয়া গিয়াছেন, আজ আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ সেই স্পর্শমণির সন্ধান পাইয়াছেন। রেডিয়মের ক্রমিক বিয়োগে যখন সীসকের উৎপত্তি হইতেছে, তখন তাহারই বিপরীত ক্রিয়ায় যে সীসক রেডিয়ম্ হইতেছে না, এ কথা কখনই বলা যায় না।

যাহা হউক, পূর্ব্ববর্ণিত আবিষ্কারগুলির সাহায্যে এখন বেশ বুঝা যাইতেছে যে, পরমাণু পদার্থের সূক্ষ্মতম অংশ নয়। অতি-পরমাণুই সূক্ষ্মতম মূলপদার্থ। ইহাদেরই জটিলমিলনে এক একটি পরমাণুর উৎপত্তি হয়। তাছাড়া জড়ের ক্ষয় নাই, এ কথাটা যে সম্পূর্ণ নির্ভুল নয়, তাহা উহা হইতে বুঝা যাইতেছে। প্রত্যেক পদার্থের প্রত্যেক পরমাণুটি অতি-পরমাণু ত্যাগ করিয়া যখন নিয়তই ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে, তখন জড়কে

কেমন করিয়া অক্ষয় বলা যায় ? ক্ষয়জাত পদার্থ যদি নূতন জড়ের উৎপত্তি করিত, তাহা হইলে জড়কে অক্ষয় বলা চলিত। কিন্তু পরীক্ষায় নূতন জড়ের চিহ্ন পর্য্যন্ত দেখা যায় না। ক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে কেবল এক প্রকার নূতন শক্তি উৎপন্ন হইয়া পড়ে। ইহা দেখিয়া অনেকেই বলিতেছেন যে, জড় সত্যই ক্ষয়শীল। ইহার বিয়োগে কেবল শক্তির উৎপত্তি হয় মাত্র। ইঁহারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে শক্তি ছাড়া আর কোন সত্যকে খুঁজিয়া পাইতেছেন না। শক্তিই অব্যয় ও অক্ষয় এবং ইহাই পৃথক্ পৃথক্ মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া জড় ও জীবের লীলা দেখায়।

আলোকের চাপ

বায়ু মৃদুবেগে বহিলে গাছের পাতার আন্দোলন দেখিয়া আমরা বায়ুর চাপ বুঝিয়া লইতে পারি। তারপর সেই বায়ুই প্রবল হইয়া যখন গাছপালা, বাড়ী-ঘর ভূমিসাৎ করে, তখন চাপের কার্য্য আমরা সুস্পষ্ট দেখিতে পাই। উচ্চস্থান হইতে পড়িলে গুরু বস্তু যে চাপ দেয়, তাহা প্রতিদিনই আমরা দেখিতে পাইতেছি। কিন্তু আলোকের চাপের কথাটা সম্পূর্ণ নূতন।

মনে করা যাউক, অতি উজ্জ্বল দীপশিখার নিকটে কোন দ্রব্য রাখা গিয়াছে, এবং তাহার একার্দ্ধে তীব্রালোক পড়িতেছে। এ প্রকার অবস্থায় জিনিসটা সত্যই কি আলোকের চাপে ধাক্কা পাইয়া দীপশিখা হইতে দূরে যাইতে চেষ্টা করে? কোন লঘু বস্তুর উপর ফুৎকার দিলে উহাতে যে চাপ পড়ে, তাহা জিনিসটাকে উড়াইয়া দূরে লইয়া যায়। উজ্জ্বল আলোকের সম্মুখে লঘু বস্তু থাকিলে তাহা সত্যই কি দূরে চলিয়া যায়?

আধুনিক জ্যোতিষিগণ ধূমকেতু প্রভৃতি জ্যোতিষ্কের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণার উপর সূর্য্যালোকের কার্য্য দেখাইয়া পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। ইঁহারা সকলেই বলিতেছেন, ভীমকায় ধূমকেতু যখন তাহার কোটি কোটি যোজনব্যাপী বিশাল পুচ্ছটিকে বিস্তৃত করিয়া আকাশে উদিত হয়, তখন সূর্য্যালোকের চাপই তাহার দেহের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম লঘু কণার উপর ধাক্কা দিয়া পুচ্ছের রচনা করে। বৈশাখের পশ্চিমে ঝড়ে ধূলি উড়িতে আরম্ভ করিলে, বায়ুর চাপে তাহা পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকেই চলিতে থাকে। সূর্য্য হইতে অজস্র আলোকরশ্মি আসিয়া ধূমকেতুর উপরে যে চাপ দেয়, তাহাতে উহার দেহের লঘু কণাগুলি ঠিক ঐ প্রকারেই সূর্য্য হইতে দূরে গিয়া পড়ে।

এই কারণে ধূমকেতুর পুচ্ছকে সর্ব্বদাই সূর্য্যের বিপরীত দিকে দেখা গিয়া থাকে। ইহা ছাড়া পূর্ণ গ্রহণকালে চন্দ্রাচ্ছাদিত সূর্য্যবিম্বের চারিদিকে যে ছটামুকুট (Corona) প্রকাশ পায় এবং সূর্য্যের উদয়াস্তের অনেক পূর্ব্বে ও পরে যে মৃদু আলোক সবিতার সপ্তাশ্বের খুরোত্থিত রজতধূলির ন্যায় রবিমার্গে (Ecliptic) বিস্তৃত হইয়া পড়ে, তাহাদের সকলেরই মূলে আলোকের চাপ বর্ত্তমান। নিয়তই জগতে এ প্রকার অনেক ঘটনা সংঘটিত হইতেছে, যাহার অস্তিত্ব চক্ষুকর্ণাদি স্থূল ইন্দ্রিয়দ্বারা আমরা মোটেই বুঝিতে পারি না। সূচ্যগ্রপ্রমাণ স্থানে যে শত শত জীবাণু জীবনসংগ্রামে যোগ দিয়া উন্নত প্রাণিগণেরই ন্যায় বিচরণ করিতেছে, আমাদের স্থূল ইন্দ্রিয় তাহার পরিচয় গ্রহণ করিতে পারে না। অণুবীক্ষণ যন্ত্রই জীবজগতের এই বিশাল খণ্ডরাজ্যের লীলা দেখায়। কোটি যোজন দূরের মহাজ্যোতিষ্কগুলি হইতে যে ক্ষীণালোক শত শত বৎসর ছুটিয়া পৃথিবীতে আসিয়া পড়ে, আমাদের চক্ষু তাহাতে সাড়া দেয় না। কিন্তু দূরবীক্ষণ যন্ত্র ও ফোটোগ্রাফের চিত্র তাহাদেরই পরিচয় প্রদান করে। আলোকের চাপ এই প্রকারই অতীন্দ্রিয় ব্যাপার। ঝড়ের মাঝে দাঁড়াইলে বায়ুর প্রবল চাপ ইন্দ্রিয়গুলি দ্বারা আমরা বুঝিয়া লই। কিন্তু সূর্য্যালোকে পিঠ দিয়া দাঁড়াইলে, আলোক যে মৃদু চাপ দেয়, তাহা আমরা অনুভব করিতে পারি না। পরীক্ষাগারের সূক্ষ্ম যন্ত্রদ্বারা তাহার অস্তিত্ব বুঝিয়া লইতে হয় এবং গণিতের সূক্ষ্ম তুলাদণ্ডে তাহার পরিমাণ নিরূপণ করিতে হয়। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ এই প্রকারেই আলোকের চাপের অস্তিত্ব বুঝিয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তাহার কার্য্য দেখাইতেছেন। আমাদের পৃথিবীর উপর সূর্য্যালোক পড়িয়া নিয়তই একুশ লক্ষ মণ জোরে ধাক্কা দিতেছে।

আলোকের চাপের সাহায্যে যে সকল জ্যোতিষিক প্রহেলিকার মীমাংসা হইয়াছে, তাহা আলোচনা করিবার পূর্ব্বে চাপ কি প্রকারে কার্য্য

করে, তাহা জানা আবশ্যক। যখন বাহির হইতে কোন শক্তি আসিয়া কোন বস্তুর উপর পড়ে, তখন জিনিসটির পৃষ্ঠফল অনুসারে শক্তির কার্য্য দেখা যায়। এক সের লৌহপিণ্ডের উপর প্রবল বায়ু আঘাত দিয়া যে পরিমাণ চাপ দেয়, তাহাকে পিটাইয়া বৃহৎ পাতের আকারে পরিণত করিলে সেই চাপেরই সমবেত পরিমাণ অনেক অধিক হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ভূমধ্যাকর্ষণ (Gravitation) প্রভৃতির শক্তি যেমন সামগ্রীর (Mass) পরিমাণ অনুসারে অল্লাধিক হয়, বাহিরের চাপ সে নিয়মে চলে না। জিনিস যতই লঘু হউক না কেন, তাহার পৃষ্ঠদেশ প্রশস্ত হইলেই চাপের পরিমাণ বাড়িয়া যায়। একসের লৌহপিণ্ডের পৃষ্ঠফল যত, সেই লৌহদ্বারা গঠিত একশত গুলির সমবেত পৃষ্ঠফল তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক। তার পর সেই ছোট বর্ত্তুলগুলিকে ভাঙিয়া সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণিকায় বিভক্ত করিলে পৃষ্ঠফলের পরিমাণ এত অধিক দাঁড়ায় যে, তখন পূর্ব্বের অখণ্ড গোলকটির পৃষ্ঠফলের সহিত ইহার তুলনাই হয় না। সুতরাং দেখা যাইতেছে, এক সের ওজনের লৌহপিণ্ডের উপর যে চাপ আসিয়া পড়ে, অতি ক্ষুদ্র কণিকায় বিভক্ত হইলে, সেই জিনিসই তাহার সহস্র সহস্র গুণ চাপ পাইতে আরম্ভ করে। বৈজ্ঞানিকগণ বলিতেছেন, বড় জিনিসের উপরকার আলোকের চাপ আমরা বুঝিতে পারি না। অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পদার্থের উপরে উহার যে কার্য্য হয়, তাহা পরীক্ষা করিয়া চাপের অস্তিত্ব বুঝিয়া লইতে হয়। যে সকল জিনিসের পৃষ্ঠফল তাহাদের গুরুত্বের তুলনায় অত্যন্ত অধিক, সেইগুলিতেই উহার কার্য্য সুস্পষ্ট দেখা যায়। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, সাধারণ লৌহকণিকার ব্যাসের পরিমাণ যদি এক ইঞ্চির একলক্ষ ভাগের একভাগ হইয়া দাঁড়ায়, তখন উহার পৃষ্ঠে পতিত সূর্য্যালোকের চাপ কণিকাগুলির গুরুত্বের ঠিক সমান হয়। কণাগুলি ইহা অপেক্ষাও ছোট হইয়া পড়িলে আলোকের চাপ

তখন গুরুত্বের অধিক হইয়া সেগুলিকে ধূলিকণার ন্যায় উড়াইয়া দূরে চালাইতে থাকে।

ধূমকেতুর দেহ যে আমাদের পৃথিবীর ন্যায় জমাট শিলামৃত্তিকা দ্বারা গঠিত নয়, তাহার অনেক প্রমাণ আছে। সূর্য্য বা অপর কোন জ্যোতিষ্ক ধূমকেতুর মুণ্ড দ্বারা আচ্ছাদিত হইলে তাহার জ্যোতির একটুও হ্রাস হয় না। জমাট পদার্থ দ্বারা গঠিত হইলে, চন্দ্র যেমন গ্রহণকালে সূর্য্যকে ঢাকিয়া ফেলে, সেইপ্রকার ধূমকেতুগুলিও সূর্য্য ও পৃথিবীর মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইলে সূর্য্যগ্রহণ উৎপন্ন করিত। কিন্তু এ প্রকার গ্রহণ কখনই ঘটে নাই। তাছাড়া যে পথ ধরিয়া সাময়িক ধূমকেতুগুলি (Periodic Comets) সূর্য্য প্রদক্ষিণ করে, তাহার সর্ব্বাংশ প্রায়ই বহু উল্কাপিণ্ড দ্বারা বিকীর্ণ থাকে। কাজেই, ইহাদের দেহ ছোট-বড় উল্কাপিণ্ড দ্বারা গঠিত বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিতে হয়। সূর্য্যালোক বড় পিণ্ডগুলির উপর যে চাপ দেয়, তাহাতে সেগুলি স্থানভ্রষ্ট হয় না, কিন্তু ইহাদেরই সহিত যে সকল অতি লঘুকণা থাকে, তাহারা সেই চাপ ধারণ করিতে না পারিয়া বায়ু-তাড়িত ধূলিকণার ন্যায় দূরে ধাবিত হইয়া পুচ্ছের রচনা করে। কোন কোন ধূমকেতুর পুচ্ছ দশ কোটি মাইল অপেক্ষাও দীর্ঘ হইয়াছে। অথচ সমগ্র পুচ্ছে যে সামগ্রী থাকে তাহা একত্র করিলে কখনই চারি পাঁচ সেরের অধিক হয় না। ধূমকেতুর খণ্ডদেহের ক্ষুদ্র কণিকাগুলি যে কত সূক্ষ্ম, ইহা হইতে আমরা তাহা অনায়াসে অনুমান করিতে পারি।

কখন কখন ধূমকেতুর একাধিক পুচ্ছ দেখা যায়। এ পর্য্যন্ত এই ব্যাপারটির ভাল বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা কোন জ্যোতিষীর নিকটে শুনা যায় নাই। আলোকের চাপের সাহায্যে ইহার উৎপত্তি-তত্ত্ব এখন বুঝা যাইতেছে। যে সকল উজ্জ্বল বস্তু আমাদের করায়ত্ত নয়, প্রত্যক্ষভাবে তাহাদের পরীক্ষা করা চলে না। এই অবস্থায় রশ্মি-নির্ব্বাচন-যন্ত্র

(Spectroscope) আমাদের প্রধান সহায়। এই অদ্ভুত ক্ষুদ্র যন্ত্রটির সাহায্যে কোটি কোটি যোজন দূরবর্ত্তী জ্যোতিষ্কগুলির গঠনোপাদান কেবল বর্ণচ্ছত্র।(Spectrum) পরীক্ষা করিয়া স্থির করা যায়। ধূমকেতুর পুচ্ছ হইতে যে আলোক নির্গত হয়, তাহা ঐ যন্ত্রে ফেলিয়া বিশ্লেষ করিলে পুচ্ছে অঙ্গার ও হাইড্রোজেনের সন্ধান পাওয়া যায়। ইহা দেখিয়া অনেক জ্যোতিষী মনে করিতেছেন, সূর্য্যের তাপে ঐ অঙ্গার ও হাইড্রোজেন ঘটিত বস্তু বিশ্লিষ্ট হইয়া যে সকল অঙ্গারকণিকার উৎপাদন করে, তাহাই পুচ্ছের প্রধান উপাদান। কিন্তু এগুলির সকলেই সমান আকার গ্রহণ করিয়া উৎপন্ন হয় না, কাজেই, একই সূর্য্যালোক ছোট-বড় হিসাবে নানাপ্রকারে চাপ দিয়া একাধিক পুচ্ছের রচনা করে। হেলির (Halley's Comet) ধূমকেতুটিতে গত উদয়কালে অনেকগুলি ছোট ছোট পুচ্ছ দেখা গিয়াছিল। ১৭৪৪ সালে যে ধূমকেতুর উদয় হয়, তাহার পাঁচটি পুচ্ছ ছিল। সুবিখ্যাত ডনাটির (Donati's Comet) ধূমকেতুটিও পঞ্চ-পুচ্ছের সহিত আবিষ্কারকালে ধরা দিয়াছিল।

সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হইতে আরম্ভ করিলে ধূমকেতুর পুচ্ছ যে কত শীঘ্র বাড়িয়া যায়, হেলির ধূমকেতুর ক্রমিক পরিবর্ত্তন যাহারা লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে এসম্বন্ধে কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। ১৬৮০ সালের বৃহৎ ধূমকেতুটির পুচ্ছ দুই দিবসের মধ্যে ছয় কোটি মাইল দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছিল। আধুনিক জড়বিজ্ঞানের জনক নিউটন সাহেব তখন জীবিত ছিলেন। পুচ্ছের আকস্মিক বৃদ্ধির তিনিও কোন কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই। আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের অন্যতম নেতা মহাপণ্ডিত অধ্যাপক আরেনিয়স (Arrhenius) আলোকের চাপ দ্বারা এই প্রকার বৃদ্ধি সম্ভব বলিয়া সম্প্রতি প্রচার করিয়াছেন। ইনি হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন, পুচ্ছস্থ কণিকাগুলি যথেষ্ট ছোট হইয়া পড়িলে সেগুলি

আলোকের চাপে দুই ঘণ্টা কালে ছয় কোটি মাইল অনায়াসে অতিক্রম করিতে পারে।

তাপালোকের বিপুল ভাণ্ডার বক্ষে ধরিয়া যে মহাজ্যোতিষ্কটি আমাদের এই জগতের কেন্দ্রে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, তাহাতে আলোকের চাপের কি কার্য্য হয়, এখন আলোচনা করা যাউক। দূর হইতে আমরা সূর্য্যের যে জ্যোতিষ্মান মূর্ত্তি দেখিতে পাই, তাহার প্রকৃত মূর্ত্তি সে প্রকার নয়। নানা বায়বীয় পদার্থের গভীর আবরণে আবৃত থাকিয়া সূর্য্যদেব আমাদিগকে দেখা দেন। এই সকল যবনিকার অন্তরালে তিনি কোন্ রূপ গ্রহণ করিয়া বিরাজ করিতেছেন, তাহা দেখা কঠিন। যাহা হউক, প্রকৃত সূর্য্য ঘন-বাষ্প বা কঠিন যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন, যে সকল উপাদানে সৌরদেহ গঠিত, তাহা যে খুবই উত্তপ্ত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আমরা কৃত্রিম উপায়ে যতপ্রকার তাপ উৎপন্ন করি, তন্মধ্যে বৈদ্যুতিক তাপের উষ্ণতাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। সূর্য্যের উষ্ণতা শত শত বৈদ্যুতিক চুল্লীর উষ্ণতাকেও অতিক্রম করে।

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের গভীরতা পঞ্চাশ মাইলের অধিক নয়, কিন্তু সূর্য্যের যে বাষ্পাবরণটি সকলের বাহিরে রহিয়াছে, কেবল তাহারই গভীরতা প্রায় পাঁচহাজার মাইল। এই বিশাল বাষ্পরাশি জলন্ত হাইড্রোজেনের লোহিতাভ আলোকে রঞ্জিত হইয়া সৌরাকাশের সর্ব্বাংশে ঝটিকাবেগে আলোড়িত হইতেছে। সূর্য্যালোকের ভীষণ ঝটিকার সহিত আমাদের পরিচিত ঝটিকা বা ঘূর্ণ্যাবর্ত্তগুলির তুলনাই হয় না। এই আলোড়নের ঘাত-প্রতিঘাতে সৌরাকাশের রঙিন বাষ্পরাশিকে সহস্র সহস্র মাইল দীর্ঘ শিখাকারে অনেক উপরে উঠিতে দেখা গিয়া থাকে। পূর্ণ সূর্য্যগ্রহণকালে যখন উজ্জ্বল সূর্য্যমণ্ডল চন্দ্রবিম্বে আচ্ছাদিত হইয়া পড়ে, কেবল তখনি সৌরাকাশের এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখিবার সুবিধা হয়।

এজন্য পূর্ণ সূর্য্যগ্রহণ এপর্য্যন্ত সৌরবাষ্পমণ্ডল পরীক্ষা করিবার একমাত্র সুযোগ ছিল। দেশ-বিদেশের জ্যোতিষিগণ তুষারমণ্ডিত মেরুদেশ এবং সুদূর কামেস্‌কাট্‌কা প্রভৃতি অতি দুর্গম স্থানেও পূর্ণ সূর্য্যগ্রহণ দেখিবার জন্য যন্ত্রাদিসহ বহুবায়ে যাত্রা করিয়াছেন। কিন্তু এখন এক নূতন যন্ত্র দ্বারা সকল সময়েই সূর্য্যের বাষ্পাবরণ পরীক্ষার সুযোগ হইয়াছে।

যাহা হউক সূর্য্যের আকাশের উপরে পূর্ব্বোক্ত সহস্র সহস্র মাইল দীর্ঘ শিখাগুলি (Streamers) যে কি প্রকারে উৎপন্ন হয়, আধুনিক জ্যোতির্ষিগণ কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও তাহা ঠিক বলিতে পারিতেন না। সামগ্রীর (Mass) পরিমাণ যত অধিক হয়, জিনিসের আকর্ষণী শক্তিও তত বাড়িয়া থাকে। এই ধ্রুব নিয়মের অনুগত হইয়া সৃষ্টির ছোট-বড় সকল কার্য্যই চলিতেছে। সূর্য্যের সামগ্রীর পরিমাণ পৃথিবীর তুলনায় অত্যন্ত অধিক। হিসাব করিলে দেখা যায়, ভূতলে যে বস্তুর ভার দেড় মণ, সূর্য্যলোকে তাহার ওজন ৫৬ মণ হইয়া দাঁড়ায়। এই প্রবল আকর্ষণের হাত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিয়া সৌরাকাশের লঘু বাষ্পগুলিকে বেশ স্বাধীনভাবে আকাশের উপরে ভাসিতে দেখিয়া জ্যোতির্ষিগণ অবাক্ হইয়া পড়িতেন। ব্যাপারটা জ্যোতিঃশাস্ত্রের এক প্রকাণ্ড প্রহেলিকা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এখন বৈজ্ঞানিকগণ ইহাকে আলোকের চাপেরই কার্য্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ইঁহারা বলিতেছেন, যে বাষ্পরাশি সূর্য্য হইতে মহাকাশের দিকে উৎক্ষিপ্ত হয়, তাহা চিরকালই বাষ্পাকারে থাকিতে পারে না। একটু দূরে গিয়া শীতল হইয়া পড়িলেই তাহা জমাট বাঁধিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণিকায় পরিণত হয়। আকারে একটু বড় হইলে আলোকের চাপ কণাগুলিকে আর শূন্যে রাখিতে পারে না, নিজেদের ভারে তাহারা আপনা হইতেই সূর্য্য-পৃষ্ঠে পড়িতে আরম্ভ করে। আমরা বহুদূরে থাকিয়া এই কণাগুলিকেই সূর্য্যের বাষ্পাবরণের বক্র শিখাকারে দেখিতে পাই।

হাদের আকার অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র হইয়া দাঁড়াইলে যখন আলোকের চাপ ক গুরুত্বের সমান হইয়া পড়ে, তখন সেগুলি উপরে বা নীচে কোন নেই যাইতে পারে না। এ অবস্থায় আমরা কণিকাগুলিকে লঘু ঘাকারে বাষ্পাবরণের উপরে ভাসিতে দেখি। পূর্ণ সূর্য্যগ্রহণকালে সূর্য্যের াকাশে এই প্রকার উজ্জ্বল মেঘ বার বার দেখা গিয়াছে। কণিকাগুলির াকার যখন আরো ক্ষুদ্র হইয়া দাঁড়ায়, তখন সূর্য্যালোকের চাপ উহাদের রুত্বকে অতিক্রম করে। এই অবস্থায় সেগুলি ধূমকেতুর পুচ্ছস্থ কণিকা-লিরই ন্যায় আলোকের ধাক্কায় দ্রুতবেগে সৌরাকাশ ছাড়িয়া দূরে লিতে আরম্ভ করে। সূর্য্য হইতে অনেক দূরে যে মৃদু আলোকের টামুকুট (Corona) সূর্য্যগ্রহণকালে দেখা দেয়, তাহা আলোকতাড়িত তি ক্ষুদ্র কণিকাগুলি দ্বারা উৎপন্ন হয় বলিয়া সিদ্ধান্ত হইয়াছে।

এ পর্য্যন্ত রসায়নবিদ্‌গণ পরমাণুকেই (Atoms) সৃষ্টপদার্থের সূক্ষ্মতম ংশ বলিয়া অনুমান করিতেছিলেন। আধুনিক বিজ্ঞান উহা অপেক্ষাও ক্ষুদ্র একজাতীয় অতি-পরমাণুর (Corpuscles) সন্ধান দিয়াছে। এগুলি ণাত্মক (Negative) বিদ্যুতের বাহক এবং আকারে এত ক্ষুদ্র যে, স্ততঃ হাজারটি একত্র না হইলে আমাদের পরিচিত একটি পরমাণুর মান হয় না। বৈজ্ঞানিকগণ বলিতেছেন, সূর্য্যের বাষ্পমণ্ডলে যে াসায়নিক কার্য্য ও তাপের লীলা অবিরাম চলিতেছে, তাহাতে সৌরাকাশ র্ব্বদাই বিদ্যুদ্‌যুক্ত হইয়া আছে এবং অসংখ্য অতি-পরমাণু ঋণাত্মক বিদ্যুৎ বহন করিয়া গোলা-গুলির মত মহাকাশের ভিতর দিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। কাজেই, তাহাদেরই যেগুলি আমাদের বায়ুমণ্ডলের উপর আসিয়া পড়ে, সেগুলির সংস্পর্শে বায়ুরাশির ঊর্দ্ধতম অংশ ঋণাত্মক বিদ্যুতে পূর্ণ হইয়া পড়ে। দুইটি পদার্থ যদি একই জাতীয় বিদ্যুতে পূর্ণ থাকে, তবে কাছাকাছি রাখিলে তাহারা বিকর্ষণ সুরু করিয়া দেয়।

এজন্য পূর্ণ সূর্য্যগ্রহণ এপর্য্যন্ত সৌরবাষ্পমণ্ডল পরীক্ষা করিবার একমাত্র সুযোগ ছিল। দেশ-বিদেশের জ্যোতির্বিদগণ তুষারমণ্ডিত মেরুদেশ এবং সুদূর কামেস্কাট্‌কা প্রভৃতি অতি দুর্গম স্থানেও পূর্ণ সূর্য্যগ্রহণ দেখিবার জন্য যন্ত্রাদিসহ বহুব্যয়ে যাত্রা করিয়াছেন। কিন্তু এখন এক নূতন যন্ত্র দ্বারা সকল সময়েই সূর্য্যের বাষ্পাবরণ পরীক্ষার সুযোগ হইয়াছে।

যাহা হউক সূর্য্যের আকাশের উপরে পূর্ব্বোক্ত সহস্র সহস্র মাইল দীর্ঘ শিখাগুলি (Streamers) যে কি প্রকারে উৎপন্ন হয়, আধুনিক জ্যোতির্বিদ্‌গণ কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও তাহা ঠিক বলিতে পারিতেন না। সামগ্রীর (Mass) পরিমাণ যত অধিক হয়, জিনিসের আকর্ষণী শক্তিও তত বাড়িয়া থাকে। এই ধ্রুব নিয়মের অনুগত হইয়া সৃষ্টির ছোট-বড় সকল কার্য্যই চলিতেছে। সূর্য্যের সামগ্রীর পরিমাণ পৃথিবীর তুলনায় অত্যন্ত অধিক। হিসাব করিলে দেখা যায়, ভূতলে যে বস্তুর ভার দেড় মণ, সূর্য্যলোকে তাহার ওজন ৫৬ মণ হইয়া দাঁড়ায়। এই প্রবল আকর্ষণের হাত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া সৌরাকাশের লঘু বাষ্পগুলিকে বেশ স্বাধীনভাবে আকাশের উপরে ভাসিতে দেখিয়া জ্যোতির্বিদগণ অবাক্ হইয়া পড়িতেন। ব্যাপারটা জ্যোতিঃশাস্ত্রের এক প্রকাণ্ড প্রহেলিকা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এখন বৈজ্ঞানিকগণ ইহাকে আলোকের চাপেরই কার্য্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ইঁহারা বলিতেছেন, যে বাষ্পরাশি সূর্য্য হইতে মহাকাশের দিকে উৎক্ষিপ্ত হয়, তাহা চিরকালই বাষ্পাকারে থাকিতে পারে না। একটু দূরে গিয়া শীতল হইয়া পড়িলেই তাহা জমাট বাঁধিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণিকায় পরিণত হয়। আকারে একটু বড় হইলে আলোকের চাপ সেগুলিকে আর শূন্যে রাখিতে পারে না, নিজেদের ভারে তাহারা আপনা হইতেই সূর্য্য-পৃষ্ঠে পড়িতে আরম্ভ করে। আমরা বহুদূরে থাকিয়া এই কণিকাগুলিকেই সূর্য্যের বাষ্পাবরণের বক্র শিখাকারে দেখিতে পাই।

উহাদের আকার অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র হইয়া দাঁড়াইলে যখন আলোকের চাপ ঠিক গুরুত্বের সমান হইয়া পড়ে, তখন সেগুলি উপরে বা নীচে কোন স্থানেই যাইতে পারে না। এ অবস্থায় আমরা কণিকাগুলিকে লঘু মেঘাকারে বাষ্পাবরণের উপরে ভাসিতে দেখি। পূর্ণ সূর্য্যগ্রহণকালে সূর্য্যের আকাশে এই প্রকার উজ্জ্বল মেঘ বার বার দেখা গিয়াছে। কণিকাগুলির আকার যখন আরো ক্ষুদ্র হইয়া দাঁড়ায়, তখন সূর্য্যালোকের চাপ উহাদের গুরুত্বকে অতিক্রম করে। এই অবস্থায় সেগুলি ধূমকেতুর পুচ্ছস্থ কণিকা-গুলিরই ন্যায় আলোকের ধাক্কায় দ্রুতবেগে সৌরাকাশ ছাড়িয়া দূরে চলিতে আরম্ভ করে। সূর্য্য হইতে অনেক দূরে যে মৃদু আলোকের ছটামুকুট (Corona) সূর্য্যগ্রহণকালে দেখা দেয়, তাহা আলোকতাড়িত অতি ক্ষুদ্র কণিকাগুলি দ্বারা উৎপন্ন হয় বলিয়া সিদ্ধান্ত হইয়াছে।

এ পর্য্যন্ত রসায়নবিদ্‌গণ পরমাণুকেই (Atoms) সৃষ্টপদার্থের সূক্ষ্মতম অংশ বলিয়া অনুমান করিতেছিলেন। আধুনিক বিজ্ঞান উহা অপেক্ষাও বহুক্ষুদ্র একজাতীয় অতি-পরমাণুর (Corpuscles) সন্ধান দিয়াছে। এগুলি ঋণাত্মক (Negative) বিদ্যুতের বাহক এবং আকারে এত ক্ষুদ্র যে, অন্ততঃ হাজারটি একত্র না হইলে আমাদের পরিচিত একটি পরমাণুর সমান হয় না। বৈজ্ঞানিকগণ বলিতেছেন, সূর্য্যের বাষ্পমণ্ডলে যে রাসায়নিক কার্য্য ও তাপের লীলা অবিরাম চলিতেছে, তাহাতে সৌরাকাশ সর্ব্বদাই বিদ্যুদ্‌যুক্ত হইয়া আছে এবং অসংখ্য অতি-পরমাণু ঋণাত্মক বিদ্যুৎ বহন করিয়া গোলা-গুলির মত মহাকাশের ভিতর দিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। কাজেই, তাহাদেরই যেগুলি আমাদের বায়ুমণ্ডলের উপর আসিয়া পড়ে, সেগুলির সংস্পর্শে বায়ুরাশির ঊর্দ্ধতম অংশ ঋণাত্মক বিদ্যুতে পূর্ণ হইয়া পড়ে। দুইটি পদার্থ যদি একই জাতীয় বিদ্যুতে পূর্ণ থাকে, তবে কাছাকাছি রাখিলে তাহারা বিকর্ষণ সুরু করিয়া দেয়।

সুতরাং সূর্য্য হইতে যখন ঋণাত্মক বিদ্যুতে পূর্ণ নূতন অতি-পরমাণু দলে দলে পৃথিবীর দিকে ছুটিয়া আসে, তখন তাহারা আমাদের ঋণাত্মক বিদ্যুৎ-পূর্ণ বায়ুমণ্ডলের নিকটবর্ত্তী হইয়া পিছাইয়া যাইতে চায়। এই অবস্থায় সেগুলি যদি পরস্পর মিলিয়া বা অপর পদার্থের সহিত সংযুক্ত হইয়া আকারে বেশ বড় হইয়া দাঁড়ায়, তবে সূর্য্যের দিকেই তাহারা পড়িতে আরম্ভ করে, আলোকের চাপ গতিরোধ করিতে পারে না। জ্যোতিষিগণ বলিতেছেন, পৃথিবী ও সূর্য্যের অতি-পরমাণুর এই প্রকার আনাগোনা সত্যই অবিরাম চলিতেছে। যদি কেহ চন্দ্রলোক হইতে আমাদের পৃথিবীটিকে দেখেন, তবে সূর্য্য ও ধরাকে ঐ অতি-পরমাণুর প্রবাহ দ্বারা সুস্পষ্ট সংযুক্ত দেখিতে পাইবেন।

সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে এবং অস্তের পরে রাশিচক্রস্থ নক্ষত্রগুলিকে ভেদ করিয়া যে এক মৃদু আলোক (Zodiacal Light) আকাশে দেখা দেয়, জ্যোতিষিগণ এত চেষ্টাতেও উহার উৎপত্তি-তত্ত্ব নিঃসন্দেহে স্থির করিতে পারেন নাই। এখন পৃথিবী ও সূর্য্যের মধ্যবর্ত্তী সেই সূক্ষ্ম কণিকার সেতুকেই পূর্ব্বোক্ত আলোকের কারণ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

অতি-পরমাণু ও বিদ্যুৎ সম্বন্ধে যে সকল কথা বলা হইল, আজকাল নানা প্রক্রিয়ার পরীক্ষাগারে তাহার সত্যতা চাক্ষুষ দেখানো হইতেছে। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক সার উইলিয়ম্ ক্রুকস্ (Crookes) এক প্রকার প্রায় বায়ুশূন্য নলিকার (Crooke's Tube) ভিতরে বিদ্যুৎ চালনা করিয়া পূর্ব্বোক্ত কার্য্যগুলি সুস্পষ্ট দেখাইয়াছেন। নলের দুই প্রান্তে দুইটি তার সংযুক্ত থাকে। ইহাদের সহিত বিদ্যুৎ-উৎপাদক যন্ত্রের দুই প্রান্ত সংযুক্ত রাখিলেই নলের ভিতর আলোক দেখা দেয়। ইহা সাধারণ আলোক নয়। সূর্য্য হইতে যে সকল অতি-পরমাণু ছুটিয়া পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের উপরে আসিয়া পড়ে, ক্রুক্সের নলের আলোকটা সেই

জাতীয় বিদ্যুতে পূর্ণ অতি-পরমাণুরই আলোক। নলের বাহিরে চুম্বক ধরিলে চৌম্বকাকর্ষণে ঐ অতি-পরমাণুর প্রবাহকে সুস্পষ্ট বাঁকিয়া চলিতে দেখা যায়। এই পরীক্ষার জন্য বিশেষ আয়োজনের আবশ্যক হয় না। আজকাল ছোটখাটো পরীক্ষাগারেও অতি-পরমাণু ও চুম্বকের এই অত্যাশ্চর্য্য কার্য্য দেখানো হইতেছে। বৈজ্ঞানিকগণ চৌম্বকাকর্ষণজনিত বিচলনের পরিমাণাদি গণনা করিয়া অতি-পরমাণুর গুরুত্ব, বেগ প্রভৃতি নির্ণয় করিয়াছেন।

যাহা হউক ক্রুক্‌সের নলের ভিতর অতি-পরমাণুর কার্য্য লক্ষ্য করিয়া আচার্য্য আরেনিয়স (Arrhenius) মেরুপ্রভার (Aurora) উৎপত্তির এক ব্যাখ্যান দিয়াছেন। আমাদের পৃথিবী যে নানা প্রকারে একটি বৃহৎ চুম্বকের ন্যায় কার্য্য করে, তাহার অনেক প্রমাণ আছে। সাধারণ চুম্বক-শলাকার যেমন দুইটি মেরু (Poles) থাকে, পৃথিবীর ভৌগোলিক উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর সন্নিহিত স্থানে সেই প্রকার চৌম্বক-মেরুর ন্যায় দুইটি স্থান নির্দ্দেশ করা যায়। চৌম্বক-শক্তির সূচক রেখাগুলি (Lines of forces) ঐ দুই মেরুকে সংযুক্ত করিয়া পৃথিবীর উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। অধ্যাপক আরেনিয়স বলিতেছেন, সূর্য্য হইতে বিচ্ছুরিত সেই বিদ্যুদ্‌যুক্ত অতি-পরমাণুগুলি যখন আমাদের দিকে ছুটিয়া আসে, তখন পৃথিবী চুম্বকের ন্যায়ই সেই প্রবাহটিকে বাঁকাইয়া দেয়। বিষুবরেখার (Equator) সন্নিহিত প্রদেশ অপেক্ষাকৃত সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী, এবং চৌম্বক রেখাগুলি সেখানে ধরাতলের সহিত প্রায় সমান্তরালভাবে অবস্থিত। সেজন্য এই সকল স্থানের উপর যে অতি-পরমাণুগুলি আসিয়া পড়ে, তাহারা ক্রুক্‌সের নলের কণিকাগুলির ন্যায় বাঁকিয়া মেরু অভিমুখে ছুটিয়া চলে। তারপর এগুলিই যখন মেরুপ্রদেশে পৌঁছিয়া এবং বক্রপথে নীচে নামিয়া, বায়ুমণ্ডলের সংস্পর্শে আসে, তখন তাহাদেরই আলোক আমাদের

নয়নগোচর হইয়া পড়ে। ইহাই মেরু-প্রভা। বিষুব প্রদেশ হইতে তাড়িত হইবার সময় অতি-পরমাণুগুলি আমাদের বায়ুমণ্ডলকে স্পর্শ করিতে পারে না। কাজেই, গ্রীষ্মপ্রধান দেশের অধিবাসিগণ সেই বিচিত্র আলোক হইতে বঞ্চিত থাকে।

আকাশের বিদ্যুৎ

বায়ুর ব্যাপকতা বুঝাইতে হইলে আমরা উপমার সাহায্য গ্রহণ করিয়া বলি,—মৎস্য প্রভৃতি জলচর প্রাণীসকল যেমন জলের ভিতরে ডুবিয়া থাকিয়া চলাফেরা করে, আমরা সেই প্রকার বায়ুসাগরের মধ্যেই ডুবিয়া আছি। এই উপমাটিরই সাহায্য গ্রহণ করিয়া যদি বলা যায়,—সমগ্র সসাগরা পৃথিবী তাহার নগর, বন এবং মরুপ্রান্তরাদি বক্ষে করিয়া সর্ব্বদা বিদ্যুৎ সাগরে নিমগ্ন রহিয়াছে, তবে বোধ হয় কথাটা ঠিকই বলা হয়।

বায়ুর স্পর্শ আমরা নিয়তই অনুভব করি এবং প্রত্যেক শ্বাস-প্রশ্বাসেও সে নিজের অস্তিত্ব আমাদিগকে সুস্পষ্ট জানাইয়া দেয়। বিদ্যুতের অস্তিত্ব এপ্রকার সুস্পষ্ট না হইলেও, মেঘ-নির্ঘোষ এবং বিদ্যুৎস্ফুরণে তাহার অস্তিত্ব জানিতে বাকি থাকে না।

কেবল মেঘ হইলেই বিদ্যুৎ হয় না। যখন আকাশ সম্পূর্ণ মেঘনির্মুক্ত এবং বায়ুও জলীয়বাষ্পবর্জ্জিত, সেই সময়েও আকাশে বিদ্যুতের অস্তিত্ব দেখা যায়। সাইবিরিয়া এবং আমেরিকার শুষ্ক প্রান্তরের বায়ুরাশি সময়ে সময়ে এপ্রকার বিদ্যুদ্‌যুক্ত হইয়া পড়ে যে, তখন পরিধেয় বস্ত্রাদি হইতেই বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গ আপনা হইতেই বাহির হইতে আরম্ভ হয়।

লর্ড কেল্‌ভিন্ আকাশের বিদ্যুৎ লইয়া অনেক পরীক্ষা করিয়াছিলেন। বায়ুতে যে সর্ব্বদাই বিদ্যুৎ বর্ত্তমান, তাহা ঐসকল পরীক্ষায় স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইয়াছিল। আজকাল ইলেক্ট্রোমিটার (Electrometer)

নামক যে একপ্রকার বিদ্যুৎমাপক-যন্ত্র পরীক্ষাগারমাত্রেই ব্যবহৃত হইতেছে, তাহা দ্বারাও বিদ্যুতের অস্তিত্ব বুঝা যায়। আকাশের বায়ুতে কি পরিমাণ বিদ্যুৎ আছে, তাহা এই যন্ত্রের সাহায্যে আজকাল স্থির করা হইতেছে এবং বিদ্যুতের পরিমাণ দেখিয়া ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা প্রভৃতি ব্যাপারগুলিও মোটামুটিভাবে পূর্ব্বে গণনা করিয়া রাখা হইতেছে।

আকাশের বিদ্যুৎ কি প্রকারে উৎপন্ন হয়, জানিবার জন্য বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ অনুসন্ধান করিলে তিন্ চারিটি কারণের উল্লেখ দেখা যায়। পৃথিবীর জল এবং স্থলভাগ হইতে নিয়তই জলীয় বাষ্প উৎপন্ন হইতেছে। সূর্য্যের তাপে উদ্ভিদ্ এবং প্রাণীর দেহ হইতেও প্রচুর বাষ্প বহির্গত হয়। বৈজ্ঞানিকগণ এই ব্যাপারটিকে আকাশের বিদ্যুতের উৎপাদক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। তাছাড়া বায়ুর স্তর এবং পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ সূর্য্যের তাপে যে অসমভাবে উত্তপ্ত হয়, তাহাকেও বিদ্যুৎ-উৎপত্তির কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে।

বিদ্যুৎ-উৎপত্তির এই কারণগুলির কথা অতি প্রাচীনকাল হইতে বিজ্ঞানগ্রন্থে স্থান পাইয়া আসিতেছে। কিন্তু কথাগুলির সত্যতা পরীক্ষা করিবার জন্য বহু চেষ্টা করিয়াও এ পর্য্যন্ত কেহই কৃতকার্য্য হন নাই। এই কারণে আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ বিদ্যুতের উৎপত্তিসম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত মতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নাই। আজকাল এই প্রসঙ্গে কতক-গুলি নূতন কথা শুনা যাইতেছে। আশা হইতেছে সম্ভবতঃ আকাশের বিদ্যুতের গোড়ার খবরটা এগুলির সাহায্যে শীঘ্র জানা যাইবে।

কয়েক বৎসর হইল দুইজন অষ্ট্রীয়ান্ বৈজ্ঞানিক আল্পস্ সান্নিহিত প্রদেশের বায়ুতে কি পরিমাণ বিদ্যুৎ আছে, তাহা স্থির করিবার জন্য পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছিলেন। পরীক্ষাক্ষেত্রটি একটি ঝরণার নিকটবর্ত্তী স্থানে ছিল। এই স্থানের বায়ুতে বিদ্যুতের পরিমাণ অত্যন্ত অধিক

দেখিয়া তাঁহারা অপর বৈজ্ঞানিকদিগকে ইহার কারণ অনুসন্ধানের জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক লেনার্ড সাহেব (Herr Lenard) এই সময়ে বিদ্যুতের গবেষণায় নিযুক্ত ছিলেন। পূর্ব্বোক্ত সংবাদটি কর্ণগোচর হইলে সুইজারল্যাণ্ডের পর্ব্বতময় প্রদেশে তিনি স্বয়ং পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছিলেন। নিকটেই দুই তিনটি বৃহৎ জলপ্রপাত ছিল। লেনার্ড সাহেব এখানেও বিদ্যুতের প্রাচুর্য্য দেখিতে পাইয়াছিলেন। যাঁহারা বৈজ্ঞানিক, তাঁহারা কোন নূতন প্রাকৃতিক ঘটনাকে সম্মুখে রাখিয়া কখনই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। তাহার মূলতত্ত্বটির আবিষ্কার না হওয়া পর্য্যন্ত ইঁহাদের সাধনার বিরাম থাকে না। লেনার্ড সাহেব এই নূতন বৈদ্যুতিক ব্যাপারটি লক্ষ্য করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন নাই। ইহাকে অবলম্বন করিয়া গবেষণা আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং শেষে দীর্ঘ সাধনার ফলে পরীক্ষাক্ষেত্রের জলপ্রপাতগুলিকেই তিনি বিদ্যুতের উৎপাদক বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য বৃহৎ জলপ্রপাত বা সুবিস্তীর্ণ জলাশয়ের মোটেই আবশ্যক হয় না। ক্ষুদ্র জলপ্রপাতগুলিও যথেষ্ট বিদ্যুৎ উৎপন্ন করিতে পারে।

জলপ্রপাতের নিকটবর্ত্তী স্থান যে বিদ্যুৎপূর্ণ থাকে, প্রাচীন বৈজ্ঞানিক-দিগের মধ্যে দুই একজন তাহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। ইঁহারা এই ব্যাপারটির ব্যাখ্যানে বলিলেন,—আকাশের বায়ুতে সাধারণতঃ যে বিদ্যুৎ থাকে, তাহাই ঝরণার সন্নিহিত জলকণাপূর্ণ বায়ুতে বিপরীতজাতীয় বিদ্যুতের সঞ্চয় (Induction) আরম্ভ করে। ইহারই ফলে আমরা ঐ সকল স্থানের বায়ুতে বিদ্যুতের পরিমাণ অত্যন্ত অধিক দেখিতে পাই।

লেনার্ড সাহেব বহু অনুসন্ধান করিয়াও পূর্ব্বোক্ত কথাটির সত্যতা দেখিতে পান নাই। ইনি বলিতেছেন, জল বাষ্পীভূত হইলে, বা জলবিন্দুগুলি সবেগে বায়ুর ভিতর দিয়া নীচে নামিতে আরম্ভ করিলে অতি অল্প বিদ্যুতের

উৎপত্তি হয়। প্রপাতের ক্ষুদ্র জলবিন্দুগুলি পর্ব্বতের গাত্রে বা শিলাতলে পড়িয়া ছিন্ন হইতে থাকিলে যে বিদ্যুতের উৎপত্তি হয়, তাহারই পরিমাণ অত্যন্ত অধিক। লেনার্ড সাহেবের মতে আকাশের অধিকাংশ বিদ্যুৎই জলকণার ঐ প্রকার ভাঙাগড়া হইতে উৎপন্ন।

পরীক্ষাশালায় এবং উন্মুক্ত প্রান্তরে কৃত্রিম জলপ্রপাত রচনা করিয়া নানাপ্রকার পরীক্ষা করা হইয়াছিল; প্রত্যেক পরীক্ষাতেই জলবিন্দুগুলির বিচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর বিদ্যুৎ দেখা দিয়াছিল।

ধূলিহীন পরিষ্কার বায়ুর ভিতরে পিচ্‌কারী দ্বারা বার বার জলধারা চালনা করিতে থাকিলে, বায়ু বিদ্যুদ্‌যুক্ত হইয়া পড়ে। কয়েক বৎসর হইল লর্ড কেল্‌ভিন্ এবং অধ্যাপক ম্যাক্‌লিন্ এই তত্ত্বটি আবিষ্কার করিয়াছিলেন। লেনার্ড সাহেবের পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি হইতে ইহারও একটি ব্যাখ্যান পাওয়া যায়। বায়ুর ভিতর দিয়া যাইবার সময় জলধারা যখন সহস্র সহস্র জলকণায় পরিণত হইয়া পড়ে, তখনই বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইয়া বায়ুতে আশ্রয় গ্রহণ করে।

বলা বাহুল্য যে, কেবল জলপ্রপাতের ধারাই বিদ্যুতের উৎপাদন করে না। নদী, সমুদ্র প্রভৃতি বৃহৎ জলাশয়ের তরঙ্গমালার সহিত কূলের সংঘর্ষণ এবং বৃষ্টির জলবিন্দুগুলির সহিত ভূমির সংঘাত প্রভৃতি নানা ব্যাপার বায়ুতে সর্ব্বদাই বিদ্যুৎ জোগাইতেছে। এমন কি, সহরের রাস্তায় এবং বাগিচার গাছগুলির উপরে আমরা যখন জলসেচন করি তখন এই সকল কার্য্য দ্বারাও আমাদের অলক্ষ্যে এক একটু বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইয়া বায়ুতে সঞ্চিত হইতে আরম্ভ করে।

ক্ষুদ্র জলবিন্দু ক্ষুদ্রতর হইয়া ছড়াইয়া পড়িলে কেন বিদ্যুতের উৎপত্তি হয়, এখন আলোচনা করা যাউক। আমরা প্রথমে লেনার্ড সাহেবের ব্যাখ্যানেরই আলোচনা করিব। ইনি প্রাচীন বৈজ্ঞানিকদিগের ন্যায়

দুই জাতীয় বিদ্যুতের অস্তিত্ব মানিয়া লইয়াছিলেন এবং তারপর প্রত্যেক জলবিন্দুকে ধনাত্মক (Positive) এবং ঋণাত্মক (Negative) এই দুই বিদ্যুতের দুইটি পৃথক্ আবরণে আচ্ছাদিত বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। এই প্রকার জলবিন্দু যখন কঠিন মৃত্তিকা বা প্রস্তরাদিতে আঘাত প্রাপ্ত হয়, তখন তাহার ঋণাত্মক বিদ্যুতের বহিরাবরণটা ছিন্ন হইয়া বায়ুকে বিদ্যুৎপূর্ণ করে বলিয়া সিদ্ধান্ত হইয়াছিল।

লেনার্ড সাহেবের ব্যাখ্যানটি সহজ হইলেও প্রকৃত ব্যাপারটি যে এত সহজে সম্পন্ন হয় না, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত টম্‌সন্ সাহেব (Prof. J. J. Thomson) বিষয়টির আলোচনা করিয়া ঠিক এই মন্তব্যই প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইনি বলেন, কোন জিনিসে শক্তি প্রয়োগ করিলে, সেই শক্তি অবস্থাবিশেষে পড়িয়া তাপ, বিদ্যুৎ প্রভৃতিতে পরিণত হয় সত্য, কিন্তু জলবিন্দু ভাঙিয়া যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে, তাহাকে শক্তির প্রত্যক্ষ পরিবর্ত্তনের ফল বলা যায় না। জলধারাকে কেবল বায়ুর ভিতর দিয়া না চালাইয়া নানাজাতীয় বাষ্পের মধ্যদিয়া প্রবাহিত করায় অধ্যাপক টম্‌সন্ বিদ্যুতের পরিমাণে বিশেষ পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়াছিলেন। এই জন্য বিদ্যুৎ উৎপাদনের সহিত নিশ্চয়ই রাসায়নিক ব্যাপার জড়িত আছে বলিয়া তাঁহার মনে হইয়াছিল। জলীয় বাষ্প-পূর্ণ পাত্রের ভিতর দিয়া জলধারা প্রবাহিত করিলে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় না, কিন্তু জলীয় বাষ্পের স্থানে বায়ু বা অপর কোন বাষ্প রাখিলেই বিদ্যুৎ দেখা দেয়। ক্লোরিন্ বাষ্পের ভিতর দিয়া ক্লোরিন্-মিশ্রিত জলের প্রবাহ চালাইয়া বিদ্যুৎ পাওয়া যায় নাই। কিন্তু ক্লোরিনের স্থানে হাইড্রোজেন্ বাষ্প প্রবেশ করাইবা-মাত্র বিদ্যুতের সঞ্চয় আরম্ভ হইয়াছিল। এই সকল পরীক্ষার বিবরণ পাঠ করিলে, আকাশের বিদ্যুৎ উৎপত্তির সহিত যে রাসায়নিক

ব্যাপার জড়িত আছে, তাহা অনায়াসেই অনুমান করা যাইতে পারে।

অধ্যাপক টম্‌সন্ তাঁহার পরীক্ষাগুলি দ্বারা রাসায়নিক কার্য্যের লক্ষণ দেখাইয়াই ক্ষান্ত হন নাই, কার্য্যগুলি কি প্রকারে চলে, তিনি তাহারও কিঞ্চিৎ আভাস দিয়াছিলেন।

যে সকল পদার্থের রাসায়নিক সংগঠন বিসদৃশ, তাহাদেরই মধ্যে রাসায়নিক সংযোগ-বিয়োগের কার্য্য প্রবলভাবে চলে। এটি রাসায়নিক কার্য্যের একটা গোড়ার কথা। ক্লোরিন্, আয়োডিন্ প্রভৃতি জিনিসগুলির রাসায়নিক প্রকৃতি প্রায় অভিন্ন। তাই ইহাদিগকে একত্র রাখিলে কোন রাসায়নিক কার্য্য দেখা যায় না। কিন্তু হাইড্রোজেনের ন্যায় আর একটি পৃথগ্‌ধর্ম্মী জিনিসের সহিত সেই ক্লোরিন ও আয়োডিন্‌কে মিশাইলে রাসায়নিক কার্য্য আরম্ভ হইয়া পড়ে।

অধ্যাপক টম্‌সন্ পূর্ব্বোক্ত রাসায়নিক সত্যটিকে অবলম্বন করিয়া বলিতেছেন, জল এবং বায়ুর রাসায়নিক প্রকৃতির মধ্যে কোন মিল নাই। এইজন্য জলবিন্দু হইতে বিচ্ছিন্ন সূক্ষ্ম কণিকাগুলি যখন বায়ুর ভিতর দিয়া নীচে নামিতে আরম্ভ করে, তখন আপনা হইতেই রাসায়নিক কার্য্য সুরু হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুতেরও উৎপত্তি দেখা যায়। জলীয় বাষ্প এবং জলবিন্দুর রাসায়নিক প্রকৃতি মূলে এক। এই কারণে টম্‌সন্ সাহেব জলীয় বাষ্পের ভিতর দিয়া জলধারার উৎক্ষেপ করিয়া বিদ্যুতের উৎপত্তি দেখিতে পান নাই; এবং পরে ক্লোরিন্ বাষ্পের ভিতর দিয়া ক্লোরিন্-মিশ্রিত জলধারা চালনা করাতেও বিদ্যুৎ জন্মায় নাই।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সাধারণ জলবিন্দু যখন বায়ুর ভিতর দিয়া চলিয়া আসে, তখন বিদ্যুতের উৎপত্তি হয় না; সেই জলবিন্দুই

যখন কোনপ্রকারে সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র জলকণিকায় পরিণত হইয়া বায়ুর ভিতর দিয়া নামিতে থাকে, কেবল তখনই বিদ্যুৎ জন্মায়। অধ্যাপক টম্‌সন্ এই ব্যাপার সম্বন্ধেও কতকগুলি নূতন কথা বলিয়াছেন। কোন কঠিন, তরল বা বায়বীয় পদার্থ যখন অণুর (Molecules) আকারে থাকে, তখন তাহা বিদ্যুৎকে বহন করিতে পারে না। বিদ্যুৎ বহন করিয়া অপর পদার্থে দিতে হইলে পরমাণুর (Atoms) সাহায্য প্রয়োজন। এইজন্য কোন বিদ্যুদ্‌যুক্ত বায়বীয় পদার্থের অন্ততঃ কতক অংশ ভাঙিয়া চুরিয়া পরমাণুর আকার গ্রহণ না করিলে সেই বস্তু হইতে বিদ্যুৎ নির্গত হয় না। অধ্যাপক টম্‌সন্ এই বৈজ্ঞানিক সত্যটিকে অবলম্বন করিয়া বলিতেছেন, জলবিন্দুসকল সূক্ষ্ম জলকণিকার আকার গ্রহণ করিলে, অণুর ভাঙা-গড়া ব্যাপারটি অতি সহজেই সম্পন্ন হইতে থাকে; এবং তার পর ইহার সহিত বায়ুর নাইট্রোজেন্ ও অক্সিজেনের ভাঙা-গড়া যোগ দিলে বিদ্যুতের পরিমাণ প্রচুর হইয়া দাঁড়ায়।

বিদ্যুৎস্ফুরণ, বজ্রপাত প্রভৃতি বৈদ্যুতিক ঘটনার সহিত আমাদের খুব ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকা সত্ত্বেও, তাহাদের গোড়ার খবরটি আমরা ভাল করিয়া জানিতাম না। আকাশের বিদ্যুৎ উৎপন্ন করিতে গেলে যে, রাসায়নিক কার্য্যের প্রয়োজন হয়, তাহাও আমরা পূর্ব্বে অনুমান করিতে পারি নাই। ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্রবৃহৎ প্রাকৃতিক কার্য্যগুলি সর্ব্বদাই কঠোর নিয়মশৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিয়া কেবল পরস্পরের সাহায্যেই যে, এই পৃথিবীকে এমন সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে, আকাশের বিদ্যুৎ-সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত আবিষ্কারগুলি হইতে তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। আমাদের অসম্পূর্ণ স্থূল দৃষ্টি প্রাকৃতিক ব্যাপারগুলিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখে বলিয়াই আমরা জগদীশ্বরের প্রকৃত মহিমার উপলব্ধি করিতে পারি না। সকলই যেন ছাড়া-ছাড়া ভাবে আমাদের চোখে আসিয়া পড়ে। অথচ

আমরা যে সকল ঘটনাকে বিপরীত এবং অসম্বন্ধ বলি, তাহাদেরও তলে সর্ব্বদাই যোগসূত্র বর্ত্তমান। জগদীশ্বর যে সোনার তারে ক্ষুদ্র-বৃহৎ এবং সম্পর্কিত এবং অসম্পর্কিত ঘটনাগুলির মধ্যে যোগসাধন করিয়া এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডকে যন্ত্রবৎ চালাইতেছেন, তাহার সন্ধান করিতে পারিলেই বিজ্ঞানালোচনা সার্থক হইবে, এবং মানব ধন্য হইবে।

বায়ুর অঙ্গারক বাষ্প

কাঠ, কয়লা প্রভৃতি দাহ্যপদার্থে প্রচুর অঙ্গার মিশ্রিত আছে। আমরা এই সকল জিনিসকে যখন জ্বালাইতে আরম্ভ করি, তখন ঐ সকল অঙ্গার (Carbon) বায়ুর অক্সিজেনের সহিত মিশিয়া অঙ্গারক বাষ্প (Carbonic acid gas) উৎপন্ন করিতে থাকে এবং রাসায়নিক কার্য্যের জন্য প্রচুর তাপ ও আলোক উৎপন্ন হইয়া পড়ে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, কাঠ ও কয়লায় আগুন জ্বালাইলে যেমন তাপ ও আলোকের উৎপত্তি হয়, সঙ্গে সঙ্গে কতকটা অঙ্গারক বাষ্পও উৎপন্ন হইয়া বায়ুতে মিশিয়া যায়।

পৃথিবীর সমগ্র কল-কারখানায় বৎসরে কত কয়লা পোড়ে, তাহা স্থির করা কঠিন নয়। সুতরাং উহা হইতে কত অঙ্গারক বাষ্প বায়ুতে মিশ্রিত হয়, তাহারও হিসাব চলে। এই প্রকার গণনায় দেখা গিয়াছে, কেবল কয়লার দাহনে প্রতি সেকেণ্ডে ১৬ টন অর্থাৎ প্রায় একুশ শত মণ ওজনের অঙ্গারক বাষ্প আমাদের আকাশের বায়ুতে আসিয়া মিশিতেছে। বলা বাহুল্য, কেবল অগ্নিই বায়ুমণ্ডলে অঙ্গারক বাষ্প জোগায় না। প্রাণীর প্রত্যেক নিঃশ্বাসের সহিত ঐ বাষ্পের এক একটু বায়ুতে আসিয়া মিশিতেছে এবং নানা জৈব পদার্থের পচনেও অঙ্গারক বাষ্প উৎপন্ন হইতেছে ; ইহারও একটি মোটামুটি হিসাব খাড়া করা কঠিন নয়। এই প্রকার হিসাব হইতে দেখা যায়, দশ লক্ষ লোক প্রতি ঘণ্টায় প্রায় আড়াই টন্ অর্থাৎ সত্তর মণ ওজনের অঙ্গারক বাষ্প বায়ুতে ছাড়িয়া দেয়।

অঙ্গারক বাষ্প বায়ু অপেক্ষা প্রায় দেড় গুণ ভারী। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত

বিশাল বাষ্পের স্তূপ প্রতি মুহূর্ত্তে বায়ুতে আসিয়া পড়িতে থাকিলে, তাহা ভূপৃষ্ঠের নিম্নতম প্রদেশে সঞ্চিত হইবে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপারে তাহা দেখা যায় না। যে সকল তরল বা বায়বীয় পদার্থের ঘনতা একপ্রকার নয়, একত্র রাখিলেই তাহারা ধীরে ধীরে পরস্পরের সহিত মিশিয়া এক সমঘন মিশ্র পদার্থ উৎপন্ন করিতে থাকে। এটি তরল এবং বায়বীয় পদার্থমাত্রেরই সাধারণ ধর্ম্ম। অঙ্গারক বাষ্প বায়ুতে আসিয়া পড়িলেই, পূর্ব্বোক্ত কারণে বায়ুর সহিত বেশ সমানভাবে মিশিয়া যায়।

সমগ্র বায়ুমণ্ডলে কি পরিমাণ অঙ্গারক বাষ্প আছে, তাহা নানা প্রকারে স্থির করা হইয়াছে। এই সকল হিসাব হইতে দেখা যায়, আমাদের কারখানা এবং কলের অগ্নি হইতে প্রতি বৎসর যাহা উৎপন্ন হয়, তাহার হাজার গুণ অঙ্গারক বাষ্প সর্ব্বদাই আকাশের বায়ুতে মিশ্রিত রহিয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, হাজার বৎসর ধরিয়া কল-কারখানার কাজ চলিতে থাকিলে কেবল কলের অগ্নি দ্বারাই বায়ুমণ্ডলে অঙ্গারক বাষ্পের পরিমাণ দ্বিগুণ হইয়া দাঁড়াইবে।

অঙ্গারক বাষ্প উদ্ভিদের একটি প্রধান ভোজ্য, কিন্তু প্রাণীসকল সাক্ষাৎ ভাবে ইহা হইতে কোন উপকার প্রাপ্ত হয় না। বরং শ্বাসপ্রশ্বাসের সহিত এই বাষ্পটিকে দেহস্থ করিলে, তাহা বিষবৎ কার্য্য করে। দশ হাজার ভাগ বায়ুতে ১৫ ভাগ অঙ্গারক বাষ্প থাকিলেই, তাহা প্রাণীর জীবন রক্ষার অনুপযোগী হইয়া পড়ে। তখন তাহা দ্বারা আর শ্বাসপ্রশ্বাসের কাজ চলে না। পৃথিবীর নানা অংশে কলকারখানার সংখ্যা যে প্রকার দ্রুত বাড়িয়া চলিয়াছে, তাহাতে আশঙ্কা হয় যে, বায়ু দূষিত হইতে হইতে শীঘ্রই ঐ সীমায় আসিয়া পৌঁছিবে।

কিছুদিন পূর্ব্বে কয়েকজন আধুনিক বৈজ্ঞানিকের মনে ঠিক ঐ

আশঙ্কারই উদয় হইয়াছিল। অপরাপর বৈজ্ঞানিকগণ বহু বৎসর পূর্ব্বে আকাশের বায়ু পরীক্ষা করিয়া তাহাতে যে পরিমাণ অঙ্গারক বাষ্পের সন্ধান পাইয়াছিলেন, তাহা প্রাচীন বৈজ্ঞানিক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ ছিল। প্রাচীন কালের সেই পরীক্ষার ফলের সহিত আধুনিক পরীক্ষার ফলের কি প্রকার পার্থক্য হয়, জানিবার জন্য পূর্ব্বোক্ত বৈজ্ঞানিকগণ পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইঁহারা আশা করিয়াছিলেন, এখনকার বায়ুমণ্ডলে নিশ্চয়ই অত্যন্ত অধিক পরিমাণ অঙ্গারক বাষ্প ধরা পড়িবে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, আধুনিক জনাকীর্ণ প্রদেশের বায়ুমণ্ডলেও অঙ্গারক বাষ্পের একটুও আধিক্য দেখা যায় নাই। শত বৎসর পূর্ব্বেকার কল-কারখানা-হীন সময়ে আকাশে যে পরিমাণ অঙ্গারক বাষ্প থাকিত, এখনকার বায়ুতে প্রায় তাহাই দেখা গিয়াছিল।

অধিকাংশ উদ্ভিদ্ই অঙ্গারক বাষ্পকে নষ্ট করে। উদ্ভিদ্-দেহে যে হরিদ্বর্ণের পদার্থ (Chlorophyl) মিশ্রিত থাকে, তাহাই বায়ুর অঙ্গারক বাষ্পকে টানিয়া লইয়া সূর্য্যকিরণের সাহায্যে অঙ্গার এবং অক্সিজেনে পরিণত করিয়া ফেলে। পৃথিবীর সমগ্র উদ্ভিদ্ গড়ে কি পরিমাণ অঙ্গারক বাষ্প নষ্ট করে, তাহার একটা মোটামুটি হিসাব করা কঠিন নয়। এইপ্রকার গণনা করিয়া বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, পৃথিবীর সমবেত জনমণ্ডলী এবং অপর প্রাণিগণ যে অঙ্গারক বাষ্প শ্বাসপ্রশ্বাস দ্বারা বায়ুতে ছাড়িয়া দেয়, পৃথিবীর সমবেত উদ্ভিদ্ তাহার অধিক বাষ্প কখনই নষ্ট করিতে পারে না। কাজেই দেখা যাইতেছে, কল-কারখানার কয়লার দাহন হইতে যে বিশাল বাষ্পস্তূপ নিয়তই বায়ুমণ্ডলে মিশিতেছে, জমাখরচে তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না।

অঙ্গারক বাষ্পের আধিক্যে বায়ু দূষিত হওয়ার আশঙ্কা দূরীভূত হইয়াছিল বটে, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত রহস্যময় ব্যাপারটি বৈজ্ঞানিকদিগের নিকট

একটা বৃহৎ প্রহেলিকা হইয়া পড়িয়াছিল। বৈজ্ঞানিকগণ বহুদিন ধরিয়া বিষয়টি লইয়া গবেষণা করিয়াছিলেন। ইহার ফলে যে সকল তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা বড়ই বিস্ময়কর। ইঁহারা বলিতেছেন, আমাদের পৃথিবীর অধিকাংশ জুড়িয়া যে সকল সাগর মহাসাগর রহিয়াছে, তাহারা যেমন মেঘোৎপত্তি করিয়া এবং বায়ুপ্রবাহকে নিয়মিত রাখিয়া স্থলভাগকে সরস ও উর্ব্বর করিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে সেইপ্রকার বায়ুমণ্ডল হইতে অস্বাস্থ্যকর অঙ্গারক বাষ্প শোষণ করিয়াও পৃথিবীকে জীববাসোপযোগী করিয়া রাখিতেছে। জল জিনিসটা তরল পদার্থ হইলেও, কতকগুলি বায়বীয় পদার্থ তাহাতে অত্যন্ত অধিক পরিমাণে মিশিয়া থাকিতে পারে। বরফ-গলা এক ঘনফুট (Cubic foot) জলে ঠিক্ সেই আয়তনের ১১৫০ গুণ এমোনিয়া বাষ্প মিশ্রিত থাকিতে পারে। বায়ুও জলে অত্যন্ত অধিক পরিমাণে মিশ্রিত হয়। এই মিশ্রিত বায়ুই অধিকাংশ জলচর প্রাণীদিগকে জীবিত রাখে। জলের এই বিশেষ ধর্ম্মটির উপর নির্ভর করিয়া বৈজ্ঞানিকগণ বলিতেছেন, বায়ুরাশিতে নানা প্রকারের যে অঙ্গারক বাষ্প আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহার অনেকটা সমুদ্রের জল শোষণ করিয়া রাখে।

একটা উদাহরণ লইলে এই শোষণ ব্যাপারটির কথা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। মনে করা যাউক, যেন কুড়ি হাজার ঘনফুট আয়তনের একটি বাক্সে দশ হাজার ঘনফুট সাধারণ বায়ু ও ঠিক সেই পরিমাণ জল আছে, এবং বাক্সের মুখ বন্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। আকাশের বায়ুর দশ হাজার ভাগে সাধারণতঃ তিন ভাগ অঙ্গারক বাষ্প থাকে। সুতরাং বাক্সে আবদ্ধ দশ হাজার ঘনফুট বায়ুতে নিশ্চয়ই তিন ঘনফুট অঙ্গারক বাষ্প মিশ্রিত আছে বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে হয়। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কতকগুলি বায়বীয় পদার্থকে শোষণ করিয়া রাখা জলের একটি প্রধান ধর্ম্ম। কাজেই, এখানে আবদ্ধ জল অঙ্গারক বাষ্পমিশ্রিত বায়ুকে শোষণ

করিতে থাকিবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে এক একটু করিয়া বায়ু জল ছাড়িয়া উপরে উঠিতে আরম্ভ করিবে। এই দুই বিপরীত কার্য্য বহুক্ষণ চলিতে থাকিলে শেষে এমন একটি সময় আসিবে, যখন জলের বায়ু-উদ্গিরণ এবং বায়ু শোষণের মাত্রা ঠিক একই হইয়া দাঁড়াইবে। এই অবস্থায় উপরের বায়ু এবং জলমিশ্রিত বায়ু এই উভয়ের চাপ সমান হইয়া পড়ে। কাজেই, তখন জল আর নূতন করিয়া বায়ু শোষণ করিতে পারে না।

এখন বায়ুর সহিত মিশ্রিত অঙ্গারক বাষ্পের অবস্থা কি হইল, আলোচনা করা যাউক। বায়ুতে তিন ঘনফুট্ অঙ্গারক বাষ্প মিশ্রিত ছিল। কাজেই, যখন আবদ্ধ জল সেই দশ হাজার ঘনফুট্ বায়ুর অর্দ্ধেক শোষণ করিয়া ভিতর ও বাহিরের চাপকে সাম্যাবস্থায় আনিয়াছিল, তখন অঙ্গারক বাষ্পেরও অর্দ্ধেক শোষণ করা ব্যতীত তাহার আর উপায়ান্তর ছিল না। অঙ্গারক বাষ্পই বায়ুকে দূষিত করে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, দূষিত বায়ু কিয়ৎকাল জলের সংস্পর্শে থাকিলেই জল অস্বাস্থ্যকর বাষ্পকে হরণ করিয়া বায়ুকে নির্ম্মল করিয়া তোলে। উদাহৃত বায়ুতে তিন ঘনফুট্ অঙ্গারক বাষ্প না থাকিয়া যদি ছয় ঘনফুট্ থাকিত, তাহা হইলেও উহার অর্দ্ধেক অর্থাৎ তিন ঘনফুট্ বাষ্পকে জল অনায়াসে শোষণ করিয়া রাখিতে পারিত।

আমরা পূর্ব্বের উদাহরণে জল এবং বায়ুর আয়তন সমান ধরিয়া হিসাব করিয়াছি। বলা বাহুল্য, জলের আয়তন যদি বায়ুর আয়তন অপেক্ষা অধিক হইয়া দাঁড়ায়, তখন জল আয়তনের অনুপাতে অধিক করিয়া অঙ্গারক বাষ্প শোষণ করিতে থাকিবে। ভূপৃষ্ঠের অধিকাংশ স্থান জুড়িয়া যে সাগর-মহাসাগরগুলি বিশাল জলরাশি ধারণ করিয়া রহিয়াছে, বৈজ্ঞানিকদিগের মতে তাহারাই পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বায়ুরাশিতে এক নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের অধিক অঙ্গারক বাষ্প থাকিতে দিতেছে না। আধুনিক

কল-কারখানা হইতে যে প্রচুর অঙ্গারক বাষ্প বায়ুতে আসিয়া মিশিতেছে, সমুদ্রের জলরাশিই তাহার অধিকাংশ ধীরে ধীরে গ্রাস করিয়া বায়ুকে নির্ম্মল রাখিতেছে, এবং আবার কোন কারণে যখন বায়ুর অঙ্গারক বাষ্পের পরিমাণ হ্রাস হইয়া আসিতেছে, ভিতর বাহিরের চাপকে সাম্যাবস্থায় রাখিবার জন্য সেই সকল জলরাশিই পূর্ব্বশোষিত অঙ্গারক বাষ্প উদ্গিরণ করিয়া আকাশের অঙ্গারক বাষ্পের অভাব পূর্ণ করিতেছে।

এক সমুদ্রই অঙ্গারক বাষ্প শোষণ করে না। সমুদ্রের জলে যে সকল পদার্থ মিশ্রিত থাকে, তাহারাও ঐ বিষাক্ত বায়ুকে গ্রাস করে। বায়ুরাশিতে যে অঙ্গারক বাষ্প মুক্তাবস্থায় আছে, এক সমুদ্রের জলই তাহার প্রায় ২৭ গুণ শোষণ করিয়া রাখিতেছে। তাছাড়া জলমিশ্রিত কার্ব্বনেট্, বাইকার্ব্বনেট্ প্রভৃতি নানা যৌগিক পদার্থ যে কত বাষ্প কুক্ষিগত করিয়া রাখিয়াছে, তাহার ইয়ত্তাই হয় না। সুতরাং দেখা যাইতেছে, কোন কারণে বায়ুমণ্ডলে অঙ্গারক বাষ্পের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে বা কমিয়া আসিলে আর বিপদের আশঙ্কা নাই। বিশ্বনাথ সৃষ্টি রক্ষার জন্য সমুদ্র-জলে এমন একটি ধর্ম্ম যোজনা করিয়া দিয়াছেন যে, আকাশে অঙ্গারক বাষ্পের আধিক্য হইলে সমুদ্র-জলই সেই অনাবশ্যক বাষ্পকে শোষণ করিয়া লইবে, এবং তার পর কোন কালে সেই বাষ্পের অভাব হইলে যুগযুগান্তরের সঞ্চিত ভাণ্ডার হইতে সেই সমুদ্রই অভাব মোচন করিতে থাকিবে। প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবনের কার্য্যে অনেক সাদৃশ্য আছে। শীতাতপ, আঘাত, উত্তেজনা প্রভৃতি প্রাণী ও উদ্ভিদ্‌দেহে ঠিক একপ্রকারেই কার্য্য করে। কিন্তু অঙ্গারক বাষ্পের কার্য্যটা উহাদের উপর ঠিক বিপরীত হইতে দেখা যায়। উদ্ভিদ্ অঙ্গারক বাষ্প দেহস্থ করিলেই পুষ্ট হইতে আরম্ভ

করে, কিন্তু কোন প্রকারে সেই একই বাষ্প শ্বাসপ্রশ্বাসের সহিত প্রাণীর দেহে প্রবিষ্ট হইলে বিষের কার্য্য সুরু করিয়া দেয়। উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় এবং প্রাণীর বর্জ্জনীয় বাষ্পটিকে বিধাতা যে কৌশলে বায়ু-মণ্ডলে নিয়মিত রাখিয়া উভয়েরই সুখ-স্বাস্থ্যের সুব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়কর।

জ্যোতিষ্কের জন্মকথা

মেঘমুক্ত রাত্রিতে আকাশে দৃষ্টিপাত করিলে, যে সকল ছোট-বড় নক্ষত্র দেখা যায়, তাহাদের প্রায় প্রত্যেকটিই এক একটি মহাসূর্য্য। পৃথিবী, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি প্রভৃতি গ্রহগণ যেমন সূর্য্যের চারিদিকে অবিরাম ঘুরিতেছে, সম্ভবতঃ ইহাদেরো চারিদিকে সেই প্রকার বহু গ্রহ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। বিধাতার অনন্ত রাজ্যে এই নক্ষত্রগুলি এক একটি সামন্ত রাজা। এক একটু স্থানে নিজেদের দলবল লইয়া তাহারা শাসন-কার্য্য চালায়। ইহা ছাড়া আকাশের স্থানে স্থানে নীহারিকা (Nebula) নামক আর একপ্রকার জ্যোতিষ্ক আছে। হঠাৎ দেখিলে ইহাদিগকে শুভ্র মেঘখণ্ড বলিয়া ভ্রম হয়। এগুলিও আকারে বড় ক্ষুদ্র নয়। কোটি কোটি মাইল স্থান জুড়িয়া ইহারা অবস্থিত। এই বিচিত্রাবয়ব বাষ্পময় জ্যোতিষ্কগুলি নিজের তাপেই নিজেরা জ্বলিতেছে। মৃত্তিকা যেমন প্রতিমার উপাদান, জ্যোতিষের মতে এই নীহারিকাগুলিই এক একটি মহাসূর্য্যের উপাদান। তাপালোক বিকিরণ করিয়া কালক্রমে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলেই, ইহারা এক একটি মহাসূর্য্যকে মূর্ত্তিমান করিয়া তোলে।

নগ্ন চক্ষুতে আমরা ছয় সাত হাজারের অধিক নক্ষত্র দেখিতে পাই না। অতি দূরে থাকিয়া যাহারা পৃথিবীর উপর ক্ষীণালোক পাত করিতেছে, তাহাদের দর্শনে আমরা বঞ্চিত। কাজেই, অতি দূরবর্ত্তী নক্ষত্রগুলি আমাদের অগোচরেই রহিয়া গিয়াছে। দূরবীণ দিয়া দেখিলে ইহাদেরি বড়গুলির সন্ধান পাওয়া যায় মাত্র। তারপর ফোটোগ্রাফের কাচের উপর আকাশের প্রতিবিম্ব ফেলিলে, আরো কতকগুলি

ফোটোগ্রাফ চিত্রে ধরা দেয়। ইহা ছাড়া আরো যে কোটি কোটি মহাসূর্য্য দূরবর্ত্তী আকাশ জুড়িয়া অবস্থান করিতেছে, কোন উপায়েই আমরা তাহাদের সন্ধান পাই না। যাহা হউক, নানা প্রকারে জ্যোতিষিগণ প্রায় দশকোটি নক্ষত্রের অস্তিত্ব জানিতে পারিয়াছেন। আমাদের সূর্য্য এই দশকোটি নক্ষত্রের মধ্যে একটি।

যাহারা বহুদূরে থাকিয়া আমাদের যন্ত্রে কেবল আলোক-বিন্দুর আকারে ধরা দেয়, তাহাদের ঘরের খবর জানার চেষ্টা বৃথা। নক্ষত্র-দিগের রাজ্যের প্রসার কত এবং উহাদিগকে বেষ্টন করিয়া কত গ্রহ-উপগ্রহ ঘুরিতেছে, তাহা আমরা জানি না। কাজেই, যে নক্ষত্রটির অধিকারে আমাদের বাস, তাহারি কিঞ্চিৎ পরিচয় সংগ্রহ করিয়া অপর-গুলির বিশালতা অনুমান করা ব্যতীত আর অন্য উপায় নাই। যে গ্রহটি অতি দূরে থাকিয়া আমাদের সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে, তাহার নাম নেপচুন্। সূর্য্য হইতে ইহার দূরত্ব প্রায় দুইশত আশী কোটি মাইল। পৃথিবী প্রায় সূর্য্যের ক্রোড়েই অবস্থিত; তাই ইহার দূরত্ব নয় কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল। ইহাই যদি একটি ক্ষুদ্র নক্ষত্রের অধিকার হয়, তবে ইহা অপেক্ষা সহস্র সহস্র গুণ বৃহৎ মহাসূর্য্যগুলির রাজ্যের প্রসার যে কত, তাহা আমরা অনুমান করিয়া লইতে পারি। ইহাদের অনেকেই এতদূরে অবস্থিত যে, প্রতি সেকেণ্ডে একলক্ষ ছিয়াশী হাজার মাইল বেগে ছুটিয়াও ইহাদের আলোক পৃথিবীতে পৌঁছিতে সহস্র সহস্র বৎসর অতিবাহন করে। সমগ্র বিশ্বের প্রসার কি প্রকার এবং এক একটি জগৎ যে কত বড়, এই সকল তথ্য হইতে কতকটা অনুমান করা যাইবে।

মানুষের শ্রবণেন্দ্রিয়, দর্শনেন্দ্রিয়, জ্ঞান, বুদ্ধি আছে সত্য, কিন্তু ইহাদের শক্তি এত সঙ্কীর্ণ যে, কোটি কোটি মাইল দূরের মহাসূর্য্যগণ তাহাদের রাজ্যগুলিকে কি প্রকারে শাসন করিতেছে তাহা প্রত্যক্ষ করিবার উপায়

নাই। কাজেই, আমরা যে গ্রহটির অধিবাসী তাহারি রাজা কি পদ্ধতিতে রাজ্য শাসন করিতেছে, তাহাই দেখিয়া এখন তৃপ্ত থাকিতে হইতেছে।

কেবল পৃথিবী ও চন্দ্রকে লইয়াই আমাদের সূর্য্যের রাজত্ব নয়। সূর্য্যকে বেষ্টন করিয়া বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনস্, নেপ্‌চুন প্রভৃতি যে সকল বৃহৎ গ্রহ অবিরাম ঘুরিতেছে, তাহা-দিগকে লইয়াই সৌরজগৎ। ইহা ছাড়া যে সকল ক্ষুদ্র গ্রহ, উল্কাপিণ্ড এবং ছোট-বড় ধূমকেতু সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া ফিরিতেছে, তাহাদিগকেও সৌররাজ্যের প্রজা বলা যায়। গ্রহগণের মধ্যে শিশুসন্তানের ন্যায় বুধ প্রায় সূর্য্যের ক্রোড়েই অবস্থিত। সূর্য্য হইতে ইহার দূরত্ব প্রায় তিন কোটি ষাট লক্ষ মাইল। তার পরেই যথাক্রমে শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল প্রভৃতি গ্রহগণ রহিয়াছে। ভীমকায় নেপ্‌চুন্ প্রহরীর ন্যায় সৌরজগতের সীমান্ত প্রদেশ প্রদক্ষিণ করিয়া ফিরিতেছে। এরাজ্যে একবার পদার্পণ করিলে সূর্য্যের টানে এবং বৃহস্পতি, শনি প্রভৃতির অত্যাচারে বিদেশী জ্যোতিষ্কগুলিকে যথেষ্ট লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়। ধূমকেতু প্রভৃতি কত পথভ্রান্ত জ্যোতিষ্ক যে, এই প্রকারে সৌরজগতে বন্দী হইয়া পড়িয়াছে তাহার ইয়ত্তা হয় না। বৃহস্পতি প্রভৃতি বড় গ্রহগুলি একাকী সূর্য্য প্রদক্ষিণ করে না। অনেকেরই দুই চারিটি করিয়া সহচর আছে। জ্যোতিষের ভাষায় ইহাদিগকেই উপগ্রহ বলা হয়। ইহারা প্রত্যক্ষভাবে সম্রাট্ সূর্য্যের অধীন নয়। গ্রহগণ যেমন সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়, সেই প্রকারে গ্রহদিগকে প্রদক্ষিণ করাই ইহাদের কাজ। আমাদের চন্দ্র এই শ্রেণীরই জ্যোতিষ্ক। সে অবিরাম পৃথিবীকেই প্রদক্ষিণ করিতেছে। উপগ্রহের সংখ্যা সকল গ্রহের সমান নয়। বৃহস্পতি ও শনি আকারে যেমন বড়, ইহাদের উপগ্রহের সংখ্যাও তেমনি অধিক। শনির দশ এবং বৃহস্পতির আটটি চন্দ্রের সন্ধান পাওয়া

গিয়াছে। মঙ্গলের কেবল দুইটি মাত্র চন্দ্র আছে, কিন্তু শুক্র ও বুধ একেবারে চন্দ্রবর্জ্জিত। দূরবর্ত্তী গ্রহ নেপ্‌চুন্‌ ও ইউরেনসেরও চন্দ্র আবিষ্কার করা হইয়াছে।

গ্রহ-উপগ্রহদিগের অবস্থানাদিসম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত ব্যাপারগুলি আলোচনা করিলে অনায়াসেই বুঝা যায় যে, সকলেই যেন এক পারিবারিক বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া সূর্য্য প্রদক্ষিণ করিতেছে। সূর্য্য যেমন নিজের অক্ষরেখার চারিদিকে পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব দিকে ঘুরে, সকল গ্রহ এবং প্রায় সকল উপগ্রহই সেই মুখে আবর্ত্তন করে। তাছাড়া সূর্য্য প্রদক্ষিণ করিবার দিকের মধ্যেও সকলের একতা আছে। পৃথিবী সূর্য্যকে বামাবর্ত্তে ঘুরিবে এবং শনি দক্ষিণাবর্ত্তে প্রদক্ষিণ করিবে, এপ্রকার উচ্ছৃঙ্খলতা গ্রহদিগের মধ্যে একেবারে নাই।

গতিবিধির এইসকল সুনিয়ম ছাড়া সূর্য্য হইতে গ্রহদিগের দূরত্বের মধ্যেও একটা সুন্দর নিয়ম ধরা পড়ে। ০, ৩, ৬, ১২, ২৪, ৪৮, ৯৬, এই সংখ্যাগুলির মধ্যে বেশ একটা শৃঙ্খলা আছে। ছয় তিনের দ্বিগুণ, বারো আবার ছয়ের দ্বিগুণ ইত্যাদি। কাজেই শূন্যকে ছাড়িয়া দিলে, প্রত্যেক রাশিকে পূর্ব্ববর্ত্তী রাশির দ্বিগুণ দেখা যায়। এখন প্রত্যেকের সহিত যদি চার যোগ করা যায়, তবে সংখ্যাগুলি ৪, ৭, ১০, ১৬, ২৮, ৫২ এবং ১০০ হইয়া দাঁড়ায়। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, সূর্য্য হইতে বুধ প্রভৃতি গ্রহের দূরত্বের অনুপাতও প্রায় ৪, ৭, ১০ ইত্যাদির অনুরূপ। অর্থাৎ সূর্য্য হইতে বুধের দূরত্ব যদি ৪ মাইল হয়, তবে শুক্র, পৃথিবী, বৃহস্পতি, শনি প্রভৃতির দূরত্ব যথাক্রমে ৭, ১০, ১৬, ২৮, ৫২ ও ১০০ হইয়া দাঁড়ায়। দূরত্বের এই অদ্ভুত সম্বন্ধটি আবিষ্কার হইলে সৌর পরিবারের গ্রহগণ যে আরো একটি যোগসূত্রে আবদ্ধ, তাহা সকলেই দেখিয়াছিলেন। জ্যোতিঃ-শাস্ত্রের দূরত্বের এই নিয়মটি বোডের নিয়ম (Bode's Law) বলিয়া

প্রসিদ্ধ। যখন ইহার আবিষ্কার হইয়াছিল, তখন ইউরেনস্ ও নেপচুনের অস্তিত্ব আমাদের জানা ছিল না। ইউরেনস্ আবিষ্কৃত হইলে, তাহাকেও এই নিয়ম মানিতে দেখা গিয়াছিল।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বুধ, শুক্র, পৃথিবী ইত্যাদি লইয়াই সূর্য্যের রাজত্ব নয়, ইহাতে অনেক ধূমকেতু, অনেক উল্কাপিণ্ড এবং বহু ক্ষুদ্র গ্রহ আছে। এই ক্ষুদ্র গ্রহগুলির আবিষ্কারের একটা ইতিহাস আছে। বোডের নিয়মে যে-কয়েকটি সংখ্যা পাওয়া গিয়াছিল, তন্মধ্যে আটাশের ঘর ব্যতীত সকল ঘরেই জ্যোতিষিগণ এক একটি গ্রহের সন্ধান পাইয়াছিলেন। নবাবিষ্কৃত ইউরেনস্‌কেও এই নিয়মের অনুগত হইতে দেখিয়া, আটাশের ঘরে কোন গ্রহ আমাদের অগোচরে পরিভ্রমণ করিতেছে বলিয়া সিদ্ধান্ত হইয়াছিল। অনুসন্ধানে মঙ্গল ও বৃহস্পতির কক্ষার মধ্যে সত্যই একটি ক্ষুদ্র গ্রহ ধরা দিয়াছিল। এই ঘটনার পর প্রতি বৎসরই ঐস্থানে দুই চারিটি করিয়া নূতন ক্ষুদ্র গ্রহের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। এখন এগুলির সমবেত সংখ্যা প্রায় পাঁচ শত; কিন্তু ইহাদের কোনটিরই আকার বৃহৎ নয়। যেটি সর্ব্বাপেক্ষা বড়, তাহার ব্যাস তিন শত কুড়ি মাইল মাত্র এবং ক্ষুদ্রতমের ব্যাস আঠারো উনিশ মাইলের অধিক নয়।

সৌরজগতে জ্যোতিষ্কগুলির আবর্ত্তন, পরিভ্রমণ, অবস্থান এবং দূরত্বাদির মধ্যে এইপ্রকার শৃঙ্খলা দেখিয়া জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ ইহাকে কেবল সূর্য্যের আকার্ষণের ফল বলিতে চাহিতেছেন না। সৃষ্টির সময় হইতে ইহাদে পরস্পরের মধ্যে একটা নাড়ীর যোগ আছে বলিয়া সকলে সিদ্ধান্ত করিতেছেন।

জ্যোতিষ্কগণের জন্মতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্যোতিষিগণ কি বলেন, এখন আলোচনা করা যাউক। আমরা পূর্ব্বে যে নীহারিকা নামক জ্যোতিষ্কের উল্লেখ করিয়াছি, এখন সকলেই একবাক্যে তাহাকেই এক একটি নক্ষত্রের

উৎপাদক বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন। বৃক্ষের ক্ষুদ্র বীজ কি প্রকারে অঙ্কুরিত হইয়া ক্রমে অভ্রভেদী মহাতরুতে পরিণত হয় এবং তারপর সেটি দুই শত বৎসরব্যাপী নানা পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া কিপ্রকারে শেষে চরমাবস্থায় আসিয়া দাঁড়ায়, কোন মানুষই ক্ষুদ্র জীবনে তাহা দেখিবার সময় পায় না। কাজেই, অনুসন্ধিৎসুকে মহারণ্যে প্রবেশ করিয়া ছোট-বড় নানা বৃক্ষ দেখিয়া মহাতরুর জীবনের এক ধারাবাহিক ইতিহাস সংগ্রহ করিতে হয়। জ্যোতিষ্কগুলির জীবনের ইতিহাস সংগ্রহ করিতে গিয়া জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ এই উপায়ই অবলম্বন করিয়াছেন। অতি-শৈশব ও অতি-বার্দ্ধক্য এই দুই সীমার মধ্যে যতগুলি অবস্থা থাকিতে পারে, আকাশস্থ নানা জ্যোতিষ্কে তাহার পরিচয় সংগ্রহ করা কঠিন নয়। নিরবয়ব জ্বলন্ত বাষ্পরাশি কিপ্রকারে মহাসূর্য্যে মূর্ত্তিমান হইয়া পড়িতেছে, তাহা নানা শ্রেণীর নীহারিকাস্তূপে স্পষ্ট দেখা যায়। তারপর সেই রক্তাভ শিশু জ্যোতিষ্ক ক্রমে যৌবনে পদার্পণ করিয়া কি প্রকারে শুভ্র ও উজ্জ্বল হইয়া পড়ে, অভিজিৎ (Vega) প্রভৃতি নক্ষত্রগুলি হইতে তাহা বুঝা যায়। প্রৌঢ় জ্যোতিষ্কের অবস্থা জানিবার জন্য আমাদিগকে অধিক দূর যাইতে হয় না। সূর্য্যই তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। যৌবনের উদ্দামতা ইহাতে আর নাই। প্রৌঢ় গৃহস্থের ন্যায়ই সে স্বজন-পরিবৃত হইয়া এখন গৃহকর্ম্মে মন দিয়াছে। রোহিণী (Aldebaran) প্রভৃতি লোহিত তারকাগুলি জরাগ্রস্ত জ্যোতিষ্কের পরিচয় প্রদান করে। কোটি কোটি বৎসর তাপালোক বিকিরণ করিয়া এখন তাহারা নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছে। আর কিছুকাল মধ্যে ইহারা অবশিষ্ট তেজটুকু নিঃশেষে ব্যয় করিয়া আমাদের চন্দ্রের ন্যায় মৃত্যুমুখে পতিত হইবে।

যে সকল মহাপণ্ডিত অসার ও অমূলক কাহিনীর আবর্জ্জনা হইতে জ্যোতিঃশাস্ত্রকে উদ্ধার করিয়া তাহাকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর দাঁড় করাইয়াছেন, তাঁহাদের কথা স্মরণ করিলে কাণ্ট,

সোয়েডেনবর্গ, রাইট এবং লাপ্লাস্‌কে মনে পড়িয়া যায়। নিউটনের পর লাপ্লাসের ন্যায় অসাধারণ গণিতবিৎ বোধ হয় আজও কেহ জন্ম গ্রহণ করেন নাই ইনিই বহুকাল পূর্ব্বে জ্যোতিষ্কের জন্মমৃত্যু সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহা আজও পরিবর্ত্তিত আকারে স্বীকৃত হইতেছে।

লাপ্লাস্ সাহেব নানা গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সৌর-জগতের জন্মবৃত্তান্ত প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, আমাদের চন্দ্র-সূর্য্য-শনি-বৃহস্পতি প্রভৃতি গ্রহ-উপগ্রহগুলি যে উপাদানে গঠিত, তাহা অতি প্রাচীনকালে এক গোলাকার প্রজ্বলিত নীহারিকার আকারে মহাকাশে আবর্ত্তন করিতেছিল। তখন পৃথিবীর নদীসমুদ্র, অরণ্যপর্ব্বত, প্রাণিউদ্ভিদ সকলেরই উপাদান ঐ বিশাল নীহারিকা-স্তূপের গর্ভেই ছিল। কতকাল এই আবর্ত্তন চলিয়াছিল অনুমানও করিবার উপায় নাই। জ্যোতিষিক ব্যাপারে কোটি কোটি সংখ্যা লইয়াই হিসাব চলে। নিশ্চয়ই বহু কোটি বৎসর শনি, বৃহস্পতি, শুক্র, পৃথিবী প্রভৃতিকে জঠরে ধরিয়া সেই নীহারিকারাশি আবর্ত্তন করিয়াছিল।

জিনিস যতই উত্তপ্ত থাকুক না কেন, তাপ বিকিরণ করিতে থাকিলে কালক্রমে তাহার উত্তাপের মাত্রা কমিয়া আসে এবং সঙ্গে সঙ্গে জিনিসটাও সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। আমাদের নীহারিকারাশিরও সেই দশা হইয়াছিল। তাপ বিকিরণ করিয়া এটি ছোট হইতে আরম্ভ করিয়াছিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে উহার আবর্ত্তন-বেগও বাড়িয়া গিয়াছিল। যখন কোন বায়বীয় জিনিস লাট্টুর ন্যায় ঘুরিতে ঘুরিতে নিজের দেহ সঙ্কুচিত করিতে থাকে, তখন সকল বাষ্পই কেন্দ্রীভূত হইয়া জমাট বাঁধিতে পারে না। বাষ্পরাশিকে মাঝে মাঝে বলয়াকারে পশ্চাতে ফেলিয়া প্রধান অংশটা কেন্দ্রীভূত হইয়া পড়ে। লাপ্লাস্ বলিয়াছিলেন,

সৌর নীহারিকা যখন দেহকে সঙ্কুচিত করিয়াছিল, তখন সেও দেহের কিয়দংশকে মাঝে মাঝে বলয়াকারে ছাড়িয়া আসিয়াছিল। পূর্ব্বের সেই বলয়াকার বাষ্পরাশি ক্রমে সঙ্কুচিত হইয়া ও জমাট বাঁধিয়া বৃহস্পতি, শুক্র প্রভৃতি গ্রহগণের উৎপত্তি করিয়াছে।

চন্দ্র পৃথিবীর সহিত সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে বটে, কিন্তু ইহা পৃথিবীরই আত্মজ। পৃথিবীরই চারিদিকে চন্দ্র ঘুরিয়া বেড়ায়। একা পৃথিবীই চন্দ্র-শালিনী নয়; বৃহস্পতি, শনি, মঙ্গল, ইউরেনস্ সকলেরই একাধিক চন্দ্র আছে। চন্দ্র অর্থাৎ উপগ্রহের জন্মতত্ত্বেও লাপ্লাস্ তাঁহার নীহারিকাবাদের প্রয়োগ করিয়াছেন। ইঁহার মতে, গ্রহবলয়গুলি সঙ্কুচিত হইয়া যখন জমাট জ্যোতিষ্কের উৎপত্তি করিয়াছিল, তখন ইহারাও কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বলয় রাখিয়া গিয়াছিল। এইগুলিই কালক্রমে সঙ্কুচিত হইয়া উপগ্রহের সৃষ্টি করিয়াছে। শনিগ্রহের চারিদিকে যে তিনটি বলয় অদ্যাপি দেখা যায়, সেগুলিও পূর্ব্বোক্ত প্রকারে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া লাপ্লাস্ সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। আধুনিক জ্যোতিষিগণ শনির বলয়ের গঠনোপাদানে বাষ্প বা অপর কোন সমঘন পদার্থের সন্ধান পান নাই। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উল্কাপিণ্ডই একত্রিত হইয়া ঐ বলয়গুলির রচনা করিয়াছে। এই কারণে শনির বলয় হয়ত লাপ্লাসের অনুমান অনুসারে উৎপন্ন হয় নাই বলিয়া কেহ কেহ মনে করিতেছেন।

লাপ্লাস্ সাহেব যখন নীহারিকাবাদের প্রচার করেন, তখন তিনি জ্যোতিষ্ক সম্বন্ধীয় সকল তথ্য সংগৃহীত দেখিতে পান নাই। সে সময় উপগ্রহ সম্বন্ধে জ্যোতির্ব্বিদ্‌দিগের জ্ঞান খুবই সঙ্কীর্ণ ছিল। বড় বড় দূরবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা আজকাল যে সকল নূতন তথ্য সংগৃহীত হইতেছে, সেগুলি জানা থাকিলে লাপ্লাসের নীহারিকাবাদ হয়ত আর এক মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিত। নীহারিকাবাদের পুনর্গঠনের ভার আধুনিক জ্যোতিষী-

দিগের উপরেই পড়িয়াছিল। ইঁহারা নবাবিষ্কৃত জ্যোতিষিক তথ্যগুলির সাহায্যে লাপ্লাসের সিদ্ধান্তের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

এ পর্য্যন্ত আমরা যতগুলি গ্রহের পরিচয় পাইয়াছি, তন্মধ্যে ইউরেনস্ ও নেপ্‌চুন্ সূর্য্য হইতে অনেক দূরবর্ত্তী। ইহারা আমাদের পৃথিবী ও বৃহস্পতির ন্যায় উপগ্রহ-পরিবৃত। কিন্তু যে পাকে সৌরজগতের ছোট-বড় গ্রহ-উপগ্রহ সূর্য্য-প্রদক্ষিণ করিতেছে, তাহা ত্যাগ করিয়া উহারা ঠিক বিপরীত পাকে আশ্রিত গ্রহকে প্রদক্ষিণ করে। একই নীহারিকা হইতে সমগ্র সৌরজগতের উৎপত্তি হইলে, ইউরেনস্ ও নেপ্‌চুনের উপগ্রহগুলি কখনই বিপরীত গতিবিশিষ্ট হইয়া ভ্রমণ করিত না বলিয়া একটা তর্ক উঠিয়াছিল। তাছাড়া মঙ্গলের চন্দ্রদ্বয়ের মধ্যে যেটি গ্রহের নিকটতর, তাহার বেগ দূরবর্ত্তী চন্দ্রের তুলনায় অত্যন্ত অধিক দেখিতে পাইয়াও নীহারিকাবাদের উপর লোকের সন্দেহ আসিয়াছিল। গত শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক ইতিহাসের যাঁহারা একটুও খবর রাখেন, তাঁহাদিগের নিকট মহাপণ্ডিত ফেই (Faye) এবং ডারউইনের পরিচয় প্রদান নিষ্প্রয়োজন। এই দুই বিজ্ঞানরথী লাপ্লাসের সিদ্ধান্তের সহিত প্রত্যক্ষ জ্যোতিষিক ব্যাপারগুলির ঐক্য সন্ধান করিতে গিয়া একে একে পূর্ব্বোক্ত অনৈক্যগুলিকে ধরিয়াছিলেন। কাজেই, মূলে ঠিক রাখিয়া সিদ্ধান্তটির শাখা-প্রশাখার কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইয়াছিল।

ইঁহারা বলিয়াছিলেন, এক একটি নীহারিকা হইতেই যে, প্রত্যেক নক্ষত্রজগতের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা নিশ্চিত। তবে লাপ্লাস্ বাষ্পময় বলয় হইতে গ্রহগণের উৎপত্তির যে একটা কথা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা সম্ভবতঃ ঠিক নয়। সেই আবর্ত্তনশীল বিশাল নীহারিকা বলয় রচনা করিতে সঙ্কুচিত হয় নাই, স্থানে স্থানে কতকটা বাষ্প আপনা হইতেই

জমাট বাঁধিয়াছিল। সেই জমাট অংশগুলি এখন গ্রহাকারে বর্ত্তমান। ইহারা আরো অনুমান করিয়াছিলেন, আমাদের পৃথিবীর মত গ্রহগুলি যখন ঐ প্রকার এক একটা কেন্দ্র রচনা করিয়া মূর্ত্তিমান হইয়া পড়িয়াছিল, তখন তাহাতে জল, বায়ু, শিলামৃত্তিকা প্রভৃতির উপাদান ছিল না। ক্রমে ক্রমে এই সকল উপাদান চারিদিক হইতে আকর্ষণ করিয়া তাহারা নিজের দেহকে নিজেই পুষ্ট করিয়াছে। এই সকল অনুমানের উপর দাঁড়াইয়া আধুনিক জ্যোতিষিগণ গণিতের সাহায্যে দেখাইতেছেন, পৃথিবী, মঙ্গল, বুধ, শুক্র প্রভৃতি ক্ষুদ্র গ্রহগুলির সৃষ্টি সর্ব্বাগ্রে হইয়াছে এবং ইহার বহুকাল পরে ইউরেনস্ ও নেপ্‌চুন্ জন্মগ্রহণ করিয়া বিপরীত মুখে আবর্ত্তন করিতেছে। এই প্রকার গণিতের সূত্র অবলম্বন করিয়া মঙ্গলের প্রথম চন্দ্রের ক্ষিপ্র বেগেরও সদ্ব্যাখ্যান পাওয়া যাইতেছে। কাজেই, এখন এই নূতন নীহারিকাবাদকে স্বীকার করা ব্যতীত আর উপায় নাই। এই ত গেল জ্যোতিষ্কের জন্মের কথা। এখন কি প্রকারে ইহাদের মৃত্যু সম্ভাবনা, তাহা আলোচনা করা যাউক। আমাদের চন্দ্র যে, এক কালে অতিশয় উষ্ণ ছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। চন্দ্রমণ্ডলে যে সকল নির্ব্বাপিত আগ্নেয়পর্ব্বতের বিবর এবং জলহীন সমুদ্র দেখা যায়, সেগুলিই উহার অতীত জীবনের অনেক কাহিনী প্রকাশ করে। জ্যোতিষ্কের মৃত্যুর কথা উঠিলেই জ্যোতিষিগণ চন্দ্রের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলেন, একদিন আমাদের পৃথিবী প্রভৃতি গ্রহগণ এবং সূর্য্য প্রভৃতি নক্ষত্রসমূহ ঐ চন্দ্রের ন্যায়ই মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। মৃতাবস্থায় জল, বায়ু বা তাপের লেশমাত্র থাকিবে না। সকল শক্তিই নিঃশেষে ব্যয় করিয়া চন্দ্রের ন্যায়ই তাহারা শুষ্ক মহামরু বক্ষে ধরিয়া প্রেতবৎ আকাশে বিচরণ করিতে থাকিবে।

এক চন্দ্রই মৃত জ্যোতিষ্ক নয়। সৃষ্টিকাল হইতে যে সকল প্রাণী ও

উদ্ভিদ্ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, তাহারা যদি নানা প্রকারে রূপান্তর গ্রহণ না করিত, তাহা হইলে আমরা প্রতি পদক্ষেপেই মৃত জীবের দেহ দেখিতে পাইতাম। বোধ হয় সমগ্র ভূপৃষ্ঠই মৃতদেহে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িত। আধুনিক জ্যোতিষিগণ মহাকাশকে জ্যোতিষ্কগুলির প্রেতভূমি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। জীবের মৃতদেহ রাসায়নিক ক্রিয়ায় এপ্রকারে রূপান্তরিত হয় যে, ইহাতে পূর্ব্বের অবস্থার কোনই সাদৃশ্য থাকে না। মহাকাশে সে পরিবর্ত্তন চলে না। কাজেই, মৃত্যুর পরও জ্যোতিষ্কের দেহ পূর্ব্বের গতিবিধি স্থির রাখিয়া আকাশে পরিভ্রমণ করে। জ্যোতিষিগণ বলেন, এই প্রকার অনুজ্জ্বল ভীমকায় মৃত জ্যোতিষ্ক যে, আকাশে কত বিচরণ করিতেছে, তাহার ইয়ত্তাই হয় না। আমাদের দৃষ্টির সীমার মধ্যে যতগুলি উজ্জ্বল নক্ষত্র আছে, বোধ হয় তাহার সহস্রগুণ মৃত জ্যোতিষ্কের উদয়াস্ত আকাশে নিয়তই চলিতেছে। তাহারা আলোকহীন এবং তাপহীন। কেবল এই জন্যই তাহাদের অস্তিত্ব আমরা দূরে থাকিয়া বুঝিতে পারি না। যখন নির্দ্দিষ্ট পথে এবং নির্দ্দিষ্ট কালে ঘুরিতে ঘুরিতে ইহারা কোন উজ্জ্বল নক্ষত্রকে ঢাকিয়া নিষ্প্রভ করিয়া ফেলে, তখনই আমরা প্রেত জ্যোতিষ্কের পরিচয় পাই। এই প্রকার নাক্ষত্র গ্রহণের আজকাল অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়। পারস্যুস্ (Persues) রাশির আল্‌গল (Algol) নামক নক্ষত্রটি তাহার উজ্জ্বলতার পরিবর্ত্তনের জন্য চিরপ্রসিদ্ধ। প্রাচীন আরবীয় জ্যোতিষিগণও তিন দিন কয়েকঘণ্টা অন্তর উজ্জ্বলতার হ্রাস প্রত্যক্ষ করিয়া উহাকে "দৈত্য তারকা" (Demon Star) নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। আধুনিক জ্যোতিষিগণ বলেন, নিশ্চয়ই কোন মৃত জ্যোতিষ্ক আল্‌গলের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তিন দিন অন্তর সেটি যখন মাঝে আসিয়া দাঁড়ায়, তখন আল্‌গলের গ্রহণ হয়। কাজেই, সে সময় তাহার উজ্জ্বলতা কমিয়া আসে।

আজকাল যে সকল নক্ষত্রকে অতি উজ্জ্বল দেখা যাইতেছে, কতদিনে

তাহারা নির্ব্বাপিত হইবে, হিসাব করা কঠিন। সূর্য্যের অধিকারে আমাদের বাস। কাজেই, উহার অনেক ঘরের খবর আমরা একে একে জানিতে পারিয়াছি। লর্ড কেল্‌ভিন সূর্য্যের শক্তিভাণ্ডারের একটা মোটামুটি হিসাব লইয়া দেখিয়াছিলেন, সৌরজগৎ চল্লিশ কোটি বৎসরের অধিক বাঁচিবে না। অনেকদিন ধরিয়া কেল্‌ভিনের এই গণনাকেই সত্য ভাবিয়া বৈজ্ঞানিকগণ শনি, বৃহস্পতি প্রভৃতি বড় বড় গ্রহগুলিরও আয়ুষ্কাল নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর হইল রেডিয়ম্ নামক যে একটি অদ্ভুত ধাতুর আবিষ্কার হইয়াছে, সেটি আপাততঃ লর্ড কেল্‌ভিনের কল্পিত মৃত্যুবিভীষিকাকে কতকটা কমাইয়া দিয়াছে। অনেকে বলিতেছেন, সূর্য্যমণ্ডলে রেডিয়ম্ জাতীয় যে সকল ধাতু আছে, কেবল সেইগুলিই তেজ বিকিরণ করিয়া সূর্য্যকে সহস্র কোটি বৎসর জীবিত রাখিবে। তারপর সে তেজোহীন হইয়া নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইবে।

হিসাবে দেখা যায়, সূর্য্য প্রতি মুহূর্ত্তে যে তাপালোক বিকিরণ করে তাহার দুইশত কোটি ভাগের মধ্যে কেবল একভাগমাত্র আমাদের পৃথিবীতে আসিয়া পড়ে। কিন্তু এই তেজঃকণিকাই আমাদের ক্ষুদ্র জগৎটির পক্ষে যথেষ্ট। অবশিষ্ট সকলই মহাকাশের দিকে ধাবিত হইয়া ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। অপর মহাসূর্য্যগুলিতেও এই প্রকার ক্ষয় অবিরাম চলিতেছে। কেবল ক্ষয় হইলে ক্ষতি ছিল না। কিন্তু ইহাতে অপেক্ষাকৃত শীতল জ্যোতিষ্কগুলি ধীরে ধীরে উত্তপ্ত হইয়া সমগ্র সৃষ্টির উত্তাপের মাত্রাকে যে সমান করিবার চেষ্টা করিতেছে, তাহাকেই অমঙ্গলের লক্ষণ বলিতে হয়। বিশ্বে শক্তির অসমতা আছে বলিয়াই আমরা শক্তির লীলা দেখিতে পাই। সূর্য্য পৃথিবী অপেক্ষা উষ্ণ, তাই পার্থিব জিনিস সূর্য্যের তাপ অনুভব করিতে পারে, এবং নানা প্রাকৃতিক কার্য্য চালায়। হাফরের আগুন কলের চেয়ে উষ্ণ, তাই কলে বাষ্প উৎপন্ন করিয়া আমরা কল

চালাই। ভূপৃষ্ঠ এক সমতলে থাকিলে যেমন নদীর প্রবাহ বন্ধ হইয়া পড়ে, সমগ্র বিশ্বের উষ্ণতা এক হইয়া দাঁড়াইলে ঠিক সেই প্রকারে শক্তির কার্য্য লোপ পাইবার সম্ভাবনা আছে। এই ব্যাপারটি পণ্ডিতদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া তাঁহাদিগকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে। তাঁহারা সুস্পষ্ট দেখিতে পাইতেছেন, যখন সমগ্র সৃষ্টির উষ্ণতা এক হইয়া দাঁড়াইবে, তখন সূর্য্য, মহাসূর্য্যগণ শক্তিসম্পন্ন হইয়াও শক্তির ব্যবহার করিতে পারিবে না। কাজেই, নিশ্চল শক্তি লইয়া সমগ্র বিশ্ব মৃত হইয়া পড়িবে।